ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইসলামী অর্থনীতি
নির্বাচিত প্রবন্ধ

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
রাজশাহী

প্রকাশক :
দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬

প্রকাশকাল :
চতুর্থ সংস্করণ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত)
এপ্রিল ২০০৫
বৈশাখ ১৪১২

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
আশ্বিন ১৪০৩

কম্পিউটার কম্পোজ :
মো. মখলেছুর রহমান
দি এ্যাকটিভ কম্পিউটার সেন্টার
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
মুবাশ্বির মজুমদার

মুদ্রণ :

প্রাপ্তিস্থান :
প্রফেসর'স বুক কর্ণার, বড় মগবাজার, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশান, ঢাকা
সখি বিতান, রাজশাহী
একাডেমী কর্ণার, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী

মূল্য : টা. ১৬০.০০

Islami Arthoniti : Nirbachito Probondho (Islamic Economics : Selected Essays) by **Shah Muhammad Habibur Rahman**, Professor of Economics, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh, April 2005. Price : Tk. 160.00/US$ 5.00

উৎসর্গ

মানবতার মুক্তিদূত

মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (স.) কে --

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাতায়ালার অসীম অনুগ্রহে *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ* -এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রায় ছয় মাস পূর্বেই বইটির তৃতীয় সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে যায়। এর পর প্রকাশক বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিলেও আমার জন্যেই এই বিলম্ব হয়ে গেল। বইটির বেশ কিছু প্রবন্ধের পরিমার্জনার প্রয়োজন ছিল। সেই সাথে প্রয়োজন ছিল আরও দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক ও বিভাগের চেয়ারম্যানের যৌথ দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে প্রয়োজনীয় সময় করে উঠতে পারিনি। জনসংযোগ দপ্তরের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর কিছুটা ফুরসত পাই।

বর্তমান সংস্করণে তিনটি নতুন প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হলোঃ *সুদবিহীন অর্থনীতি বনাম ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ভোক্তার স্বরূপ* এবং *ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার ক্রমবিকাশ*। এছাড়া *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাত, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী বীমা বা তাকাফুল : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি* এবং *ইসলামী অর্থনীতি পাঠসহায়ক বই-পত্র* শীর্ষক প্রবন্ধগুলোর পুনর্বিন্যাস ও বহু নতুন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। আশাকরি এই সংযোজন ও পরিমার্জনা পাঠকদের কাজে আসবে। সারণীগুলোও যথাসাধ্য সংশোধিত হয়েছে। এরপরও ভুলত্রুটি থেকে যেতেই পারে। আগ্রহী পাঠক নিজগুণে তা ক্ষমা করে দেবেন।

বইটির চাহিদা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশন চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের জন্যে উদ্যোগ নেওয়ায় তাদেরকে মুবারকবাদ জানাই। বইটিতে পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জনা ও প্রুফ সংশোধনের সময়ে পরিবারের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এজন্যে তাদের *জাযায়ে খায়ের* দান করুন। এই সংস্করণটি পূর্বের মতোই পাঠক সমাদর পেলে এবং ইসলামী অর্থনীতি বুঝবার ক্ষেত্রে কিছুমাত্র সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

১২ রবিউল আওয়াল, ১৪২৬
২২ এপ্রিল, ২০০৫

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রসঙ্গ কথা

ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার প্রথম কৌতূহল সৃষ্টি হয় ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি, ছাত্রজীবনে। সে সময়ে ইসলামী অর্থনীতি প্রসঙ্গে দু-একটা বই ও প্রবন্ধ পড়লেও বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে জানার আগ্রহের সৃষ্টি হয়নি। এ ব্যাপারে সত্যিকার অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠি ১৯৭০-এর দশকে, বিশেষতঃ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর। এরপর বাংলা ভাষায় যেসব বই-পত্র পাওয়া গেল সেসব পড়ে কৌতূহলের নিবৃত্তি হলো না, বরং বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হলো অনেক প্রশ্নেরও। তার উত্তরের জন্যে হাত বাড়াতে হলো অন্যত্র। কিন্তু আরবী ও উর্দূ ভাষা না জানা এক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়ালো বিরাট প্রতিবন্ধক। সেই সময়ে কয়েকজন সুহৃদের সৌজন্যে আধুনিক অর্থনীতির আঙ্গিকে ইংরেজী ভাষায় লেখা বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই পেলাম। সেগুলি পড়ে চমৎকৃত হলাম। বস্তুত: তখন হতেই ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে আমার সত্যিকার পড়া-লেখা ও চিন্তা-ভাবনার শুরু।

ইতিমধ্যেই আমাদের চেষ্টায় গড়ে উঠলো ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো। এর মাধ্যমে আরও গভীরভাবে ইসলামী অর্থনীতি জানার ও চর্চার সুযোগ হলো। সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেমিনার ও সম্মেলনে বক্তৃতার আহবান আরও পড়াশুনা ও লেখালেখির সুযোগ করে দিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৮০-১৯৮৬ সালের মধ্যে চারটি বই (দুটি মৌলিক রচনা এবং দুটি অনুবাদ ও সম্পাদনা) প্রকাশিত হলো। সেগুলি পাঠক সমাজে সমাদৃতও হলো। এরপরও দেশের বিভিন্ন সাময়িক, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হতে থাকলো। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজীতেও কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো দেশী-বিদেশী জার্নাল ও সংকলন গ্রন্থে।

বিগত এক যুগ ধরে প্রকাশিত সেসব প্রবন্ধ হতে নির্বাচিত তেরটি প্রবন্ধ এই বইয়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে চারটি প্রবন্ধ প্রায় পূর্বের অবয়বে রয়েছে। আটটি প্রবন্ধ নতুন সংযোজনসহ ব্যাপকভাবে পরিমার্জিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে। একটি প্রায় পুরোটাই নতুন করে লেখা হয়েছে। এছাড়া পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি এমন তিনটি বড় প্রবন্ধ সংযুক্ত হলো। গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধ থেকেও একটির অনুবাদ সংযোজিত হলো। উল্লেখ্য, সকল ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক তথ্য সন্নিবেশের সাধ্যমতো চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

এ ধরনের একটি বই প্রকাশের জন্যে আমার স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে নিরন্তর অনুরোধ পেয়েছি। বিশেষ করে এদেশের শিক্ষাঙ্গনে যারা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী তাদের দাবী ছিল প্রবল। কিন্তু সময় ও সুযোগ, বিশেষ করে প্রকাশকের অভাব ছিল এক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক। শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। এ জন্যে মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি। বইটি দেখে যাঁরা সবচেয়ে বেশী খুশি হতেন সেই আব্বা-আম্মা আজ আর দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ গাফুরুর রহীম তাঁদের চির শান্তি দান করুন। ইসলামী অর্থনীতির বিবিধ প্রসঙ্গ বুঝতে ও জানতে বইটি তরুণ প্রজন্মের কাজে আসলে আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

১২ রবিউল আওয়াল, ১৪১৭ — **শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান**

২৯ জুলাই, ১৯৯৬

সূচীপত্র

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা ও মূলনীতি

ইসলামী অর্থনীতি কি?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল (সা.) প্রদত্ত জীবন বিধানই ইসলাম। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু এর অনুসারীদের জন্যে রয়েছে ব্যক্তিজীবন, গোষ্ঠী জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও উপযুক্ত নীতিমালা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, আইন ও বিচার প্রভৃতি। অর্থনীতি যে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের জন্যে একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ। ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারীদের জন্যেও একথা সত্য। তাই **ইসলামী অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বোঝায় যার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং পরিণাম ফল ইসলামী আকিদা মুতাবিকই নির্ধারিত হয়**। এই অর্থনীতির মূলনীতি ও দিক-নির্দেশনা বিধৃত রয়েছে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে।

ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি বা দর্শন

প্রত্যেক জাতি বা সমাজের একটি জীবন দর্শন থাকে। সেই জীবন দর্শন অনুসারেই তার জীবন তথা জাগতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মুসলমানদের জীবনের সেই দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাত। পক্ষান্তরে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে বস্তুবাদ তথা ভোগবাদ। অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মুসলিম উম্মাহর আকীদা হচ্ছে এই বিশ্বচরাচরের একজন মহান স্রষ্টা আছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান। একমাত্র তাঁরই নির্দেশিত পথে চললে মিলবে কল্যাণ ও মুক্তি। এই নির্দেশিত পথটি কি এবং কেমন করে সেপথে চলতে হবে তা জানাবার জন্যে সেই বিশ্বস্রষ্টাই আবার যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী-রাসূলদের। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই ধারায় সর্বশেষ রাসূল এবং তাঁরই মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহর এই একত্ব ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিকানাকেই ইসলামে বলা হয়েছে তৌহিদ এবং তাঁর পাঠানো নবী - রাসূলদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকেই রিসালাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধিকন্তু এই জীবনই শেষ নয়, এর পরে রয়েছে এক অনন্ত জীবন বা আখিরাত। সেই জীবনে ইহকালীন সুকৃতির জন্যে রয়েছে পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির জন্যে রয়েছে শাস্তি। তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের এই সামষ্টিক বিশ্বাস মুসলমানের ঈমানের পূর্ণতা দান করে। এর তিলমাত্র ব্যতিক্রম শুধু তার ঈমান নয়, তার সমগ্র কর্মজীবনেই এনে দেয় নানা সংশয়, সন্দেহ ও অপূর্ণতা। শয়তান সেই সন্দেহের মধ্যে দিয়ে তাকে টেনে নেয় ধ্বংসের দিকে। মুসলমানের সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ড তাই

তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অর্থনীতি যেহেতু সেই জীবন ও কর্মকাণ্ডেরই এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে সেহেতু এ ক্ষেত্রেও তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাস ও তার দাবী সমভাবেই প্রযোজ্য, এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই আবর্তিত হয় মুসলিমদের জীবনের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। গড়ে উঠে সমৃদ্ধ ও গতিশীল অর্থনীতি।

ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা

এই দার্শনিক ভিত্তিভূমিকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ের কয়েকজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ইসলামী অর্থনীতির একটি সুসংবদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। সেসবের মধ্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা হলো।

ড. এস.এম. হাসানউজ্জামানের মতে- "Islamic Economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the *Shariah* that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society."[1]

অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে শরীয়াহর বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তার প্রয়োগ যা বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অবিচার প্রতিরোধে সমর্থ যেন এর ফলে মানবমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ফলে আল্লাহ ও সমাজের প্রতি তারা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ডা এম. উমার চাপরার মতে-"Islamic economics is that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances."[2]

অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বন্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব ও সমষ্টি অর্থনীতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানবীয় কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে।

---

[1] Hassanuz Zaman, S.M., "Definition of Islamic Economics", *Journal of Research in Islamic Economics,* Jeddah, Winter 1984, p. 52.

[2] Chapra, M. Umer, *What is Islamic Economics?* Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 1996, p. 33.

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক-অর্থনীতিবিদ ডঃ এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর মত হলো- "Islamic econocics is the Muslim thinkers' response to the economic challenges of their times. In this endeavour they are aided by the Quran and the Sunnah as well as by reason and experience."[3] অর্থাৎ, সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাবই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। এই প্রয়াসে তারা কুরআন ও সুন্নাহ এবং যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সহায়তা নিয়ে থাকেন।

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম পথিকৃত ডঃ এম. এ. মান্নান তাঁর যুগান্তকারী বই *Islamic Economics : Theory and Practice*-এ একটি সরল অথচ কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন- "Islamic economics is a social science which studies the economic problems of a people imbued with the values of Islam"[4] অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও বিকাশে অসামান্য অবদানের জন্যে যিনি সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কারে প্রথম ভূষিত হয়েছেন সেই প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে- "Islamic economics represents a systematic eftort to try to understand the economic problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective."[5] অর্থাৎ, ইসলামী অর্থনীতি হলো অর্থনৈতিক সমস্যা ও ঐসব সমস্যার প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে উপলব্ধি করার এক পদ্ধতিগত প্রয়াস।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ও দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল হামিদের মতে ইসলামী অর্থনীতি হলো "ইসলামী বিধানের সেই অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করে।"[৬]

---

[3] Siddiqui, M. Nejatullah, "History of Islamic Economic Thought" in Ausaf Ahmad and K.R. Awan (eds.), *Lectures on Islamic Economics*, IRTI/IDB, Jeddah, 1992, p. 69.

[4] Mannan, Muhammad Abdul,. *Islamic Economics: Theory and Practice*, The Islamic Academy; Cambridge, (Rev. edn.) 1986, p. 18.

[5] Ahamed, Khurshid, "Nature and Significance of Islamic Economics" in Ausaf Ahmed & K.R. Awan (eds.) *Lectures on Islamic Economics;* Jeddah: IRTI/IDB, 1992, p. 19.

[৬] হামিদ, এম. এ., *ইসলামী অর্থনীতিঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ২০০২, পৃ. ১৯।

কুরআন ও সুন্নাহর শাশ্বত নির্দেশাবলীর পাশাপাশি উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে ইসলামী অর্থনীতির যে মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় সেগুলো সম্পর্কে পরবর্তী অংশে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এখানে গভীর পরিতাপের সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা এবং সেই সাথে প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের অন্ধকারে রেখেছে। উপরন্তু এদেশে দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনের ফলে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানী শাসকদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন, মূলনীতি, রূপরেখা বা বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রায়োগিক দিক সম্বন্ধে ধারণা প্রসার লাভ করেনি।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি

ইসলামী অর্থনীতির রয়েছে সাতটি অনন্যধর্মী ও কালজয়ী মূলনীতি। এই মূলনীতিগুলোর নিরিখেই ইসলামী অর্থনীতির সকল স্ট্রাটেজি বা কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি ও কর্মদ্যোগ নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো যথাক্রমে :

১. সকল ক্ষেত্রে *আমর বিল মারুফ* এবং *নেহী আনিল মুনকার*-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে *তাযকিয়া* ও *তাকওয়া* অর্জন;

২. সকল কর্মকাণ্ডেই শরীয়াহর বিধান মান্য করা;

৩. *আদল* (বা ন্যায়বিচার) ও *ইহসান* (বা কল্যাণ)-এর প্রয়োগ;

৪. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা;

৫. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়াস;

৬. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করা; এবং

৭. যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন।

১. সকল ক্ষেত্রে *আমর বিল মারুফ* ও *নেহী আনিল মুনকার* -এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে *তাযকিয়া* ও *তাকওয়া* অর্জন

আমর বিল মারুফ বা সৎ কাজে আদেশ (অন্য কথায় সুনীতির প্রতিষ্ঠা) এবং নেহী আনিল মুনকার বা অন্যায় কাজে নিষেধ (অন্য কথায় দুর্নীতির উচ্ছেদ) ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা মূলনীতি। যে অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় যুগপৎ সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্যে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেই সেই অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় ও মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ফরিয়াদে দিগন্ত হয়ে ওঠে সচকিত। আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের বিধান নেই বলেই পুঁজিবাদ মানুষের কাংখিত কল্যাণ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু সেই অর্থনীতি সচল রাখার উদ্দেশ্যে কৌশল বদলানো হচ্ছে বারবার। কখনও বা মার্কেন্টাইলিজমকে দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব, কখনও বা

'অদৃশ্য হস্ত'কে। কখনও গুরুত্ব পেয়েছে কল্যাণ অর্থনীতির (Welfare Economics) ধারণা, আবার কখনও বা প্রাধান্য পেয়েছে উন্নয়ন অর্থনীতি।

কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। নৈতিকতা বিবর্জিত ও ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের সৃষ্ট সংকট মোচনের দায়িত্ব শেষ অবধি রাষ্ট্রকে নিতে হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের (Structural adjustment) কথা। কিন্তু ইতিমধ্যেই এর বিপক্ষেও তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নেই সে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। এরই প্রতিবিধানের জন্যে ইসলামে সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুনীর্তির উচ্ছেদের জন্যে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত:পক্ষে মানুষের মধ্যে, সমাজের সকল স্তরে সত্য ও মিথ্যার যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তারই প্রতিবিধানের জন্যে সুনীতির সপক্ষে ও দুর্নীতির বিপক্ষে অবস্থান নিতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের এই নির্দেশ অমোঘ ও কালজয়ী। অর্থনীতির ক্ষেত্রে একথা বেশী করে প্রযোজ্য।

এই নীতি প্রয়োগের মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরিশুদ্ধ করা। তার জীবন ও সমাজকে পবিত্র করা। খোদাভীতি বা তাকওয়া এরই ভিত্তি। কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিধানের মূল লক্ষ্য হলো ইহকালীন জীবনে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথে পরিচালনার মাধ্যমে তাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এজন্যে তাকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ বা পবিত্র হতে হবে। খোদাভীতি এর অপরিহার্য সোপান। যার মধ্যে খোদাভীতি রয়েছে সে চারিত্রিক পরিশুদ্ধি বা তাযকিয়া অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তার দ্বারা দুনিয়ার কোন অকল্যাণ সংঘটিত হবে না। আখিরাতেও সে আল্লাহর বা তার রবের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম। খোদায়ী বিধানের লক্ষ্যই হলো পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতা অর্জনে মানুষকে সাহায্য করা। এজন্যে খোদাভীতি বা তাকওয়া সৃষ্টি জরুরী। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো সকল অপরাধমূলক, নাশকতামূলক, হিংসাত্মক ও চরিত্রবিধ্বংসী কাজসহ খোদাদ্রোহিতা থেকে বিরত থাকা যেন মানুষ মানসিক, চারিত্রিক ও শারীরিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে *উসওয়াতুন হাসানা* ও *ইনসানে কামিলের* প্রতিবিম্ব হতে পারে। তাকওয়া ছাড়া এই লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কোন জাগতিক আইন, বিধি-নিষেধ এমনকি জেল যুলুমও মানুষকে অন্যায় ও কলুষতা হতে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি। এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা নিছক খেয়াল-খুশীর বশে মানুষ সৃষ্টি করেন নি। তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এর পিছনে অন্তর্নিহিত ছিল। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই তার গোচরীভূত। সকল কাজের পুরস্কার বা তিরস্কারের তিনিই মালিক, এই বোধ-বিশ্বাস অন্তরে সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কাউকে অসৎ কাজ হতে স্থায়ীভাবে বিরত রাখতে সমর্থ হয়নি। এজন্যেই ইসলামে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের সঙ্গেই তাযকিয়া ও তাকওয়ার উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে, জোর দেওয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহের মধ্যে এটি সর্বাগ্রগণ্য স্থান পেয়েছে এ কারণেই।

২. সকল কর্মকাণ্ডেই শরীয়াহর বিধান মান্য করা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কিছু কিছু পেশা, খাদ্য ও পানীয় এবং কর্মকাণ্ডকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐসব কাজ করা এবং খাদ্য ও পানীয়ের ভোগ উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদি সকল কিছুই হারাম বা নিষিদ্ধ। অনুরূপ শরীয়াহর সীমার মধ্যে বেশ কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ বলেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন অর্থনীতিতেই এই ধরনের বৈধ-অবৈধ বা হালাল-হারামের এই বিধান নেই। বরং সরকার বা আইন পরিষদ বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজনের তাগিদেই কোন কাজকে বৈধ আবার কোন কাজকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করে থাকে। মানুষের মনগড়া মতবাদেই কেবল এই সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে একই ধরনের কাজ একবার আইনতঃ নিষিদ্ধ আবার অন্য সময়ে আইনতঃ সিদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মদ পান ও মদ তৈরী নিষিদ্ধকরণ ও পরবর্তীকালে পুনরায় অনুমোদনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইসলামে এই ধরনের মনগড়া সিদ্ধ-নিষিদ্ধের সুযোগ রাখা হয়নি। যা সিদ্ধ বা বৈধ তা চিরকালের জন্যে ও সকলের জন্যেই বৈধ এবং যা নিষিদ্ধ বা অবৈধ তা চিরকালের জন্যে ও সকলের জন্যেই অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ পুনরায় মদেরই উল্লেখ করা যেতে পারে। গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আঠারো বছর বয়সের নীচে মদপান নিষিদ্ধ। কিন্তু যেদিন পরিবারের ছেলেমেয়ের কারো বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয় সেদিন ঘটা করে মদপানের উৎসব করা হয়। এই ধরনের দ্বিমুখী আচরণ ও মানসিকতার সুযোগ ইসলামে নেই। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের অনুমতি থাকলে বা আইনের বিধান করে নিলে যেকোন সমাজবিধ্বংসী ও মানবতার জন্যে অবমাননাকর কাজও বৈধতার রূপ পেয়ে যায়। জুয়াখেলা ও পতিতাবৃত্তি এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ। প্রথমটি সমাজবিধ্বংসী এবং পরবর্তীটি মানবতার জন্যে অবমাননাকর। কিন্তু যথোপযুক্ত ফি দিয়ে লাইসেন্স করে নিলে কি পুঁজিবাদী অর্থনীতি, কি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই এ দুটি কাজ শুধু বৈধতা নয়, সমাজেরও অনুমোদন পেয়ে যায়। বিপরীতক্রমে যা হালাল বা বৈধ তা প্রাপ্তির বা অর্জনের চেষ্টা করা এবং যা হারাম বা অবৈধ তা পরিত্যাগ বা বর্জনের চেষ্টা করা ইসলামী জীবন বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতির দাবী।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী যেকোন ব্যক্তি হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে এবং যে কোন পরিমাণ অর্থও উপার্জন করতে পারে। তার এই বৈধ মালিকানা থেকে তাকে বঞ্চিত করার কেউ নেই। তবে হারাম বা নিষিদ্ধ পন্থায় এক কপর্দকও উপার্জন করার তার অনুমতি নেই। বরং হারাম পদ্ধতিতে উপার্জন থেকে তাকে আইন প্রয়োগ করেই বিরত রাখা হবে। এক্ষেত্রে অপরাধের পর্যায়

বা গুরুত্ব অনুসারে তাকে অবশ্যই কারাদণ্ড ও /বা অর্থদণ্ড দেওয়া যেতে পারে; এমনকি তার ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত করা যেতে পারে।

৩. আদল (ন্যায় বিচার) ও ইহসান (কল্যাণ)-এর প্রয়োগ

আদল বা ন্যায়বিচার এবং ইহসান বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ইসলামের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিধান। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তা সমভাবেই প্রযোজ্য। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা অন্য কোন ইজমের অর্থনীতিতে সুবিচারের এই প্রসংগটি একেবারেই অনুপস্থিত। সেখানে বরং মানুষের স্বাভাবিকতা বা ফিতরাতের বিরোধী নীতিই কার্যকর রয়েছে। ঐ সব অর্থনীতিতে দুর্বলের, দরিদ্রের, বঞ্চিতের তথা সমাজের মন্দভাগ্য লোকদের জন্যে স্বীকৃত কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দা এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রচণ্ড চাপের মুখে পরবর্তীকালে কিছু কিছু কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এই সমাজে একচেটিয়া কারবারী, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী, ঘৃণ্য চোরাকারবারী, ধনী মজুতদার ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলার কথাই আইনের মর্যাদা পেয়ে থাকে। দেশের আইনের আশ্রয় ও আনুকূল্য তাদেরই জন্যে। ফলে দরিদ্র আরও দরিদ্র হচ্ছে, ধনী হচ্ছে আরও ধনী। ধনবৈষম্য হচ্ছে আরও প্রকট। ইউএনডিপির সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বিলম্বে হলেও এই সত্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে সমাজে জবাবদিহিতার উপস্থিতি অপরিহার্য। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) আমলে মদীনার জনগণের মধ্যে বিলিকৃত কাপড় সকলেই পেয়েছিলেন এক খণ্ড করে। কিন্তু তিনি কিভাবে দুখণ্ড কাপড় ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন তার জবাব দিতে হয়েছিল জনতার সামনে খুতবা দেওয়ার পূর্বেই। আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাসূল (সা.) জামাতা ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলীকে (রা.) হাজির হতে হয়েছিল কাযীর এজলাসে সাধারণ নাগরিকের মতোই। বর্মের মালিকানার সেই মামলায় তিনি হেরে গিয়েছিলেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের যুগেও বিচারের এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ন্যায়বিচারের অন্য অর্থ সমাজ হতে অন্যায় ও যুলুমের উচ্ছেদ এবং সবল প্রতিরোধ। ইসলামী শরীয়াহর ব্যত্যয় যুলুমকেই ডেকে আনে। তার সময়োচিত প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ না হলে দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীই প্রতারিত ও নিগৃহীত এবং বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্যেই ইসলামী অর্থনীতিতে এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। আদল বা সুবিচারের স্বার্থে আইনের তাৎক্ষণিক ও যথাযথ প্রয়োগ ইসলামী বিধানের অপরিহার্য অঙ্গ।

একই সঙ্গে ইহসান বা কল্যাণের প্রসঙ্গটি ইসলামী অর্থনীতিতে যতখানি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে থাকে অন্য কোনও অর্থনীতিতে তা অনুপস্থিত। দুর্বলের প্রতি, অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিতের প্রতি কল্যাণের হাত প্রসারিত করা ইসলামী

অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূলতঃ এই কারণেই যাকাতের মতো একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উশর, সাদাকাতুল ফিতর ও করযে হাসানা। সমাজে যারা মন্দভাগ্য ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল তাদের সমস্যার কিছুটা হলেও সুরাহা হয় যদি যথোচিতভাবে যাকাত ও উশর আদায় ও বন্টন হয়, ফিতরা প্রদান করা হয় এবং করযে হাসানার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়। দুর্বল, বঞ্চিত, ইয়াতীম, ঋণগ্রস্ত মুসাফির, পীড়িত ও আর্তজনেরা অর্থনৈতিক এই কল্যাণ ইসলামী সমাজে পায় তাদের অধিকার হিসাবেই, দয়ার দান হিসেবে নয়।

৪. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এজন্যে বিভিন্ন পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছে। আল-কুরআনে নিকট আত্মীয়দের অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়া আত্মীয়-স্বজনেরও হক রয়েছে। সমাজে কোন ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের কেউ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ হয় তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয়কে সহায়তা করা তার সামাজিক দায়িত্ব। এভাবে কোন জাতির বা দেশের এক-একটি পরিবার যদি স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে দেশ হতে দারিদ্র্য যেমন দূর হবে তেমনি পরমুখাপেক্ষী পরিবারের সংখ্যাও হ্রাস পাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

"তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।" (সূরা আল-যারিয়াত : ১৯ আয়াত)

"তুমি আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।" (সূরা বনি-ইসরাইল : ২৬ আয়াত)

উপরের আয়াত দুটি হতে সুস্পষ্টভাবে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদে অন্যদেরও অধিকার রয়েছে। বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজে যারা মন্দভাগ্য তাদের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব। যাকাতের অর্থ প্রদান সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের জন্যে বাধ্যতামূলক। একই সঙ্গে কুরআনুল করীমের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে তাদের জন্যে দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সমাজের বঞ্চিত, ভাগ্যহত লোকদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয় বাধ্যতামূলক। পৃথিবীর অন্য কোনও অর্থনীতিতে সমাজের বিত্তহীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে এ ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বঞ্চিতের হতাশা ও কর্মদ্যোগে তাদের অংশগ্রহণ না থাকার ফলে দেশের অর্থনৈতিক

কর্মতৎপরতা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়ে। সমাজে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঙ্খিত লক্ষ্য সেই লক্ষ্য কখনই অর্জিত হয়নি সমাজের নীচতলার লোকেরা সকলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি বলেই। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে যখন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সর্বোচ্চ হয় তখন বিনিয়োগ চাহিদা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান একই সংগে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সমাজের অধিকাংশ লোকের ক্রয়ক্ষমতা থাকে। সেই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে আল্লাহ প্রদত্ত উপরের নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই।

৫. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়াস

ইসলাম সর্বস্ব ত্যাগের বা সন্ন্যাসের ধর্ম নয়, আকণ্ঠ ভোগের বা চরম আসক্তিরও ধর্ম নয়। বরং ত্যাগ ও ভোগ-এ দুয়ের মাঝামাঝি জীবন যাপনের জন্যেই ইসলামে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যে সংসারত্যাগী সে দুনিয়ার অর্থনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার জন্যে আদৌ আগ্রহ বোধ করে না। তাই দুনিয়ার লোকদের কোন উপকার করা তার সাধ্য বা ক্ষমতা বহির্ভূত। অপরপক্ষে যে ভোগী, যে কোন উপায়ে ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করাই তার একান্ত বাসনা। ভোগ করার জন্যে, নিজের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে সব রকম উপায়ে সে ধন-সম্পদ উপার্জনে সচেষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে তার কাছে ন্যায়নীতি বা বৈধতা-অবৈধতার প্রশ্ন যেমন তুচ্ছ তেমনি পরের কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা তার কাছে মূর্খতা। নিজে তো সে কৃপণতা করেই অন্যকেও কৃপণতা করতে প্ররোচিত করে। কৃপণতার অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো ব্যয় সংকুচিত হওয়া, ফলে চাহিদা সংকুচিত হওয়া এবং পরিণামে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন সংকুচিত হওয়া। অর্থনীতিতে এর পরিণাম নিদারুণ অশুভ।

ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের মূল বক্তব্যই হলো নিজে সৎ ও সুন্দরভাবে বাঁচতে চেষ্টা করা, অন্যকেও সেভাবে বাঁচতে সহযোগিতা করা। প্রকৃত মুসলমান আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের জন্যে না নিজের সব মূল্যবোধ ও ঈমানী চেতনাকে বিসর্জন দেবে, না অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে। বরং কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে তার যাত্রার সহযোগী করে নেবে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের মন্দভাগ্য লোকদের। পক্ষান্তরে ধনলিপ্সা মানুষকে অন্যায়ের পথে প্ররোচিত করে। পরিণামে ডেকে আনে নিজের ও সমাজের অশেষ অমঙ্গল। অপব্যয় ও অপচয়ের মাধ্যমে নিজের ধন জাহির করা এদের অনেকেরই কুৎসিৎ অভ্যাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এসবই নিন্দিত ও ঘৃণিত।

মহান আল্লাহ তায়ালা আল্-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

"সেই সব লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্য লোককেও কার্পণ্য করার পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা তাদের দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে।" (সূরা আন-নিসা : ৩৭ আয়াত)

তিনি আরও বলেন- "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"
(সূরা বনি ইসরাইল : ২৭ আয়াত)

বরং তিনি ব্যয়ের ব্যাপারে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে-

"তারাই আল্লাহর নেক বান্দা যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এই উভয়ের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে।" (সূরা আল-ফুরকান : ৬৭ আয়াত)

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ অবশ্যই ধন-সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করবে। নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তার। সেই সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজনের ব্যাপারেও তার সর্তক দৃষ্টি থাকবে। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্ত বা সাময়িকভাবে দুদর্শায় নিপতিত মানুষের জন্যে তার থাকবে আন্তরিক দরদ। সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ঘটবে তার বহিঃপ্রকাশ। ব্যক্তি নিজে যেমন উচ্ছৃংখল ও বিলাসী জীবন যাপন করবে না তেমনি পরের দুঃখেও সে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। এই দুয়ের মধ্যবর্তী আচরণই ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এজন্যেই অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের উপর ইসলাম এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে।

৬. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চিত করা

সমাজের সকল মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পাঁচটি-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এই প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে ইসলাম ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে যে তাগিদ দিয়েছে তার নজীর আর কোন অর্থনীতিতে নেই। মূলতঃ এই প্রয়োজন পূরণের অপরিহার্যতা ও গুরুত্ববোধ থেকেই ইসলামে বায়তুল মাল হতে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্যে ব্যয় করার বিধান রয়েছে।

ইবনে হাযম তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *আল-মুহাল্লাতে* বলেন- "প্রতি এলাকার ধনীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও নিঃসম্বলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য। যদি বায়তুল মালে মজুদ সম্পদ এজন্যে পর্যাপ্ত না হয় তাহলে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান বিত্তশালীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে বাধ্য করতে পারেন।"

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের মতো অপরিহার্য মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ না হলে একদিকে মানুষ যেমন অসুস্থ অশক্ত ও রুগ্ন হয়ে পড়বে তেমনি শিক্ষার অভাবে সে খাঁটি মানুষ হতে পারবে না। ইসলামে জ্ঞান অর্জন ফরয করা হয়েছে। নবী মুস্তফা (সা.) বদরের যুদ্ধে শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যেকের মুক্তিপণ নির্ধারণ করেছিলেন মদীনার দশ জন বালক-বালিকাকে শিক্ষাদান করা। দীর্ঘ চৌদ্দ শত বছর পরে আজ

বিশ্ববাসীর কাছে গণশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। অথচ এই প্রয়োজন পূরণের জন্যে ইসলামে কত আগেই না তাগিদ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসার জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ ও নির্দেশনা তো মাত্র হাল আমলের। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও পদ্ধতি নিয়ে রাসুলে করীম (সা.) গাইড লাইন দিয়ে গেছেন সেই কতকাল আগে। অজ্ঞতার জন্যে সেসব শিক্ষা হতে আমরা বঞ্চিত রয়েছি।

যে কোন সমাজে আপামর জনসাধারণের ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন পূরণ না হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী। চুরি-ডাকাতি ব্যভিচার মাদকাসক্তি হতে শুরু করে এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধি সমাজে ছড়িয়ে পড়বে মহামারীর মতো। লক্ষ লক্ষ বনি আদম ঠাঁই নেবে ফুটপাতে বস্তিতে। কিশোর অপরাধ হতে শুরু করে ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, হত্যা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধ ও নৈরাজ্যের সূতিকাগার এসব বস্তি। এসব সর্বনাশ হতে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের যথার্থ ব্যবস্থা। ইসলাম তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এই প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তির সম্পদে সমাজের Have-nots-দের অধিকারের স্বীকৃতি, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ একযোগে এই গ্যারান্টিই দেয়।

৭. যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহকালীন কর্মকাণ্ডের জন্যে পরকালীন মুক্তি বা শাস্তির এমন দ্ব্যর্থহীন ও দৃঢ় ঘোষণা দেওয়া হয়নি। বৌদ্ধ ধর্মে দুনিয়াকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে ইসলামে কর্মবীর হতে বলা হয়েছে। খৃষ্ট ধর্মে সকল পাপের ভারবহনকারী হবেন যীশু। পরকালে তিনিই হবেন পরম পরিত্রাতা। সুতরাং, তাঁর উপর বিশ্বাস ও দায়িত্ব অর্পণ করে দুনিয়ার সকল বৈধ-অবৈধ ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ায় যেমন বাধা নেই, তেমনি বাধ্য-বাধকতা নেই উপায়-উপার্জনের এবং সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধি-বিধান মেনে চলার। হিন্দু ধর্মে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুলিখিত অর্থনৈতিক আচরণ বিধিই নেই। খৃষ্টধর্ম পুঁজিবাদকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। ইহুদী হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের তো কথাই নেই। রাব্বী আচার্য ও পুরোহিতরা যাই বলুক না কেন এসব ধর্মের সাধারণ অনুসারীরা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে জীবন ব্যবস্থা বলে সাদরে গ্রহণ করেছে। অন্যান্য ধর্মের অবস্থাও তথৈবচঃ।

এরই বিপরীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ ইসলামে অর্থনৈতিক সুকৃতি বা হালাল কাজের জন্যে ইহকালীন কল্যাণের সুসংবাদের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি

তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার"।

(সূরা আল-হাদীদ : ৭ আয়াত)

অপরদিকে যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে, গরীব-দুঃখীদের উপকারে সচেষ্ট হবে না বরং হারাম কাজে অংশ নেবে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির সংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

"অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।"

(সূরা : আত্-তওবা : ৩৪ আয়াত)

মুমিন মুসলমান অদৃশ্য বা গায়েবে বিশ্বাস করে বলেই আখিরাতে বিশ্বাস তার ঈমানের অংগ। তাই ইসলামী জীবন বিধান তথা ইসলামী অর্থনীতিতে আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের শেষে মুনাজাতেও বান্দাহ আল্লাহর কাছে যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণই প্রার্থনা করে। আখিরাত যে মুসলমানের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা অনুধাবনের জন্যে রাসূলে করীমের (সা.) একটি মাত্র উক্তিই যথেষ্ট। তিনি বলেন-এই দুনিয়া আখিরাতের জন্যে শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে এখানে যে যেমন বীজ বুনবে অর্থাৎ কাজ করবে আখিরাতে সে তেমন শস্য বা প্রতিফল পাবে। আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তি সম্বন্ধে যার মনে এতটুকু ভয় ও আগ্রহ নেই তার দ্বারা দুনিয়ার যেকোন অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্ভব। অপরপক্ষে তার দ্বারা হালালকে অর্জন ও হারামকে বর্জন, সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ এবং আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা-কোনটাই সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তাযকিয়া অর্জন ও তাকওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হলে এবং আখিরাতকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে নিলে ইহকালের জীবনধারা খোদায়ী বিধান অনুসারে পরিচালিত হতে বাধ্য এবং এই পথেই যুগপৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা

যখন নৈতিকতা বিবর্জিত এবং আদল ও ইহসানবিরোধী পুঁজিবাদ আপন বিষে জর্জরিত এবং মানবতাবিরোধী সমাজতন্ত্রের শব ভূতলশায়িত তখন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব মানবের মনে প্রশ্ন জেগেছে -- এখন বিকল্প কি? এই প্রশ্নের জবাব বহু শত বছর পূর্বেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমেই মানবমণ্ডলীকে জানিয়ে দিয়েছেন। অনাদরে অবহেলায় সাময়িক লাভের বা মোহের তাড়নায় বা বিবেককে চোখ রাঙানোর ফলে দিকনির্দেশনার সেই মহান গ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এই অপচেষ্টায় বরাবর ইন্ধন যুগিয়েছে সব ধরনের খোদাদ্রোহী শক্তি। কিন্তু সত্যসন্ধানী মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনধারাকে সচল ও অর্থবহ করে তোলার জন্যে পুনরায় আল-কুরআনের দিকেই ফিরে আসছে। আজ সময়ের দাবীই হচ্ছে মানবতার শাশ্বত মুক্তির পয়গাম ইসলামের আলোকে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা। ইসলামী অর্থনীতি এরই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য দিক। বক্ষ্যমান আলোচনায় এই অর্থনীতির রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অর্থনীতি রাসুলে করীমের (সা.) মদীনার জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফত পরবর্তী যুগেও বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ডে সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর ছিল।

ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করে না নেওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ, খোদাভীতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন কর্মকাণ্ডেই--সে অর্থনৈতিক হোক বা সামাজিক হোক--সততা ও শৃংখলা আসতে পারে না। অনুরূপভাবে দুনিয়ার এই জীবনে চলার জন্যে পথ প্রদর্শক হিসাবে তিনি যে নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন তাঁদের অনুসরণ এবং ইহকাল পরবর্তী জীবন অর্থাৎ আখিরাতে ইহজীবনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্য হবে এই বোধ-বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত কোনভাবেই আমরা মুসলমান বিবেচ্য হতে পারি না। মানুষের মনগড়া মতবাদ যে মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে বিপুল অকল্যাণ ডেকে এনেছে, মানবতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তা প্রমাণের জন্যে ইতিহাসের পাতা ওল্টাবার দরকার নেই। সমকালীন সময়ই এর সেরা সাক্ষী।

ইসলামী অর্থনীতির বারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নীচে সংক্ষেপে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। কোন অর্থনীতি ইসলামী অর্থনীতি হিসাবে বিবেচিত হতে হলে সেই অর্থনীতিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা অপরিহার্য। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টিই ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা।

১. হালাল উপায়ে উপার্জন ও হালাল পথেই ব্যয়

ইসলামী বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপার্জন, ভোগ, বন্টন, উৎপাদন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ঐ বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউই স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। যে সমস্ত বিষয় শরীয়াহর দৃষ্টিতে হালাল বা বৈধ সেসবের উৎপাদন ভোগ বন্টন ও সেসব উপায়ে উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শের অন্যতম চালিকা শক্তি হলো *আমর বিল মারুফ* বা সৎ কাজে আদেশ অর্থাৎ, সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং *নেহী আনিল মুনকার* বা অসৎ কাজে নিষেধ অর্থাৎ দুর্নীতির উচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

"তারা (মুমিন মুসলমান) এমন ভাল লোক যে যদি আমি (আল্লাহ) তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজ করতে নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে লোকদের ফিরিয়ে রাখে।"

(সূরা আল-হজ্জ্ব : ৪১ আয়াত)

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- "মুমিন নর-নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে।" (সূরা আত্-তাওবা : ৭১ আয়াত)

হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে যে কেউ অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে নিজের পছন্দসই যে কোন উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যে কোন পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম উপায় ও পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলামী অর্থনীতিতে সে সুযোগ কারো জন্যেই উন্মুক্ত থাকে না। যেসব সামগ্রীর ভোগ নিষিদ্ধ সেসবের উৎপাদন বিপণন ও বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। সুদ যেমন নিষিদ্ধ মদ ও জুয়াও তেমনি নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে অনৈসলামী পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান যুগে ইসলামবহির্ভূত সকল মতাদর্শ বা ইজমভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন ভোগ বন্টন উৎপাদন বিনিয়োগ প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই বৈধতা বিচার বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে বা উপযুক্ত ট্যাক্স দিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত নির্ধারিত কর ফি শুল্ক ইত্যাদি প্রদান সাপেক্ষে যে কোন পরিমাণ আয়ই বৈধ গণ্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন ভোগ বন্টন উপার্জন বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন শেষ সীমা বা নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন নেই। ভোগবাদী এই ব্যবস্থায় যেসব পন্থায়

উৎপাদন বা যেসব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সমাজের জন্যে ক্ষতিকর বা শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ ও অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। সমাজতন্ত্রেও অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের স্বাধীনতা বিনিয়োগ ও বন্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্র দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। এখন অবশ্য সেই অবস্থা আর নেই। পুঁজিবাদের বিলাসী জীবন ও ইন্দ্রিয় আসক্তির মোহের জোয়ারে সমাজতন্ত্র ভেসে গেছে। ইসলাম এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করে না। বরং ইসলামের দাবীই হলো অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে শরীয়াহর বিধান মান্য করা। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে বৈধ। অনুরূপভাবে যা হারাম বা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবেই নিষিদ্ধ।

অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপার্জন, বন্টন, বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ অবৈধ উপায়ে আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুলুম চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও সমাজবিধ্বংসী কার্যক্রমসমূহ এসব অবৈধ বা হারাম অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফসল। এবং তৃতীয়তঃ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন সম্পদ সাধারণতঃ অবৈধ কাজেই ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ব্যয়ের অর্থই হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

২. ধন-সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন

আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের উপরেই নির্ভর করে একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। বস্তুতঃ সমাজে কি ধরনের অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার উপরই নির্ভর করে আয় ও সম্পদ বন্টন সুষ্ঠু হবে, না বৈষম্যপূর্ণ হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে সমাজে আয় ও ধনবন্টন কিভাবে হবে তার মূলনীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আকিদা মুতাবিক সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। তিনিই এর স্রষ্টা। মানুষকে সীমিত সময়ের জন্যে তিনি এর শর্তাধীন মালিক করে দিয়েছেন। এখানে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আয় ও ভোগের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামতো ব্যয়েরও সুযোগ নেই। এই মূল দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষিতেই কুরআন ও হাদীসে সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বন্টনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই।"

(সূরা আন্-নিসা : ২৯ আয়াত)

"সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।"

(সূরা আল-হাশর : ৭ আয়াত)

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনি ইসরাইল:২৭ আয়াত)

"তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।" (সূরা আল-যারিয়াত : ১৯ আয়াত)

"অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।"

(সূরা আত-তাওবা : ৩৪ আয়াত)

সুতরাং, ধন-সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালার আলোকেই উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই একাধারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য এবং বেইনসাফী হতে জনগণ রক্ষা পাবে।

৩. যাকাত ও উশর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার সমাজে আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বণ্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব মিসকিন ঋণগ্রস্ত মুসাফির ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও মুসলিম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদে মুসলিম বিশ্বে আজ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় এবং তা বিলিবন্টনের ব্যবস্থা নেই। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্যে আটটা দপ্তর ছিল। রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্তভাবে বন্টনের জন্যে। রাসূলে করীমের (সা.) মৃত্যুর পর বিরাজমান দুঃসময়ে মিথ্যা নবী দাবীকারীদের বিদ্রোহের মুখেও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- "যদি কারও কাছে উট বাধার রশি পরিমাণ যাকাত প্রাপ্য হয় আর সে তা দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি।" এই ঘোষণার সুফল পাওয়া গিয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই। গোটা জাযিরাতুল আরবে যাকাত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হলো সেদিনের আরবে সর্বহারা শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল।

উশরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য যেমন হ্রাস পায় গ্রামীণ জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মাত্রাও হ্রাস পায়। এই ব্যবস্থায় কৃষি পণ্যের আয়ের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত হয়। এই পদ্ধতি এজন্যেই

আরও উত্তম যে, নিসাব পরিমাণ ফসল না হলে উশর আদায় করতে হয় না। আজকের খাজনা ব্যবস্থায় বড় চাষীদের বিপুল বিত্তের মালিক হওয়ার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান। কারণ তাদের প্রদেয় খাজনা ও উৎপন্নের সঙ্গে ব্যবধান রয়েছে দুস্তর। পক্ষান্তরে উশর আদায় পদ্ধতিতে প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদে চাষী এমনকি বর্গাচাষীরাও রেহাই পায় সঙ্গতঃ কারণেই। এর ফলে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাই নিশ্চিত হয়।

৪. বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত অর্থ-সম্পদই বায়তুল মাল হিসাবে অভিহিত হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই এতে সম্মিলিত মালিকানা স্বীকৃত। অর্থাগমের উৎস ও ব্যবহার বিধির বিচারে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা রাজকীয় ধনাগারের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অর্থ সম্পদের উপর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ-এলাকা নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ হতে বঞ্চিত না হয় সেজন্যে বায়তুল মাল হতেই পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। রাসূলে করীম (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বায়তুল মালেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) একে আরও সুসংহত করেছিলেন।

বায়তুল মালের অর্থ যেসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্যে নির্দেশ রয়েছে সেগুলো হলোঃ

১. সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন;
২. বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ;
৩. ইয়াতীম ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন;
৪. অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান;
৫. জনগণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ;
৬. করযে হাসানা প্রদান; এবং
৭. দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজকল্যাণ।

বায়তুল মাল হতে কোনক্রমেই অর্থ-সম্পদ ব্যক্তি বা শাসকের ভোগ-বিলাসের জন্যে ব্যয় করার বিধান নেই। অথচ আজ একদিকে বনি আদম ক্ষুৎপিপাসায়, বিনা চিকিৎসায়, শীতে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে, অন্য দিকে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা জনগণের দেওয়া টাকায় ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি এর প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে। খলীফা হযরত উমার (রা.) তাঁর গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলমের নিব সরু করে নিতে আর কাগজের মার্জিনেও লিখতে। উদ্দেশ্য ছিল সরকারী অর্থের ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। অথচ আজ সরকারী অর্থ তছরূপের পাশাপাশি অপচয় ও অপব্যয়ের প্রতিযোগিতা চলেছে। এর প্রতিবিধানকল্পে আক্ষরিক অর্থেই বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে জনগণের তহবিল

ব্যবহারের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ অবশ্যই বাধ্যতামূলক হতে হবে যেমন ছিল খুলাফায়ে রাশেদার (রা.) যুগে।

৫. ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপন

আজকের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা। বিশেষ করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটা অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। এই ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দুশ বছরের বেশী সময় ধরে এবং সুদই হচ্ছে এর প্রধান চালিকা শক্তি। সুদ সমাজ শোষণের নীরব অথচ বলিষ্ঠ হাতিয়ার। সুদের মারাত্মক যেসব অর্থনৈতিক কুফল ইতিমধ্যেই ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ চিহ্নিত করেছেন সেসব রীতিমত ভীতিপ্রদ। এসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

১. সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে;
২. সামাজিক শোষণ বিস্তৃত, ব্যাপক ও অব্যাহত থাকে;
৩. ধনী-গরীবের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়;
৪. মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পূঞ্জীভূত হয়;
৫. সম্পন্ন ও সচ্ছল কৃষকেরা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করে পরিণামে ভূমিহীন কৃষকে রূপান্তরিত হয়;
৬. একচেটিয়া কারবারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা দুর্বল ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে;
৭. সুদের হার কখনও স্থির থাকে না, ক্রমেই এই হার বেড়ে যায়, ফলে শোষণের মাত্রাও বাড়ে;
৮. ব্যবসায় চক্র (Business cycle) সুদেরই সৃষ্টি যার ফলে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ও সুস্থ বাজার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়;
৯. সমাজে বিলাসপ্রিয়, অকর্মণ্য ও ভোগী লোকের সৃষ্টি হয়;
১০. কর্মসংস্থান ক্রমাগত সংকুচিত হয়, সুলভে মূলধন না পাওয়ায় বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগে ভাটা পড়ে;
১১. মজুদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সুদ অন্যতম প্রতিবন্ধক;
১২. সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলাপী ঋণের বিপুল বোঝা শেষ অবধি জনসাধারণের কাঁধেই চাপে;
১৩. জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃহ্রাস পেতে থাকে;
১৪. বৈদেশিক ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পায় সুদের কারণেই;
১৫. অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার অন্যতম মুখ্য কারণ সুদ; এবং
১৬. অর্থনীতির কল্যাণকর খাতে বিনিয়োগের অন্যতম প্রতিবন্ধকও সুদ।

এসব কারণেই রাসুলে করীম (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই সুদ উচ্ছেদের জন্যে জিহাদ করে গেছেন। বর্তমান সময়ে সুদ উচ্ছেদ করতে হলে অন্যতম প্রধান কাজ হবে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

আলহামদুলিল্লাহ। বিগত ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে পৃথিবীর প্রায় সব মুসলিম দেশে তো বটেই, এমনকি অমুসলিম দেশেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা সফলতার সাথে চালু হয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বিপরীতে এই ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করে চলেছে। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। তাই ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হলে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন একেবারে অপরিহার্য কর্মসূচীর পর্যায়ে পড়ে। ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়াহর আলোকে হালাল-হারামের পার্থক্য অনুসরণ, অংশীদারীত্বমূলক অংশগ্রহণ, শরীয়াহ বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, যাকাত আদায় করা, লাভ-ক্ষতির অংশীদারীত্বের শর্তে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা এই ব্যাংক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম।

বীমার ক্ষেত্রেও ইসলামী পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কারণ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হলে অতি অবশ্যই ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মানুষ তার ব্যবসায়ের, নিজের জীবনের ও পণ্যের নিরাপত্তা চায়। নিরাপত্তার এই প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সুদভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা। এই অবস্থার অবসানকল্পে গড়ে উঠেছে শরীয়াহসম্মত ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানী।

৬. করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন

ইসলাম প্রবর্তিত বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে করযে হাসানা ও মুদারিবাত অন্যতম। বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে এ ছিল সমকালীন অর্থনীতিতে এক বলিষ্ঠ ও ভিন্নতর পদক্ষেপ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নী কারবার বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ে যত শোষণ ও যুলুমের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার মানসেই করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির এক বৈপ্লবিক ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। রাসুলে করীমের (সা.) মদীনার জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরের বেশী এ দুটি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ এই অর্থনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। এখনও সুষ্ঠুভাবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারলে সুদ সমাজ হতে বিদায় নিতে বাধ্য।

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, কৃষিকাজের জন্যে সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিদের নিকট হতে করযে হাসানা নেবার প্রথা চালু হয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুরু হতে। এজন্যে সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ মন-মানসিকতার দিক থেকে প্রস্তুত ছিলেন। এছাড়া বায়তুল মাল হতেও করযে হাসানা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল্-কুরআনে বলেন-

"কে সেই লোক যে আল্লাহ তায়ালাকে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত আছে? কেউ যদি দেয় তবে আল্লাহ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন"।

(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৪৫ আয়াত)

মুদারিবাত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন পরিচালনা ইসলামী অর্থনীতির এক অনন্য অবদান। মুদারিবাতের গুরুত্ব এজন্যে যে, এই পদ্ধতিতে ব্যবসায় বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হতে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পূর্ব নির্ধারিত অংশ বা হার অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। কিন্তু মুনাফা না হলে কেউ কিছু পাবে না। যদি কোন কারণে লোকসান হয় তাহলে তা বহন করবে *সাহিব আল্-মাল* বা মূলধন বিনিয়োগকারী। অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়, কল-কারখানা গড়ে ওঠে তাহলে মূলধনের সংকট হ্রাস পাবে। ফলে সুদী ব্যাংক ও পুঁজিপতির অত্যাচার হতেও রেহাই পাওয়া যাবে। সাম্প্রতিককালে মুসলিম, এমন কি অমুসলিম দেশে পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে মূলতঃ এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই। তবুও ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে সাধারণভাবে করযে হাসানা ও মুদারিবাতের সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক।

৭. ইসলামী শ্রমনীতির প্রয়োগ

শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই ভাই--এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রমনীতির মূল উপজীব্য। "দুনিয়ার মজদুর এক হও"- শ্লোগানসর্বস্ব সমাজতন্ত্রের বাধ্যতামূলক শ্রমদান এখানে যেমন অনুপস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদের কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি জমির মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও লাগামহীন শোষণও এখানে নেই। ইসলামী শ্রমনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে;
২. মৌলিক মানবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মান সমান হবে;
৩. কাজে নিযুক্তির পূর্বে শ্রমিকের সাথে যথারীতি চুক্তি হবে এবং তা যথাসময়ে পালিত হতে হবে;
৪. শ্রমিকের অসাধ্য কাজ তার উপর চাপানো যাবে না;
৫. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা বজায় রাখার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের নীচে মজুরী নির্ধারিত হবে না;
৬. উৎপন্ন দ্রব্যের অংশবিশেষ অথবা লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদের দিতে হবে;
৭. পেশা বা কাজ নির্বাচন ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কে দর-দস্তুর করার পূর্ণ স্বাধীনতা শ্রমিকের থাকবে;
৮. অনিবার্য কারণ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনার প্রেক্ষিতে কাজে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে শ্রমিকের উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করা চলবে না;

৯. মালিকপক্ষ দুর্ঘটনা ও ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে;
১০. দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে;
১১. অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের জন্যে উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে;
১২. পেশা পরিবর্তনের অধিকার শ্রমিকের থাকবে;
১৩. পরিবার গঠনেরও অধিকার তার থাকবে;
১৪. স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের অধিকার থাকবে;
১৫. শ্রমিকের স্থানান্তরে গমনের অধিকার থাকবে; এবং
১৬. শ্রমিকের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসার উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

এই নীতিমালার আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কোন অবকাশই থাকে না। দুইয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য কোন অর্থনীতিতে এই ধরনের নীতিমালা অনুসরণ তো দূরের কথা, এই জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের বা গ্রহণেরই প্রশ্ন ওঠে না। ইসলামী অর্থনীতির সাথে এখানেই অন্যান্য অর্থনীতির মৌলিক তফাৎ।

৮. ইসলামী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষি বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন যখন বৃদ্ধি পায় তখন বহু বড় শিল্পপতি হাজার হাজার একর জমি সস্তায় কিনে একই সঙ্গে ভূস্বামী হয়ে বসে। নব্য জমিদাররা বহু ক্ষেত্রেই শক্তির দ্বারা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। কৃষি কাজে জমির পূর্ণ ব্যবহারে ক্রমশঃ ভাটা পড়ে বহু দেশেই। একই সঙ্গে ব্যারণ লর্ড মার্কুইস পীয়র মনসবদার জমিদার জায়গীরদার তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীদের শোষণ বাড়তে থাকে।

এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমির ব্যক্তি মালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, ব্যক্তিকে জমি থেকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় আনা হয়েছে। এজন্যে লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। বন্দী শিবির বা কনসেনট্রেন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে আরও বহু সহস্রকে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে। মালিকানা বঞ্চিত কৃষকদের রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারে জবরদস্তি করে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিনিময়ে তাদের ভরণ-পোষণের ন্যূনতম পারিশ্রমিকও জোটেনি।

এই উভয় প্রকার ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাই বঞ্চনামূলক ও স্বভাববিরোধী। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্ট না হয় সেজন্যে ইসলাম তার অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিস্বত্ব নীতি ঘোষণা করেছিল। আল-কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন-

"জমি আল্লাহ্ তায়ালার। তাঁর বান্দাহদের মধ্যে থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারত্ব দান করে থাকেন।" (সূরা আল-আরাফ : ১২৮ আয়াত)

ইসলামী অর্থনীতিতে মাত্র এক প্রকার ভূমিস্বত্বই স্বীকৃত-রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি ভূমি মালিকের সম্পর্ক। কোন প্রকার মধ্যস্বত্বের অবকাশ ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। সে কারণে শোষণও নেই। জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি। সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ পংগু অসুস্থ শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা নিজে চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীমের (সা.) নির্দেশ হচ্ছে-

"যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে।" (ইবনে মাজাহ)

"যে লোক পোড়ো ও অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষাযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে।" (আবু দাউদ)

আজ কিছু দেশ প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে ফসলের দাম কমে যাবার ভয়ে হাজার হাজার একর জমি ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা হচ্ছে। এর প্রতিবিধানের জন্যেই ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত না রাখতে ইসলামে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদী জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেবে। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মূখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে ইসলাম।

৯. উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন

মানবতার মুক্তিদূত মহানবী মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা.) আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। কোন কোন ধর্মে পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। হিন্দু ধর্মে চালু ছিল যৌথ পরিবার প্রথা। এই প্রথা দুটির মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ম নজর ছিল হিন্দু, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মের। কেননা সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে না বিশেষ একটি শ্রেণীর হাতে যারা অর্থ বলেই সমাজের প্রভুত্ব লাভে সমর্থ হবে। এরাই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরনের সমাজবিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়।

এরই প্রতিবিধানের জন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং আল্-কুরআনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন ও নীতিমালা ঘোষণা করেছেন (দ্রষ্টব্য : সূরা আন্-নিসা : ১১-১২ আয়াত)। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এই আইন যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে না। ছলে-বলে-কৌশলে ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে ইয়াতীমদের, বিধবা ভ্রাতৃবধুদের, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের, বোনদের, খালা-ফুফুদের। ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। এর প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত সমাজে যুলুম ও বঞ্চনা চলতেই থাকবে। অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হয়ে রইবে হাজার হাজার বনি আদম। এই অবস্থা নিরসনের জন্যে ইসলামী মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয় তার সঠিক প্রেক্ষিতেই।

১০. ব্যবসায়িক অসাধুতা ও সব ধরনের জুয়া উচ্ছেদ

সকল প্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু নিন্দনীয়ই নয়, কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমানে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দেশের সরকার খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ করে থাকে। কারণ এসব ব্যবসায়ীরা হয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা করে অথবা দেশের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। কোন কোন দেশে তো ব্যবসায়ীরা অবৈধ সুযোগ লাভের জন্যে সরকারকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে থাকে অথবা মোটা অংকের ঘুষ দেয়। অবস্থার আজ এতদূর অবনতি হয়েছে যে কয়েকটি দেশে অবৈধ ও নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায়ীরা রীতিমতো ছোট-খাট সেনাবাহিনী পুষে থাকে এবং সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়। ইসলামে মাদক দ্রব্য ও নেশার সামগ্রীর ব্যবসায় শুধু নিষিদ্ধ নয় বরং চোরাকারবারী, কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরীও নিষিদ্ধ। ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেওয়া, নকল করা প্রভৃতি জঘন্য ধরনের অপরাধ। মজুতদারীর মাধ্যমে দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলা হয় এবং হেন বস্তু নেই যা ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেলেই মজুত করে না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনগণের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে বারবার। ব্যবসায়িক অসাধুতার ফলেই জনসাধারণের জীবনে নেমে আসে নিদারুণ দুর্ভোগ। এমনকি বুলেটের আঘাতে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে, সরকারের রাজস্ব হ্রাস পায়।

আল্লাহর রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন- "যারা ওজনে কম দেয়, পরের জিনিস ওজন করে নিলে পুরো গ্রহণ করে কিন্তু অপরকে যখন ওজন করে দেয় তখন পরিমাণে কম দেয় এরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে।"

(সূরা আল-মুতাফফিফীন : ১-৩ আয়াত)

মজুতদারী থেকে ক্রমেই মুনাফাখোরীর মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়িক অসাধুতা হতেই নৈতিকতাবিরোধী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। উপরন্তু একথাও সর্বজনস্বীকৃত যে চোরাকারবার ও কালোবাজারের যোগফল যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে

তলাহীন পাত্রের মতো করে ফেলতে সক্ষম। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে সব ধরনের ব্যবসায়িক অসাধুতা শুধু নিষিদ্ধ নয়, বরং যারা এসব গণস্বার্থবিরোধী ও সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কাজে লিপ্ত তাদের সমুচিত শাস্তিরও বিধান রয়েছে। কেননা কেবলমাত্র এভাবেই আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে জুয়াকে তার সর্ববিধ রূপে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্র হতে এর উচ্ছেদ না হলে ইসলামী অর্থনীতি তার প্রকৃত কল্যাণধর্মী রূপ বাস্তবায়নে পুরোপুরি সমর্থ হবে না। আল-কুরআনে আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

"হে মুমিনগণ! জেনে রাখ, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং (গায়েব জানার জন্যে) পাশা খেলা, ফাল গ্রহণ ইত্যাদি অতি অপবিত্র জিনিস ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তবেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।"

(সূরা আল-মায়েদা : ৯০ আয়াত)

মূখ্যতঃ তিনটি কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে সব রকমের জুয়া ও ফটকাবাজারী (Speculation) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ জুয়ার কারণে প্রভূত অর্থের অপচয় ও মূল্যবান সময়ের অপব্যয় হয়। দ্বিতীয়তঃ জুয়া সামাজিক বিশৃংখলা ও নৈতিক অপরাধের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র জুয়ার কারণেই মানুষের মধ্যে কলহ-বিবাদ, মারামারি এবং খুন-জখম সংঘটিত হচ্ছে এরকম উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি। তৃতীয়তঃ জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক লোককে প্রতারণা করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। সুতরাং, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থেই ইসলামে সকল ব্যবসায়িক অসাধুতা নিষিদ্ধ ও সব ধরনের জুয়া উচ্ছেদের জন্যে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নেহী আনিল মুনকারের এই নির্দেশ বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই ইসলামী অর্থনীতি দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সাথে আখিরাতেরও কল্যাণ ও নাযাতও নিশ্চিত করে।

১১. ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ

ইসলামী অর্থনীতির মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুবিচার তথা আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করা। অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার এবং আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই 'মারুফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও 'মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে সুনীতিমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ রক্ষা এবং একই সঙ্গে আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে দুর্নীতি প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক যুলুম ও শোষণের পথ রুদ্ধ করা। রাষ্ট্র এই উপায়েই সুদ ঘুষ মুনাফাখোরী মজুতদারী চোরাচালানী কালোবাজারী পরদ্রব্য আত্মসাৎ সব ধরনের জুয়া হারাম

সামগ্রীর উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সকল প্রকারের অসাধুতা প্রভৃতি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকল নিপীড়ন ও শোষণমূলক কাজ সমূলে উৎপাটন করতে পারে।

অনুরূপভাবে যে সমস্ত সম্পদের সামাজিক মালিকানা থাকলে তার ব্যবহার সর্বোত্তম হবে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই তা থেকে সুবিধা বা উপকার পাবে সে সকল উপায় উপকরণই রাষ্ট্রের জিম্মাদারীতে থাকতে পারে। রাষ্ট্র যাকাত ও উশর আদায় এবং তার উপযুক্ত বিলিবন্টন, বায়তুলমালের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতির যথাযথ প্রয়োগ, করযে হাসানা ও মুদারিবাত ব্যবস্থার জন্যে আইন তৈরী এবং নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় ও প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একাজে রাষ্ট্র যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা হবে না, বরং সমাজে যুলুম ও বঞ্চনার সয়লাব বয়ে যাবে। একারণেই উপযুক্ত ক্ষেত্রে সীমিত মাত্রায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান রয়েছে ইসলামী অর্থনীতিতে। একই সাথে বেশ কিছু সম্পদের সামাজিক মালিকানাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে।

১২. সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা

যেকোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সমাজকল্যাণ কর্মসূচী ও জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহে এজন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের কোনটিই ইসলামী অর্থনীতির সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাত্মক জোর এবং সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। দরিদ্র জনগণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে বায়তুল মাল হতে ন্যূনতম মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধা প্রদানও সরকারের আবশ্যিক দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আল্-কুরআন ও সুন্নাহতে যে নির্দেশ রয়েছে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে গোটা সমাজদেহে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর।

জনকল্যাণের জন্যে ইসলামে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছাড়াও ব্যক্তির বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিকেও নিজস্ব সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ধন-সম্পদে অন্যেরও হক বা অধিকার রয়েছে। ইসলামেই সর্বপ্রথম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা আল-কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

"তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।" (সূরা আল-যারিয়াত : ১৯ আয়াত)

"তুমি আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।" (সূরা বনি ইসরাইল : ২৬ আয়াত)

"তোমাদের ধন-সম্পদে (যাকাত ছাড়াও) সমাজের অধিকার রয়েছে।" (তিরমিযী)

সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণের তথ্য জনসাধারণের হক আদায়ের জন্যে এই রকম জোরালো তাগিদ বা নির্দেশনা নেই। সেখানে রাষ্ট্র বা সরকার জনকল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ করে মর্জিমাফিক। কিন্তু ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শরীয়াহর দাবী অনুসারেই রাষ্ট্র ও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবেই দেশ ও দশের কল্যাণের জন্যে এগিয়ে আসতে বাধ্য। এই সমাজে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে যেমন বৈধ ও অবৈধের বা হালাল-হারামের প্রশ্ন তুলে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তেমনি সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে সমাজে সব বিশৃংখলা দূর করে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানও নিশ্চিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষ দিকটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব যৌথভাবে সরকার ও জনগণের।

উপরে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখার বারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হলো। এ থেকে ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ ও প্রকৃতি বোঝা যাবে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু ইসলামী অর্থনীতি কোন দেশে কোন অবস্থাতেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্যে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অর্থাৎ ইসলামের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি আইন-বিচার-প্রশাসন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ সবকিছুই যুগপৎ বাস্তবায়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে দরকার সেই মুসলমানেরও ঈমান ও আকীদার দিক দিয়ে, তাকওয়ার দৃষ্টিকোণ হতে যার তুলনা হতে পারে একমাত্র সে নিজেই। প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যায় তো তারই মধ্যে, প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে যে ঘোষণা করেঃ

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার রোযা, আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে।" (সূরা আল-আনআম : ১৬২ আয়াত)

সুদবিহীন অর্থনীতি বনাম ইসলামী অর্থনীতি

আমাদের সমাজে কিছু বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যারা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপরীতে সুদবিহীন অর্থনীতি বাস্তবায়নের কথা বেশ জোরে-শোরে বলে থাকেন। তারা জেনে বুঝে এমন বলেন, না এর মধ্যে কোন কূটচাল রয়েছে তা বোঝা ভারী মুশকিল। কারণ ইসলামী অর্থনীতি প্রসঙ্গে এরা রীতিমত নির্বাক। বাস্তবে সুদবিহীন অর্থনীতি কোনক্রমেই ইসলামী অর্থনীতির বিকল্প হতে পারে না। ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার কারণেই সুদবিহীন অর্থনীতির পক্ষ নিয়ে কথা বলেন এসব বুদ্ধিজীবীরা। ইসলাম যে এক সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা এবং *আমর বিল মা'রুফ* এবং *নেহী আনিল মুনকার* যে জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর বা Corner Stone, তাওহীদ, রিসালাত আর আখিরাত যার মূল দর্শন, সেই মৌলিক বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকার কারণেই প্রধানতঃ চিন্তার এই দুর্বলতা বা ভ্রান্তি দেখা দেয়। যথাযথ জ্ঞানের অভাব বিশেষতঃ মূল উৎস হতে না জানার কারণে পরের শেখানো বুলি আওড়াতে এদের সংকোচ বা আড়ষ্টতা দেখা দেয় না। বরং বাহাদুরী করে নিজেদের 'নতুন কথা' জাহির করার প্রবণতাই এক্ষেত্রে প্রবল হয়ে দাঁড়ায়।

অনেকে মনে করেন এবং জোর গলায় বলেনও- সেক্যুলার বা প্রচলিত অর্থনীতি হতে সুদ প্রত্যাহার করে নিলে ইসলামের সঙ্গে তার দূরত্ব দূর হয়ে যাবে। সুদ বিবর্জিত এই অর্থনীতিই হবে ইসলামী অর্থনীতি। এ ধরনের কথা সবচেয়ে বেশী শোনা যেত যখন সমাজতন্ত্র বেশ কয়েকটি দেশে পেশীশক্তির জোরে ক্ষমতায় ছিলো। কেউ কেউ আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি প্রায় একই রকম এমনও মত প্রকাশ করতো। তবে এসব প্রচারণা যে এক অর্থে গভীর দূরভিসন্ধিমূলক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ যুগে যুগে মুরতাদরা ও ইহুদী-খৃষ্টানদের কাছে বিবেক বিক্রি করে দেওয়া তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ইসলামের লেবাস ধরে ভিতর থেকেই তার শিকড় কেটে তাকে তিলে তিলে দুর্বল তথা ধ্বংস করে দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে গেছে।

ইসলামী অর্থনীতি বলতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সামগ্রিক এক জীবন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেই বুঝায়। পক্ষান্তরে সুদবিহীন অর্থনীতি বলতে যা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় তাহলো, প্রচলিত অর্থনীতি হতে শুধু সুদকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। অর্থনীতির অন্যান্য প্রসঙ্গে ইসলামের যে নির্দেশ তথা শরীয়াহর বিধি-নিষেধ প্রতিপালিত হবে কিনা সে ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সেখানে নেই। তাই সেই অর্থনীতি যে প্রকৃতই ইসলামী অর্থনীতি হয়ে উঠতে অক্ষম তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ

করলেই ধরা পড়বে। এই দুই ধরনের অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে মেরুপরিমাণ ব্যবধান। নিচে সেই ব্যবধানের কারণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

প্রথমতঃ ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তির সাথে সুদবিহীন অর্থনীতির দর্শনের কোনই মিল নেই। কারণ তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাত ইসলামী অর্থনীতির মৌল দর্শন। কিন্তু সুদবিহীন অর্থনীতির প্রবক্তারা এধরনের কোন দর্শনের কথা বলেন না। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে সুদকে উচ্ছেদ করাই যথেষ্ট বলে মনে করেন। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতিতে যে ভোগবাদী দর্শন সতত কার্যকর, ব্যক্তিপূজা তথা ইন্দ্রিয় বাসনা চরিতার্থতা যার সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু তা পরিত্যাগ বা উচ্ছেদের কোন কথা তারা বলেন না। পরকালীন মুক্তি অর্জনের জন্যেই যে ইহকালীন প্রচেষ্টা চালানো অতি আবশ্যক এই সত্য সম্বন্ধে তারা রহস্যজনকভাবে নীরব। বস্তুতঃ দার্শনিক ভিত্তির ভিন্নতাই দুই অর্থনীতির মধ্যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। কোনভাবেই এ দুয়ের মধ্যে সাযুজ্য বা যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী অর্থনীতির সকল কার্যক্রমের ভিত্তি হলো যুগপৎ *আমর বিল মা'রুফ* এবং *নেহী আনিল মুনকার*-এর প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ, সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি উচ্ছেদের সর্ববিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। অর্থনীতির যে কোন পদক্ষেপে, কর্মকৌশলে বা নীতিমালায় এর ব্যত্যয় ঘটলে তা হবে ইসলামী শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। ন্যায় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অন্যায় ও যুলুমের উচ্ছেদ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সুদবিহীন অর্থনীতিতে এমন বৈশিষ্ট্য আদৌ লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র সুদ বর্জনই তার লক্ষ্য, সমাজের সর্বস্তরে কল্যাণ ও মঙ্গলবোধের প্রতিষ্ঠা তার কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য নয়। ফলে ইসলামী অর্থনীতি যে সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলময় এবং সুবিচারপূর্ণ অর্থনীতি তথা সমাজ জীবনের পরিচয় দেয় সুদবিহীন অর্থনীতিতে তার লেশমাত্রও লক্ষ্য করা যায় না।

তৃতীয়তঃ বর্তমান কালের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি যে ব্যাংক ব্যবস্থা তা থেকে শুধু সুদ প্রত্যাহার করে নিলেই কাঙ্খিত কল্যাণ লাভ আদৌ সম্ভব নয়। কারণ ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী হওয়ার কারণেই ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানগুলো হারাম ও সমাজবিধ্বংসী কোন কাজে অংশ নেবে না বা সে ধরনের কোন কাজে বিনিয়োগও করবে না। কিন্তু সুদবিহীন অর্থব্যবস্থায় এ ধরনের কোন নিশ্চয়তার সুযোগ নেই। ব্যাংক বা ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সুদ না নিয়েও মুনাফার অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সিনেমা হল তৈরী বা মদের কারখানা পরিচালনার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করলে তাতে বাধা দেবার কেউ নেই। এখানেই ইসলামী অর্থনীতির সাথে সুদবিহীন অর্থনীতির মৌলিক তফাৎ।

চতুর্থতঃ ইসলামী অর্থনীতিতে সকল ক্ষেত্রেই হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলার প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখা হয়। হালাল বা বৈধ উপায়ে উপার্জন এবং বৈধ উপায়েই তা

ব্যয়ের প্রতি বিশেষ তাগিদ থাকে এই অর্থনীতিতে। এই অর্থনীতিতে হারাম উপায়ে উপার্জন তো পরিত্যাজ্যই, সেই সঙ্গে বৈধ উপায়ের উপার্জনও হারাম পথে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে সুদবিহীন অর্থনীতিতে সুদের উচ্ছেদই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়, অন্য কিছু নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন ভোগ বন্টন উপার্জন বিনিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন নীতি-নৈতিকতা বা শেষ সীমার প্রশ্ন নেই। ভোগবাদী এই ব্যবস্থায় যেসব পন্থায় উৎপাদন বা যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাজের জন্যে ক্ষতিকর ও শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং যেসব পন্থায় ব্যয় বা ভোগ সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিকারী সেসবও অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। সুদবিহীন অর্থনীতিতে এর কোন ব্যতিক্রম ঘটবে এমন ভাববার কোন কারণ নেই। এ বিষয়ে সুদবিহীন অর্থনীতির প্রবক্তাদের নীরবতা এক কথায় রহস্যজনক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অবৈধ বা হারাম উপায়ে উপার্জন বন্টন বিনিয়োগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইসলামী অর্থনীতিতে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথমতঃ অবৈধ উপায়ে আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা পদ্ধতিতে যুলুম চালানো হয়। দ্বিতীয়তঃ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও সমাজবিধ্বংসী কার্যক্রমসমূহ মূলতঃ এ ধরনের অবৈধ বা হারাম অর্থনৈতিক কার্যক্রমেরই ফসল। তৃতীয়তঃ অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়েই ব্যয় হয়। অবৈধ কাজে ধন-সম্পদ ব্যবহারের অর্থই হলো সামাজিক অবিচার ও পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া। পরিণামে সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এজন্যেই ইসলামী অর্থনীতিতে হারাম উপায়ে উপার্জন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন-হালাল রুজী ঈমানের দশ ভাগের নয় ভাগ। তিনি আরো বলেন- হারাম রুজী হতে উৎপন্ন রক্ত ও মাংস দোজখের আগুনের খোরাক।

পঞ্চমতঃ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও দাবী হলো যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। যাকাত ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের অন্যতম। এটি যথাযথভাবে পালিত না হলে ইসলামের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্যে রাসূলে আকরামের (স.) মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যখন ভণ্ড নবীদের চাপের মুখে হযরত উমার (রা.) পর্যন্ত সাময়িকভাবে যাকাত আদায় রহিত করার প্রস্তাব করেছিলেন সে সময় মুসলিম উম্মাহর প্রথম আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) খুব স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়তার সাথে যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। যাকাতের মাধ্যমে যেমন সমাজে ধনবৈষম্য হ্রাস পায় তেমনি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত জনগণ সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ পায়। সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থার প্রবক্তরা যাকাত আদায় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোনই মন্তব্য করেননি। এর প্রবক্তারা যেন ধরেই নিয়েছেন সুদ উচ্ছেদ হলেই গোটা অর্থনীতি ইসলামী হয়ে যাবে।

ষষ্ঠতঃ ইসলামী অর্থনীতিতে কৃষিনীতি, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, বর্গাচাষ ও উশর আদায় সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও তাগিদ রয়েছে সুদবিহীন অর্থনীতিতে তার লেশমাত্রও নেই। অথচ সমাজের বৃহত্তম অংশ কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। যাকাতের মত উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ধনবৈষম্য দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। নিম্নবিত্ত, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের কল্যাণ ও আর্থিক বুনিয়াদের নিশ্চয়তা না থাকলে শুধু গ্রাম অঞ্চলে নয়, সমগ্র সমাজ কাঠামোতেই বিপত্তি নেমে আসে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তীব্রতর হয়। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতি হয়ে দাঁড়ায় ভারসাম্যহীন। এর উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে হলে কৃষি জমির মালিকানা, বর্গাচাষ, ভূমি রাজস্ব এবং উশর আদায় বিষয়ে ইসলামের নীতি-নির্দেশনা মানতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে কোন প্রকার মধ্যস্বত্বের অবকাশ নেই। জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি-সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক বা ব্যক্তিরই হোক। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মূখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমিস্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে ইসলাম। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সুদবিহীন অর্থনীতির তাত্ত্বিকরা এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ।

সপ্তমতঃ ইসলামী অর্থনীতির অপর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর ঘোষণা অনুসারে উত্তরাধিকার নীতি বাস্তবায়ন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বের উত্তরাধিকার আইন ছিলো অস্বাভাবিক। পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ। খৃষ্টান ইহুদী হিন্দু বৌদ্ধ সকল ধর্মেই মোটামুটিভাবে একই ধরনের প্রথা বিরাজমান ছিলো। এর পিছনে যে দর্শন কাজ করতো তা হলো সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। তা যেন বিভক্ত হয়ে অন্য মালিকানায় চলে না যায়। এভাবে পুরুষানুক্রমে সম্পত্তি একই পরিবারের দখলে থাকায় তাদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপ্রত্তি তথা শোষণ ও পীড়নের সুযোগ থাকতো অব্যাহত ও অটুট। উপরন্তু মহিলারা ছিলো সর্বদাই বঞ্চিত। তারা যে সমাজের দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অর্ধাংশ এই সত্যটি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে স্বীকারই করা হতো না। ইসলামই সর্বপ্রথম সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি কন্যা স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সুদবিহীন অর্থনীতির আলোচনায় এ প্রসঙ্গে কোন দিকনির্দেশনাই নেই। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে তারা পুঁজিবাদী উত্তরাধিকার পদ্ধতিরই স্বীকৃতি দিয়েছে যা যুলুমেরই নামান্তর।

অনুরূপভাবে অর্থনীতিতে আদল ও ইনসাফের প্রয়োগ, শ্রমিকদের অধিকার আদায়, রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিধি ও প্রয়োগ, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারেও সুদবিহীন অর্থনীতিতে কোন দিকনির্দেশনা নেই। এমনকি জনগণের মৌলিক পাঁচটি প্রয়োজন অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য বাসস্থান ও শিক্ষা বিষয়েও সুদবিহীন অর্থনীতিতে কোন প্রস্তাবনা নেই, নেই কোন নীতি নির্ধারণী কৌশল। অথচ ইসলামী অর্থনীতিতে জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে কঠোর তাগিদ রয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, উপায় থাকতেও যে স্বেচ্ছায় ভিক্ষা করে, কিয়ামতের দিন তার জঠর জাহান্নামের আগুনে ভরে

যাবে। এরই বিপরীতে উপায়হীন ক্ষুধাতুর মানুষের দুঃসহ যাতনার কথা মনে রেখেই দয়ার নবী মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাইলে আধখানা খেজুর হলেও মিসকিনের হাতে তুলে দিও। নিরন্ন-বুভুক্ষু মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রখ্যাত মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, বায়তুল মালের তহবিল হতে দরিদ্র-নিরন্ন মানুষের এই প্রয়োজন মিটানো সম্ভব না হলে ধনীদের উপর আরো কর আরোপ করতে। তাতেও সংকুলান না হলে তাদের কাছ থেকে ধার নিতে। এতেও প্রয়োজন পূরণ না হলে ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার রায় দিয়েছেন তিনি। এ ধরনের সুপারিশ বা নীতিমালা গ্রহণের নির্দেশনার লেশমাত্র লক্ষ্য করা যায় না সুদবিহীন অর্থনীতির প্রবক্তাদের লেখায়-আলোচনায়।

বস্তুতঃ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইহকালের জীবনকে পরকালের জন্যে পাথেয় উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহারই ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। এই নশ্বর জীবন যেন শুধু ভোগ-বিলাসেই শেষ না হয়ে যায়, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ইহকালীন জীবন যেন শান্তি ও সমৃদ্ধির হয় এবং পরকালের জীবনে মুক্তি লাভ ও আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হওয়া যায় মুমিনের এই বাসনা চরিতার্থ করাই ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার কোন অর্থনীতিরই-তা সে পুঁজিবাদই হোক বা সেক্যুলারই হোক কিংবা হোক সুদবিহীন- এই বৈশিষ্ট্য নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আন্দালুশিয়া হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ নয়শত বছর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার গৌরবোজ্জ্বল যুগে ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণময় স্পর্শে তখন না ছিলো শ্রেণীবৈষম্য, না ছিলো ক্ষুধাতুর মানুষের মিছিল। আজও সেই ইসলাম রয়েছে, রয়েছে মুসলমানরাও। তাদের মোট সংখ্যা বিশ্বজনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু মুষ্টিমেয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাদ দিলে তারা আজ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবনের দাসানুদাস। উপরন্তু মাযহাবী ভিন্নতা ও নানা ধরনের শিরক ও বিদআত আজ ইসলামের প্রাণশক্তিকে গ্রাস করেছে। ইসলাম আজ ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। তাকে শৃংখলমুক্ত করতে পারলে আবারো মুসলিম জাহানে ফিরে আসবে তার হৃত গৌরব, সৃষ্টি হবে নতুন এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

ইসলামী ভোক্তার স্বরূপ

১. ইসলামী ভোক্তা কে?

"আমি তাদের পরে তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তা পরীক্ষা করার জন্যে।" (সূরা ইউনুস : ১৪ আয়াত)

এই আয়াতেই স্পষ্ট হয়ে গেছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করে আর একটি জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন মূলতঃ তাদের আচরণ পরীক্ষা করার জন্যে, আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্যে।

মানুষের পার্থিব জীবনে যত ধরনের আচরণ রয়েছে ভোগের ক্ষেত্রে আচরণ সেসবের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু ভোগ করতেই হয় তার জীবন যাপনের জন্যে। আবার তার পরিবার পরিজন রয়েছে, রয়েছে আত্মীয়-স্বজন। তাদের প্রতিও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সব মিলিয়ে তার সামষ্টিক ভোগের পরিধি বেশ বড়ই। এক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে, রয়েছে শরীয়াহর আহকাম। সেসব মেনে চলাও একজন মুমিনের জন্যে মৌলিক পরীক্ষা।

ভোগ হয় রিযিক বা সাধারণ অর্থে খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যয় ও ব্যবহারের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধি-বিধান মেনে চলার জন্যে জোর তাগিদ রয়েছে ইসলামী শরীয়াহতে। রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন- "হালাল রুজী ঈমানের দশ ভাগের নয় ভাগ।"

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে- "আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া কবুলের অন্যতম শর্ত হালাল রুজীর উপর বহাল থাকা।" (মুসলিম)

একজন মুমিন ভোক্তা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সব সময় শুধুমাত্র হালাল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করবে এবং হারাম দ্রব্য ও সেবা বর্জন করবে। ইসলামী পরিভাষার আলোকে ঐসব দ্রব্যকে হালাল দ্রব্য বলা হয় যার নৈতিক ও আদর্শগত গুণাগুণ থাকে, যেগুলোর ভোগ উপকার ও কল্যাণই বয়ে আনে। আজকের দিনে মুসলমানরা সাধারণভাবে হালাল রুজী বা রিযিকের তথা ভোগের উৎসের ব্যাপারে কতখানি মনোযোগী বা সতর্ক সে প্রশ্নে না গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম এবং ইমামরা কেমন আমল করতেন, কতটা সতর্ক ছিলেন এ ব্যাপারে তার দু'একটা উদাহরণ আমাদের চোখে খুলে দিতে পারে।

সিদ্দীকে আকবর আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁকে একজন খাদেম দেওয়া হয়েছিলো রাষ্ট্রের পক্ষ হতে তাঁর ব্যক্তিগত কাজে সহায়তার জন্যে। এই খাদেমের অন্যতম দায়িত্ব ছিলো খলীফার খাবারের প্রতি মনোযোগ রাখা ও তা পরিবেশন করা। খলীফারও অভ্যাস ছিলো খাবার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর খাওয়া। একদিন তিনি খাবারের শুরুতে খাদেমকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলেন সেদিনের খাবার কোথা হতে কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। খাওয়ার শেষ পর্যায়ে তিনি যখন খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন সে জবাবে জানালো আজকের খাবারে উৎকৃষ্ট মধু ও দুধ রয়েছে। এগুলো তাকে দিয়েছে এক গোত্রের লোকেরা। কারণ হিসেবে জানালো সে যখন কাফির ছিলো তখন যাদুমন্ত্র জানতো। তাতে অনেকের উপকারও হতো। এই গোত্রের লোকেরা তার কুফরী কালের যাদুমন্ত্রে উপকৃত হয়েছিলো। তাদের সাথে আজ হঠাৎ দেখা হওয়ায় তারা কৃতজ্ঞতাবশতঃ উৎকৃষ্ট মধু ও উটের দুধ তাকে দিয়েছে উপঢৌকন হিসেবে। সেটাই সে খলীফার আজকের খাবার প্রস্তুতের কাজে লাগিয়েছে।

একথা শুনে খলীফা খুব রাগতঃস্বরে বললেন, তুমি তো আমাকে বরবাদ করে দিয়েছ। এরপর গলার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে তিনি বমি করতে চেষ্টা করলেন এবং এক সময়ে তিনি গলা থেকে রক্ত বের করে ফেললেন। এই সংবাদ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) কাছে পৌঁছালে তিনি দেখতে এলেন আমীরুল মুমিনীনকে। সব শুনে তিনি বললেন, সন্দেহজনক খাদ্য বমি করে ফেলে দিয়েছেন সেটা ভালোই হয়েছে। কিন্তু রক্ত বের করার মতো ক্লেশ তিনি না করলেই পারতেন। তার উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) জবাব দিয়েছিলেন- "উমার, তুমি কি শোন নি রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন হারাম খাদ্যবস্তু হতে শরীরে যে রক্ত-গোশত পয়দা হয় তা দোযখের আগুনের খোরাক।" এরপর হযরত উমার নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

ইমামে আযম হযরত আবু হানীফা (রহ.) একজন বড় মাপের বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর দোকানের কর্মচারীদের একটা কাপড় দেখিয়ে বললেন সেটাতে একটা খুঁত রয়েছে। বিক্রির সময়ে সেটা যেন অবশ্যই ক্রেতাকে দেখানো হয়। দিনশেষে হিসাব নেবার সময়ে তিনি কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেন ঐ খুঁতযুক্ত কাপড়টিও বিক্রি হয়ে গেছে কিনা। তারা হাঁ-সূচক উত্তর দিলো। তিনি জানতে চাইলেন তারা খুঁতটার কথা উল্লেখ করেছিলো কি না? তারা নিরুত্তর রইলো। হযরত আবু হানীফা (রহ:) সেদিনের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করে দিলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন- খুঁতযুক্ত কাপড়টার জন্যে যে উচিৎমূল্য আদায় করা হয়েছে সেই দিরহাম কোনগুলো? যেহেতু সেগুলো চিহ্নিত করার সুযোগ নেই তাই সন্দেহযুক্ত আয় পারিবারিক কাজে লাগিয়ে তিনি ঈমান ও আমল বরবাদ করতে চাননি। সত্যিকার ইসলামী ভোক্তার স্বরূপ তো এটাই। আমাদের দেশের মুসলমান ব্যবসায়ীদের কতজন এই ঘটনা জানেন?

গভীর পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়, ইসলামী মূল্যবোধ বিবর্জিত ভোগলিপ্সা আজ মুসলমানদের চরম দুনিয়ামুখী করে তুলেছে। আখিরাতের চাইতে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরার অশুভ প্রবণতা তার ঈমানের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছে। তাই একদা যে বিশ্ব তার বশীভূত ছিল আজ সেই-ই বিশ্বের বশীভূত হয়ে পড়েছে। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। সেজন্যে চাই সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগ। ইসলামী অর্থনীতি তথা একজন মুসলমানের অর্থনৈতিক জীবনাচরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ছাড়া তা অসম্ভব।

ইসলামের দাবী হলো প্রকৃত মুসলমান সচেতনভাবেই তার সকল আচরণের দ্বারা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। এজন্যে আপাতঃ বা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষতি মনে হলেও সে তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নেবে। সে হালাল রিযিক অর্জনের জন্যে যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে তেমনি হারাম বর্জনের জন্যেও তার মধ্যে বিরাজ করবে জিহাদী জযবা। দুনিয়ার এই নশ্বর জীবনে ক্ষণিকের সুখভোগের জন্যে সে কোনোক্রমেই অনন্ত আখিরাতের জীবনকে বরবাদ করবে না। একমাত্র মরদুদ শয়তানের কুহকে পড়লেই সে এটা করতে পারে। মনে রাখতে হবে, একজন মুসলমানের তথা ইসলামী ভোক্তার আচরণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাস দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। এর কোনো ব্যত্যয় হলে তওবা করে তা থেকে ফিরে না আসলে কঠিন শাস্তিময় দোযখ তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

২. ইসলামী ভোক্তার বৈশিষ্ট্য

বস্তুতঃ একজন ইসলামী ভোক্তার প্রধান ও মূল বৈশিষ্ট্য হলো তার ভোগসম্পর্কিত আচরণের মাধ্যমে সব সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা চালানো। অন্যভাবে দেখলে ভোগ আচরণকে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা পন্থা হিসেবে গণ্য করে। তার এই লক্ষ্য অর্জনে ভোগ আচরণ ইসলামী যুক্তিশীলতা (rationalism) দ্বারা পরিচালিত যা ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা নির্দেশিত। অপরপক্ষে একজন অমুসলমান বা পুঁজিবাদী ভোক্তার আচরণ অর্থনৈতিক যুক্তিশীলতা দ্বারা পরিচালিত, যা তার নিজ স্বার্থের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ মনযের কা'ফ ভোক্তার আচরণ বিশ্লেষণে ভোক্তার ইসলামী মূল্যবোধকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েছেন। যথা:

(১) শেষ বিচারের দিনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস;
(২) ইসলামী সাফল্যের উপর বিশ্বাস; এবং
(৩) ইসলামী ধন-সম্পদের প্রতি বিশ্বাস।

শেষ বিচারের দিনের তথা আখিরাতের প্রতি একজন ভোক্তা যখন পূর্ণ বিশ্বাস রাখে অর্থাৎ পরকালের অনন্ত শান্তি ও পুরস্কার প্রাপ্তি অথবা ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে তখন তার আর শরীয়াহর নির্দেশ লঙ্ঘন করার সুযোগ থাকে না। ইসলামী

সাফল্যের উপর বিশ্বাসের অর্থ হলো ইসলামী সাফল্য অর্জিত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে, নিছক ধন-সম্পদ অর্জনের মধ্য দিয়ে নয়। তাই ইসলামী ভোক্তার মূল লক্ষ্যই থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াস। ইসলামী ধন-সম্পদের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো ইসলামে ধন-সম্পদের সুনির্দিষ্ট পৃথক কিছু তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসেই তার উল্লেখ রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন-

"তুমি যা খাও তা নিঃশেষ করে ফেলো, যে পোশাক পরো তা ব্যবহার করে ফুরিয়ে ফেলো, আর যা দান করো তা তোমার পরকালের জন্যে সঞ্চয়। এছাড়া তুমি প্রকৃতপক্ষে আর কোনো ধন-সম্পদের অধিকারী নও।" (মুসলিম)

একজন ইসলামী ভোক্তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো সে তার মোট ব্যয়কে দুই অংশে ভাগ করে- পার্থিব ব্যয় ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়। পার্থিব ব্যয় বলতে নিজের ও পরিবার-পরিজনদের জন্যে ব্যয়কে বোঝানো হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় বলতে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে ব্যয় এবং গরীব-মিসকীন অসহায় ও দুঃস্থজনদের জন্যে ব্যয়কে বুঝানো হয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে বিত্তশালীদের ধন সম্পদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গরীব-দুঃখীদের হক বা অধিকার নিশ্চিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন-

"তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের"।
(সূরা আল-যারিয়াত : ১৯ আয়াত)।

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-"আত্মীয়-স্বজনদের তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত মুসাফিরকেও"। (সূরা বনি ইসরাইলঃ ২৬ আয়াত)

ইসলামী ভোক্তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো সে সম্পদ মজুদ করে না। তাকে সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে অবশ্যই উপার্জন করতে হবে এবং আপৎকালীন খরচ মেটাবার জন্যে তাকে সঞ্চয়ও করতে হবে। এই সঞ্চয় তাকে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগও করতে হবে। কারণ বিনিয়োগে ব্যর্থ হলে সঞ্চিত অর্থের যাকাত আদায় করতে গিয়ে তার সঞ্চয় নিসাব এর নিচে চলে আসতে পারে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শুরুতেই মুমিন হওয়ার যে শর্তাবলী আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সেখানেও আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হতে তারই রাস্তায় ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (দ্রষ্টব্যঃ সূরা আল-বাকারাহ : ৩ আয়াত)। *ইনফাক ফি সাবিল আল্লাহ* মোট ব্যয়ের ঐ অংশকে বোঝায় যা একজন ভোক্তা কোনও প্রকার পার্থিব সুবিধা বা প্রতিদানের আশা না করেই আল্লাহর পথে ব্যয় করে শুধুমাত্র তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে। অবশ্য এজন্যে সে আখিরাতে পুরস্কৃত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ স্বয়ং আল-কুরআনে বলেছেন, তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদের আহার্য দান করে। তারা বলে :

"কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।"

(সূরা আদ্-দাহর : ৮-৯ আয়াত)

একজন ইসলামী যুক্তিশীল ব্যক্তি চিন্তা করবে তার নিকট যা কিছু রয়েছে তা সবই আল্লাহর দান বা আমানত। যদি সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর প্রতি ব্যয় করা হয় তবেই মাত্র তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের হক আদায় হবে। যাকাত সাদাকাহ ফিতরা ইত্যাদির বাইরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বেচ্ছাধীন দানই *ইনফাক ফি সাবিল আল্লাহ* বলে বিবেচিত।

এর বিপরীতে একজন অমুসলিম ভোক্তার লক্ষ্য হচ্ছে : Eat, Drink and be Merry"। অর্থাৎ, খাও-দাও পান করো আর ফূর্তি করো। কারণ তার বোধ-বিশ্বাসে পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার প্রসঙ্গই নেই। নশ্বর এই জীবনে সে ভোগ করবে চূড়ান্ত ভাবে এবং সেখানে হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধতার প্রশ্ন নেই। ভারতীয় জীবন দর্শনের সাথে পাশ্চাত্যের এই জীবন দর্শনের খুব একটা অমিল নেই। সেখানেও জীবনকে আকণ্ঠ ভোগ করতে বলা হয়েছে। এমনকি ঋণ করে হলেও। ভারতীয় দার্শনিক চার্বাক বলেন -

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ ॥"

অর্থাৎ, যতদিন বাঁচো, সুখেই বাঁচো, আর ঋণ করে হলেও ঘি খাও।

একজন ইসলামী ভোক্তার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো ভোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। তার আচরণ কৃপণের মতোও হবে না, আবার সে অমিতব্যয়ীও হবে না। আল্লাহ নিজেই এ সম্বন্ধে বলেন- "তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, এবং তাদের পন্থা হয় এ দুয়ের মধ্যবর্তী।" (সূরা আল-ফুরকান : ৬৭ আয়াত)। উপরন্তু ইসলামী ভোক্তা অপব্যয়কারীও হবে না। কারণ আল্লাহ অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ সূরা বনি ইসরাইলঃ ২৭ আয়াত)

ইসলামী অর্থনীতিতে কঠোর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন কিংবা লাগামহীন ভোগের কোন সুযোগ নেই। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

"তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না; তাহলে তুমি তিরস্কৃত নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।" (সূরা বনি ইসরাইল : ২৯ আয়াত)

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে অভাব ও প্রয়োজন

সনাতন অর্থাৎ অনৈসলামী ভোক্তার আচরণে ধরে নেওয়া হয় মানুষের অভাব অসীম এবং সকল ভোক্তাই তাদের সকল অভাব মেটাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। অভাবই ভোক্তার আচরণের প্রেরণা বা শক্তি যোগায়। এটা আবার উপযোগের উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ, কোনো দ্রব্যের উপযোগ থাকলে মানুষ তা ভোগ বা অর্জন করার চেষ্টা করে। ইসলামী অর্থনীতিতে কিন্তু অভাব ও উপযোগের এরকম ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। এখানে প্রয়োজন অভাবের এবং *মাসলাহ* উপযোগের স্থান দখল করেছে। প্রয়োজন ও অভাবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো- প্রয়োজন সসীম কিন্তু অভাব অসীম। প্রয়োজন মাসলাহ দ্বারা নির্ধারিত আর অভাব উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত। মাসলাহ শব্দটি আরবী। এর অর্থ কল্যাণ। কল্যাণ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কল্যাণের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে পার্থিব ও আখিরাতের কল্যাণ।

ইমাম আল-শাতিবীর মতে এ মাসলাহই জীবনের অপরিহার্য মৌলিক উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি মানুষের জীবনের অপরিহার্য পাঁচটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

১. *আল্-ঈমান* (বিশ্বাস);
২. *আন্-নফস* (জীবন);
৩. *আল্-মাল* (সম্পদ);
৪. *আল্-আকল* (বুদ্ধিমত্তা) এবং
৫. *আল্-নসল* (বংশধর)

যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবার এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান বিকাশের ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোর মাসলাহ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই মাসলাহধর্মী দ্রব্য ও সেবাই ইসলামী অর্থনীতিতে প্রয়োজন হিসাবে চিহ্নিত।

একজন ভোক্তার কাছে কোন দ্রব্য বা সেবার মাসলাহা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্যে সে নিজেই সর্বোত্তম বিচারক। উপযোগের সাথে এর পার্থক্য এই যে, একজন ভোক্তা কোন দ্রব্যের উপযোগ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্যে যেসব মানদন্ডের প্রয়োজন তা সে নিজেই নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু মাসলাহ্র ক্ষেত্রে সেসব মানদন্ড বাছাইয়ের ক্ষমতা কোন ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এগুলো এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও স্থির। পক্ষান্তরে ব্যক্তির মাসলাহ সামাজিক মাসলাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপরে মানব জীবনের যে পাঁচটি মৌলিক উপাদানের কথা বলা হয়েছে তা যেমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি তা গোটা সমাজের জন্যেও প্রযোজ্য।

সনাতন অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যের উপযোগ অর্থাৎ পার্থিব কল্যাণ থাকলে ভোক্তারা তার অভাব অনুভব করে। পক্ষান্তরে কোনো দ্রব্যের মাসলাহ অর্থাৎ পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ উভয়ই থাকলে একজন ইসলামী ভোক্তা তার প্রয়োজন অনুভব করে। ইমাম আল-শাতিবী ইসলামী শরীয়াহর পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনকে তিন স্তরে ভাগ করেছেন। যথা-

(ক) *যরুরীয়াত* বা অত্যাবশ্যকীয়;
(খ) *হাজিয়াত* বা পরিপূরক, এবং
(গ) *তাহসানিয়াত* বা উন্নতিমূলক।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে যে বস্তুগুলো যরুরীয়াত বা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত সেগুলো হলো-

১. জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ। অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার দাবী মেটানো;
২. সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয়রোধ ও অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করা থেকে বিরত রাখা;
৩. যাবতীয় নেশার সামগ্রী এবং বিচার শক্তিকে কলুষিত করে এমন সব দ্রব্যের উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ;
৪. যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করা।

হাজিয়াতের মধ্যে ঐসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর সরবরাহ বা ব্যবহার ব্যক্তি মানুষের জীবনকে কঠোরতা হতে কিছুটা আরাম বা স্বস্তির দিকে নিয়ে যায়। *তাহসানিয়াত* তার চেয়ে আরও এক ধাপ উপরে। এখানে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করা হয়, ব্যবহার করা হয় অথবা সেবা পাওয়া যায় তা জীবন-যাপনের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ পেশাদারী জীবন বা বিশেষজ্ঞদের জন্যে যা হাজিয়াত বলে বিবেচ্য সাধারণ লোকের জন্যে তাই-ই তাহসানিয়াত বলে বিবেচ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এয়ারকুলার কোনো গবেষণাগারের জন্যে *যরুরীয়াত*, প্রতিষ্ঠানের জন্যে *হাজিয়াত* এবং বাস গৃহের জন্যে *তাহসানিয়াত* হিসাবেই গণ্য হবে।

মনে রাখা দরকার প্রকৃত ইসলামী ভোক্তার আচরণ ইসলামী জীবনেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমাদের চরিত্রে ও বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন যত বেশী ঘটবে ততই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবো। হালাল রুজী উপার্জন ও মাসলাহ্ প্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের নশ্বর জীবন হোক কল্যাণময় এবং আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির মাধ্যমে হোক চরম সফলতাময়। এজন্যে আমাদের জীবন যাপনে তথা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রতিফলিত হতে হবে ইসলামী ভোক্তার সঠিক স্বরূপ।

ইসলামী অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বন্টন

১.

আয় ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের উপরই নির্ভর করে একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি। দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পূঞ্জীভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। সমাজে কি ধরনের অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে তার উপরেই নির্ভর করে আয় ও সম্পদ বন্টন সুষ্ঠু হবে, না বৈষম্যপূর্ণ হবে। সম্পদের মালিকানার ধরন, আইনগতভাবে তার পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উপরে আয় ও বন্টনের সাম্য বা বৈষম্য নির্ভর করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সম্পদের স্বাধীন ও নিরংকুশ মালিকানা ভোগ করে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র কিছু আইন প্রণয়ন ও কর আরোপ করে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু খাত রাষ্ট্রের নিজস্ব জিম্মাদারীতেও থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সততা এবং নৈতিকতার উপর কিছুমাত্র নজর দেয় না। যেহেতু নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা এবং পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা পুঁজিবাদী দর্শনের ভিত্তি নয় সেহেতু পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ নানা কৌশলে, সাধারণতঃ অসৎ ও অবৈধ উপায়ে আয়-উপার্জনের চেষ্টা করে।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানার সীমারেখা খুবই সংকুচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে আয় ও সম্পদ বন্টন পুরোপুরি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল। এই খেয়াল-খুশী যে কতখানি ব্যক্তিনির্ভর তা আজকের দুটি বৃহৎ সমাজবাদী দেশ-সোভিয়েত রাশিয়া ও গণচীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই উপলব্ধি হবে। ইসলাম এই দুই চরমধর্মী প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি রয়েছে; আয়, ভোগ, বন্টন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্যের অঙ্গীকার রয়েছে। কিন্তু কোনটিই লাগামহীন নয়, নিরংকুশভাবে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বা রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত নয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র আল-কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পথেই সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করবে; সমাজে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হবে, বৈধতার ভিত্তিতেই উপায়-উপার্জন করবে এবং সম্পদের মালিকানা ও বন্টন নির্ধারিত হবে।

মূলতঃ অসৎ ও অবৈধ উপায়ে উপার্জনের ফলেই সমাজে ধনবন্টন বৈষম্য দেখা দেয়। এসব অসৎ ও অবৈধ উপায়কে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ

অবৈধ উপায়ে আয়ের সুযোগের মধ্যে রয়েছে মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ঘুষ, কালোবাজারী, ফটকাবাজারী প্রভৃতি। এসব অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে ব্যক্তির হাতে সম্পদের পাহাড় জমে ওঠে। যে সমাজে নৈতিক দিক দিয়ে এসব অবৈধ পন্থা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই সে সমাজে শুধু আইন প্রয়োগ করে কোন সাফল্য অর্জিত হয় নি, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। দ্বিতীয়তঃ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখার সুযোগ। এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে ধনসম্পদ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হতে না দেওয়া। সম্পদ এখানে শুধুমাত্র বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে এবং সোনা-রূপা-হীরা-জহরত, বিপুল জমি, প্রাসাদোপম বাড়ী এবং অলংকারের মাধ্যমে বিত্ত ক্রমাগত মুষ্টিমেয় লোকের হাতে মজুদ হয়। কোনক্রমেই এই সম্পদ বিত্তহীন বা কম সৌভাগ্যবান লোকদের কাজে আসে না। শোষণের ও ধনবন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টির তৃতীয় যে বড় অবৈধ উপায় সমাজে বিদ্যমান তা হলো সুদ এবং মহাজনী প্রথার ঋণ। সুকৌশলে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের শোষণের সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার সুদ। সুদের কারণেই অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয়, ভারসাম্যহীনতা, মন্দা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। অথচ সুদই পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি বা lifeblood।

২.

ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী সমাজে আয় ও ধনবন্টন কিভাবে হবে তার মূলনীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী আকিদা মুতাবিক সমস্ত সম্পদের মালিকানা আল্লাহরই। তিনিই এর স্রষ্টা। মানুষকে সীমিত সময়ের জন্যে তিনি এর শর্তাধীন মালিক করে দিয়েছেন। তাকে নিরংকুশ মালিকানা দেওয়া হয়নি। ব্যাপারটা অনেকটা বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যের সম্পর্কের মতো। বাড়ীর মালিকই হলো প্রকৃত মালিক, ভাড়াটিয়া বা ইজারা গ্রহীতা কতকগুলো শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সেই বাড়ী বসবাস বা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারেন। শর্তের মধ্যে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করা ছাড়াও থাকতে পারে দেয়াল ভাংগা বা জানালা বদলানো যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, ছাদে বাগান করা যাবে না ইত্যাদি। অনুরূপভাবে কতকগুলো শর্ত পালন সাপেক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতিনিধি মানুষ বা ইনসানকে তাঁর সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন।

ইসলামে স্বেচ্ছাধীনভাবে আয়ের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামতো ভোগ ও ব্যয়েরও কোন সুযোগ নেই। এই মূল দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষিতেই কুরআন ও হাদীসে সম্পদ উপার্জন, ব্যবহার ও বন্টনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"হে ঈমানদারগণ! একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই।"

(সূরা আন্-নিসা : ২৯ আয়াত)

"অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না।"

(সূরা আত্-তওবা : ৩৪ আয়াত)

"ইহা জীবন যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীনদের জন্যে যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।" (সূরা আল-বাক্বারা : ২-৩ আয়াত)

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।"

(সূরা আল-বাক্বারা : ২৭৫ আয়াত)

"সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

(সূরা আল-হাশর : ৭ আয়াত)

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

(সূরা বনি ইসরাইল : ২৭ আয়াত)

"তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে।"

(সূরা আল-যারিয়াত : ১৯ আয়াত)

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফেও প্রচুর নির্দেশ রয়েছে। যেমন :

"যারা দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চল্লিশ দিনের বেশী মজুদ রাখে তাদের সাথে আমার (অর্থাৎ রাসূলের) কোন সম্পর্ক নেই।" (মিশকাত)

"যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খায় সে প্রকৃত মুমিন নয়।" (বুখারী)

"যারা অন্যকে ঠকায় ও অন্যের সাথে প্রতারণা করে তারা আমাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) মধ্যে নেই। (বুখারী)

"বর্গাদারী প্রথায় যদি কোন পক্ষের তাদের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থাকে তবে তা নিষিদ্ধ হবে।" (মিশকাত)

উপরোক্ত নির্দেশসমূহের আলোকে রাসূলে করীম (সা.) তাঁর জীবদ্দশাতেই মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহান খুলাফায়ে রাশিদূনও (রা.) সেই একই পথ অনুসরণ করেছিলেন। সে সময়ে ইসলামী দুনিয়ার বিস্তৃতি ঘটেছিল অবিশ্বাস্যরকম দ্রুতগতিতে। সুদূর স্পেনের কর্ডোভা হতে দূর প্রাচ্যের ইন্দোচীন (আজকের ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া) পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তান পার হয়ে সুদূর চীনের কাশগড়, জিনজিয়াং, গানসু প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত ইসলামের জীবন বিধান বাস্তবায়িত হয়েছিল। সেই আমলে রাষ্ট্রের বিস্তৃত

কর্মকাণ্ড, নতুন নতুন এলাকার বিশেষ বিশেষ অবস্থা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে ইসলামী চিন্তাবিদরা ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বিস্তৃত গবেষণা করেন। আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে যেসব মুসলিম অর্থনীতিবিদ বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আবু ইউসুফ, ইবনে তাইমিয়া, আবু ইসহাক আল-শাতিবী, নাসিরুদ্দীন তুসী, ইবনে খালদুন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩.

আবু ইউসুফ তাঁর *কিতাবুল খারাজ* বইয়ে সম্পদ কিভাবে সমাজে বন্টিত হবে তার পদ্ধতি ও কর্মকৌশল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় কৃষি জমির উশর ও খারাজ আদায় ছাড়াও জমির মালিকানার ধরন ও পদ্ধতি বিষয়েও মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে জমি যেমন অনাবাদী রাখা যাবে না তেমনি কেউ এত বেশী জমিরও মালিক হতে পারবে না যা তার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে চাষাবাদ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া তিনি আনুপাতিক হারে কর বৃদ্ধিরও কথা বলেছেন। সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তিনি উত্তরাধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের উপরও সমধিক জোর দিয়েছেন।

ইবনে তাইমিয়া তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *আল-হিসবাহ ফি আল-ইসলাম* বইয়ে জনগণের উপার্জন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের আবশ্যিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা বলেছেন। জনসাধারণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয়-উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে রাষ্ট্র একদিকে যেমন উপায়-উপকরণ সরবরাহ করবে তেমনি অন্যদিকে তাদেরকে কাজের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠারও সুযোগ সৃষ্টি করবে। গর মৌসুম বা slack season-এ যখন ক্ষেতে-খামারে কাজ মেলে না সে সময়ে রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন রাস্তা ও সেতু তৈরী ও মেরামত, মুসাফিরখানা সংস্কার, রাস্তার ধারে গাছ লাগানো প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে বেকার ও ছদ্মবেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এভাবেই সমাজে সাধারণ লোকের আয়ের নিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে। অনুরূপভাবে সরকার সকল অবৈধ উপায়ে আয়ের পথ রুদ্ধ করে দেবে এবং ধনী ব্যক্তি ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের উপর নজর রাখবে। প্রয়োজনে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ করে বন্টন ও বাজার ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্বও সরকারেরই। ইবনে হাযমের মতে উপযুক্ত কর আরোপের মাধ্যমে ধনীদের আয় হ্রাস ও গরীবদের কল্যাণের দায়িত্বও সরকারেরই।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও আধুনিক ধনবিজ্ঞানের জনক হিসাবে পরিচিত ইবনে খালদূনও তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বই *আল-মুকাদ্দামা*-তে সমাজে আয় আবর্তন ও সম্পদ বন্টনের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছেন। উপরন্তু সমকালীন সমাজে সে সবের প্রয়োগ পদ্ধতি ও তার সুফল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশেষ করে বেতনভোগী শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতার নিশ্চয়তা বিধান, কৃষিজীবিদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা ও সৈনিকদের বেতন নির্ধারণ বিষয়েও আলোচনা করেছেন। এই

প্রসঙ্গে তিনি শহরাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে আয় বৈষম্য ও তা দূর করার উপায় সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।

একেবারে সাম্প্রতিক কালের কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে হিজরী চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ হতে যে ইসলামী পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে সে ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতিবিদরাও পিছিয়ে নেই। শহীদ সাইয়েদ কুতুব হতে শুরু করে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, খুরশীদ আহমদ, উমর চাপরা, নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইউসুফ কারযাবী, বাক্কীর আল-সদর, হাসান আবু রুকবা, মনযের কা'ফ, আনাস জারকা, এস.এন.এইচ. নকভী, আবুল হাসান এম. সাদেক প্রমুখ প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তাঁদের বিভিন্নমুখী আলোচনায় দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, যতক্ষণ না আমরা হযরত মুহম্মদ (সা.) প্রদর্শিত *আমর বিল মারুফ* (বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা) এবং *নেহী আনিল মুনকার* (বা দুর্নীতির উচ্ছেদ) এর পথ বাস্তবিকই অনুসরণ করছি এবং উপার্জনের ও ধনবন্টনের সকল ক্ষেত্রে হালালকে গ্রহণ ও হারামকে বর্জন না করছি ততক্ষণ সমাজে শান্তি ও স্বস্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ আসতে পারে না। অর্থনীতি তার স্বাভাবিক গতিধারায় চলতে পারে না।

৪.

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, ইসলামী অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ তৌহিদ, রিসালাত ও আখিরাত এবং এই অর্থনীতি একটি *ব্যবস্থাপনা নির্ভর অর্থনীতি* (Managed economy)। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মূলতঃ *উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি* (Open economy) এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হচ্ছে *সর্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি* (Totally controlled economy)। সুতরাং, আদর্শগত ও প্রয়োগগত পার্থক্যের কারণেই ইসলামী অর্থনীতির কর্মধারা এবং তার বাস্তব রূপও ভিন্নতর হতে বাধ্য। সে কারণেই সামাজিক সাম্য অর্জন, ইনসাফপূর্ণ বন্টন, দরিদ্র শ্রেণীর হক আদায় ও অধিকতর মানবিক জীবন যাপনের সুযোগ প্রদান এবং ধনীদের বিলাসিতা, অপচয় ও অপব্যয় বন্ধের জন্যে আয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে মূলনীতিগুলো নির্ধারণ করেছে তা শুধু ভিন্নতরই নয়, তার পরিণাম ফলও ভিন্ন। এই মূলনীতিগুলোর আবেদন ও প্রয়োগ সার্বজনীন ও সর্বকালীন। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যতদিন মুসলিম দেশসমূহ ইসলামী ভাবধারা ও নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়েছে, এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্দেশনা ও শিক্ষাসমূহ অনুসরণ করেছে ততদিন তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছে; জনজীবনে স্বস্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এর ব্যতিক্রম মুসলিম সমাজের পতন ডেকে এনেছে।

এতক্ষণে একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য মূলনীতিসমূহের ভিত্তি হচ্ছে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার। বস্তুতঃ সামাজিক সাম্য অর্জনের জন্যে চাই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টন ও ব্যবহার এবং প্রকৃত আন্তরিক প্রয়াস। উপরন্তু ইসলামী

অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে চাই ইসলামী আইন ও সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজে মানুষ যা উপার্জন করবে তা অবশ্যই বৈধ পন্থায় হবে-একথা স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবৈধ উপায়ে আয়ের তথা ভোগ ও বন্টনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রত্যেকেই যা হালাল তা অর্জনের জন্যে যেমন সচেষ্ট থাকবে তেমনি যা হারাম তা বর্জনের জন্যেও সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে।

কাজে ফাঁকি দেওয়া, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, ওজনে কম দেওয়া, অন্যের জমি ও সম্পদ জবরদখল করা চোরাচালান মজুতদারী মুনাফাখোরী কালোবাজারী দামে হেরফের করা কর ফাঁকি দেওয়া, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, টেন্ডার ছিনতাই, ঘুষ ও চাঁদাবাজি প্রভৃতি সকল ধরনের অসাধুতার পথ ইসলামে সকলের জন্যেই চিরতরে বন্ধ। কিন্তু মানুষ যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল, শয়তানের প্ররোচনা নিরন্তর তাকে হাতছানি দেয়, তাড়া করে বেড়ায় তাই অসৎ ও অবৈধ উপায়ে আয়ের প্রবণতা তার মধ্যে থাকতে পারে। এই অবস্থা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার জন্যেই রাসূলে করীম (সা.) ও তাঁর পরবর্তী যুগেও *হিসবাহ* ও *হিজর* নামে দুটি প্রতিষ্ঠান কার্যকর ছিল। প্রতিষ্ঠান দুটির দায়িত্বই ছিল উপরে উল্লেখিত অসৎ কাজ হতে সমাজের লোকদের বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদের নিরস্ত রাখা এবং প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা। প্রতিষ্ঠান দুটির এতদূর ক্ষমতা ছিল যে, তারা অবাধ্য ও দুর্বিনীত ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারতো।

বেহুদা ব্যয় বা অপব্যয়, বিলাস-ব্যসনও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাই সৎ বা বৈধভাবে অর্জিত অর্থও বেহুদা ব্যয় করা নিষেধ। বেহুদা খরচ সম্পর্কে মহান খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) এতদূর সতর্ক ছিলেন যে, মিশরের গভর্ণর তার সরকারী বাসভবনের প্রাচীর তৈরী করালে তা ভেঙ্গে ফেলার জন্যে লোক পাঠানো হয় এবং গভর্ণরকে পদচ্যুত করা হয়। সরকারী কর্মকর্তাদের মিতব্যয়ী হতে বলা হতো, তাদেরকে কলমের নিব সরু করে নিতে এবং কাগজের মার্জিনেও লিখতে পরামর্শ দেওয়া হতো। এ থেকেই বোঝা যায় তাঁরা কি অপরিসীম নিষ্ঠার সাথে বেহুদা ব্যয় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাতেন। অথচ আজকের সমাজে নানা উপলক্ষ্যে ও নানা রূপে অপব্যয় ও অপচয়ের প্রতিযোগিতা চলছে। এক-একটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যে অর্থ অপচয় হয় তা দিয়ে কয়েকটা পরিবারের সারা মাসের খরচ নির্বাহ হতে পারে।

যে কোন সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে, যে সমাজে, যে অর্থনীতিতে একবার সুদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে গেছে, সে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ধনী-গরীবের পার্থক্য হয়েছে বিপুল আর নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের আহাজারিতে ভরে গেছে আকাশ, বাতাস, জনপদ। সুদের বিদ্যমানতার ফলে অর্থনীতিতে যেসব প্রত্যক্ষ কুফল লক্ষ্য করা গেছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যাবে *সুদঃ অর্থনৈতিক কুফল* ও *উচ্ছেদের উপায়* শীর্ষক প্রবন্ধ হতে।

ঐসব কুফলের জন্যেই ইসলামে সুদকে এত কঠোরভাবে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং রাসুলে করীম (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই সুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে গেছেন। বিদায় হজ্বের অমর বাণীতেও তিনি এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে কঠোরভাবে সর্তক করে দিয়েছেন। তাঁরই চেষ্টায় প্রথমে মদীনা হতে ও পরবর্তীকালে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব হতে সুদ নির্মূল হয়ে যায়। সুদের ভয়াবহ পরিণাম ও আখিরাতে তার শাস্তি সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামী হুকুমাতের পতন দশা শুরু হওয়ার পর যখন খৃষ্টান শাসকগোষ্ঠী তথা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তি একের পর এক মুসলিম দেশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা শুরু করে তখন তাদের সহযোগিতায় ও তাদেরই তৈরি আইনের আওতায় সুদভিত্তিক লেনদেন শুরু হয়ে যায়। অবশ্য বিলম্বে হলেও সুদনির্ভর অর্থনীতির দেশে এর মারাত্মক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কুফল সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি শুরু হয়েছে।

ধনবন্টনে সাম্য স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলামী মীরাস বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বাঁটোয়ারা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। ইসলাম-পূর্ব যুগে বিশ্বে সম্পদ বন্টনের কোন বৈজ্ঞানিক ও স্বাভাবিক পন্থা বিদ্যমান ছিল না। ইসলামেই সর্ব প্রথম মৃতের সম্পদ তার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে একদিকে যেমন তাদের তাৎক্ষণিক অসহায় অবস্থা দূর করতে সমর্থ হয়েছে তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের হাতে সকল সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার বিপদও দূর করেছে। উপরন্তু সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। কিভাবে ও কাদের মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাঁটোয়ারা হবে সে বিষয়ে সূরা আন-নিসায় ব্যাপক ও বিস্তৃত নির্দেশনা রয়েছে। এত ব্যাপক ও বিস্তৃত নির্দেশ আর কোন ধর্ম বা ইজমে নেই।

প্রসঙ্গতঃ যুক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে সম্পদের অধিকতর সুষ্ঠু বন্টনের জন্যে মৃতের সম্পত্তি সর্বহারাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেত অথবা নির্দেশ দেওয়া যেত রাষ্ট্রয়াত্ব করে নেওয়ার। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের নিকট আত্মীয়দের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনায় স্বীয় জীবদ্দশাতেই সব সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করতো। তার ফলে সমাজে দেখা দিত আরও বেশী বিশৃংখলা। পক্ষান্তরে মৃতের সম্পত্তি তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও নিকট আত্মীয়েরা লাভ করায় সম্পদের বন্টন যেমন সার্থক ও অর্থবহ হয় তেমনি তারাও রাতারাতি সর্বহারাদের কাতারে গিয়ে শামিল হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

এখানে উল্লেখ করা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের দেশে বেআইনী বা জবরদস্তিমূলক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা বর্তমানে একটা রেওয়াজ বা দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের জমি, ইয়াতীম ও নাবালকদের সম্পত্তি, এমন কি প্রতিবেশীর জমি-বাগান-দালান ছাড়াও শত্রু সম্পত্তি কিংবা সরকারী সম্পত্তি (খাস জমিসহ), বাড়ীঘর, প্রতিষ্ঠান জবর দখল করে, কিংবা জাল/ভূয়া দলিল করে এক শ্রেণীর

মানুষ রাতারাতি বিত্তশালী (এবং একই সাথে প্রতিপত্তিশালী) হওয়ার সুযোগ নিচ্ছে। এদের যেন কেউ রুখবার নেই। আইন এদের কাছে বড়ই অসহায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে ইসলামের দোহাই পেড়ে বা রাষ্ট্রধর্মের বরাত দিয়ে দেশে শ্রেণী বৈষম্য দূর করা কখনই সম্ভব হবে না। বরং বৈষম্যই শুধু বাড়বে না, সেই সঙ্গে বাড়বে নির্যাতন, নিপীড়ন, যার পরিণাম কোটি বনি আদমে বেদনাক্লিষ্ট ও হতাশাপূর্ণ জীবন।

৫.

যাকাত আদায় এবং তার যথোচিত ব্যবহার সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের ক্ষেত্রে আর একটি বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে বন্টিত ও ব্যবহৃত হয় যাদের প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত বা Have-nots বলা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব, মিসকীন, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, ক্রীতদাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে নও মুসলিম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় এবং তা বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা নেই। যাকাত আদায় এখন ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) ও তাঁদের পরবর্তী যুগেও বায়তুল মালের যাকাত অংশ পরিচালনার জন্যে আটটা দপ্তর বা Directorate ছিল। রাষ্ট্রের কঠোর ও নিপুণ ব্যবস্থা ছিল যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও তা উপযুক্ত উপায়ে বন্টনের জন্যে। সেজন্যেই গোটা জাযিরাতুল আরবে যাকাত নেবার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না সে সময়ে। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হলো সেদিনের আরবে দরিদ্র শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল।

ইসলামী হুকুমাত তথা ইসলামী অর্থনীতিতে উশরের মাধ্যমেও সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা চালু ছিল। পদ্ধতি হিসাবে এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও। যে জমিতে সেচ না দিয়ে ফসল উৎপন্ন করা যায় সেই জমির ফসলের এক-দশমাংশ বা ১০% এবং যে জমিতে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করতে হয় সেই ফসলের এক-বিংশতি অংশ বা ৫% উশর হিসাবে প্রদানের শরয়ী বিধান রয়েছে। জমির মালিক হয় তা সরাসরি যারা যাকাতের হকদার তাদের মধ্যে বিলিবন্টন করে দেবে অথবা বায়তুল মালে জমা করে দেবে। সেই ব্যবস্থার ফলে সম্পদের, বিশেষতঃ কৃষি পণ্যের/আয়ের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত হতো।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এদেশে বিদ্যমান বর্গাদারী প্রথার কুফল সম্বন্ধে দু'একটি কথা উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ বর্গাদারী প্রথা। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ মহাজনী ঋণ ও ব্যাংকের সুদ। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায় এদেশে ১৯৬০ সালে যেখানে ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল ১৭%, ১৯৭৩-৭৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭.৬% এ। ১৯৮৭-৮৮ সালে এই পরিমাণ ছিল ৫০% এরও বেশী। বাংলাদেশে প্রায় ৩৯%

পরিবার কোন-না-কোন শর্তে বর্গাচাষ করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যদিও ফসলের হিসাবে বর্গাদাররা অর্ধেক পায় প্রকৃতপক্ষে টাকার হিসাবে (খরচসহ) তারা এক-চতুর্থাংশের বেশী পায় না। উপরন্তু তাদের নিজস্ব শ্রমের মূল্য যদি ধরা হয় তাহলে তাদের প্রকৃত আয় অনেক ক্ষেত্রেই ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় বর্গাদাররা কোন দিনও নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখতে পারে না।

৬.

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থারই অন্তর্ভূক্ত। ফলে ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে অবশ্যই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নেতিবাচক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে কখনও ধনবন্টনে সাম্য আসে না, আসতে পারে না। ইসলামের সোনালী দিনেও মহান খলীফারা কঠোরভাবে তদারক করতেন ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা। প্রকৃত অর্থেই তাঁরা আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন।

আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্য অর্জনের জন্যে ইসলামে সম্পদ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনারও বিধান রয়েছে। যে সমস্ত সম্পদের সামাজিক মালিকানা থাকলে তার ব্যবহার সর্বোত্তম হবে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই তা থেকে সুবিধা বা উপকার পাবে সে সকল উপায়-উপকরণই রাষ্ট্রের জিম্মাদারীতে থাকতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ ভুলভাবে এসবের মালিক হয়ে গেলেও রাষ্ট্র তা নিজের জিম্মাদারীতে ফিরিয়ে নিতে পারে। অনুরূপভাবে আবাদী জমি ইচ্ছাকৃত ভাবে পতিত রেখে জাতীয় উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটালে রাষ্ট্র তাও বরদাশত করবে না। কেননা এর ফলে সমাজে খাদ্য সংকট ও কর্মসংস্থানের অভাব ঘটবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইসলামের মহান খলীফারা (রা.) প্রকৃত চাষীদের মধ্যে প্রচুর আবাদযোগ্য অব্যবহৃত জমি বিলি করে দেন। তাছাড়া স্থায়ী সামাজিক মূলধন উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থাৎ শিক্ষা স্বাস্থ্য যাতায়াত গৃহায়ন প্রভৃতি সুবিধার সম্প্রসারণ ও নিশ্চয়তা বিধান করেও ধনবন্টনে অধিকতর সাম্য নিশ্চিত করা সম্ভব। মহান খলীফারা এবং মুসলিম শাসকগণ তা করেছেনও। এভাবেই ইসলামী শাসন ব্যবস্থার স্বর্ণযুগে আয় ও সম্পদের সঞ্চালন এবং বন্টন সুনিশ্চিত হয়েছে, দারিদ্র্য দূর হয়েছে সমাজ হতে। পরিণামে একটি কালজয়ী সমৃদ্ধ সভ্যতা হিসাবে ইসলাম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে।

মৌলিক চাহিদা পূরণ সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সাম্য অর্জনের অন্যতম উপায়। মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পথ ধরেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিশেষতঃ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ আবর্তিত হতে শুরু করে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি → উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি → কর্মসংস্থান বৃদ্ধি → আয় বৃদ্ধি → পুনরায় চাহিদা বৃদ্ধির একটি কাংখিত চক্র আবর্তিত হতে শুরু করে। পরিণামে অর্থনীতিতে একটি স্থিতিশীল তেজীভাব সৃষ্টি হয়। এ কারণেই ইসলাম জনগণের

প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণের গ্যারান্টির বিষয়টি সরকারের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। জনগণের প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যে সরকারী তহবিল হতে ব্যয় সংকুলান না হলে যাকাত উশর ও বর্ধিত কর সংগ্রহ ছাড়াও সম্পদশালীদের নিকট হতে বাধ্যতামূলক অর্থ সংগ্রহের এখতিয়ার সরকারের রয়েছে। এভাবেই ধনীদের সম্পদ দরিদ্রদের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণে ব্যবহৃত হয়ে ধনবন্টনে ভারসাম্য অর্জিত হতে পারে।

উপরন্তু দরিদ্র শ্রেণীর আয়ের নিরাপত্তা ও ক্রয় ক্ষমতার নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থে সরকারকে মজুরী ও দ্রব্যমূল্যও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমাজে বিরাজমান ধনবৈষম্য হ্রাসের জন্যে সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতিমালাও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং, এই নীতিমালা দরিদ্রদের কল্যাণের স্বার্থেই প্রণীত হওয়া উচিৎ। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, সরকারের গৃহীত নীতিমালার সুবিধা ও প্রাপ্তির পাল্লা সাধারণতঃ বিত্তবানদের দিকেই ঝুঁকে থাকে। এছাড়া ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ এবং উচ্চপদস্থ আমলারা সরকারী অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করে থাকে নিজেদের আরাম-আয়েসে, বিলাস-ব্যসনে। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যে মৌখিক প্রতিশ্রুতি ও কাগুজে পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় না। অথচ ইসলামী নীতি অনুসারে রাষ্ট্রীয় সম্পদে কারোরই, এমনকি রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানেরও অন্যের চেয়ে বেশী অধিকার ভোগের সুযোগ নেই। বরং খলীফা উমার (রাঃ)-এর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী দূর পর্বতবাসী মেষ পালককেও রাষ্ট্রীয় সম্পদ হতে তার ন্যায্য অংশ আদায় করে দেওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব সরকারেরই।

৭.

যে-কোন সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের করণীয় কি সে বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার পরেও কথা থেকে যায়। ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোতে মুসলিম সমাজে কর্মসংস্থানের যে স্বাভাবিক উপায়গুলো সকলের জন্যে সহজলভ্য ছিল আজকের সমাজে তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ মুদারাবা মুশারাকা মুরাবাহা বায়-ই-মুয়াজ্জল বায়-ই-সালাম শিরকাত আল-মিলক ইজারা বিল-বায়ই ইত্যাদি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজে বিত্তশালী ও বিত্তহীন কিন্তু কর্মদক্ষ মানুষ, অল্পবিত্ত ও অধিক বিত্তের মানুষ যৌথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে, যে কোন নতুন কর্মদ্যোগে অংশ নিতে পারে। দুঃখের বিষয়, সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হতে মুনাফাভিত্তিক এবং লাভ-লোকসানের অংশীদারীভিত্তিক কর্মসংস্থানের ও বিনিয়োগের পথ মুসলিম দেশগুলোতে ক্রমাবলুপ্ত হয়েছে। অথচ নবী মুস্তাফার (সাঃ) যামানা হতেই মুদারাবা মুশারাকা মুরাবাহা বায়-ই-মুয়াজ্জল বায়-ই-সালাম ইত্যাদি পদ্ধতিতে সমাজের বিত্তশালী বা ধনবান ব্যক্তিরা যারা কম বিত্তশালী বা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক যোগ্যতা রাখে তাদের সাথে একত্রে

উৎপাদনমুখী ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অংশীদার হতেন। এছাড়াও বহুক্ষেত্রে করযে হাসানার মাধ্যমেও ব্যক্তিবিশেষের জরুরী প্রয়োজন পূরণের সুযোগ ইসলামী সমাজে বিদ্যমান ছিল। সেই করযে হাসানার নামই এখন অনেক মুসলমানের অজানা।

এই অবস্থা নিরসনের জন্যে তথা সুদভিত্তিক ঋণের বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে সমাজে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের মাধ্যমে আয় ও সম্পদের সুচারু বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অনেকগুলো মুসলিম দেশে সাম্প্রতিককালে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং পদ্ধতি চালু হয়েছে। বাংলাদেশ তার অন্যতম। এদেশে ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু হয় এবং জনগণের কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পায়। বিগত বছরগুলোতে এই ব্যাংকিং পদ্ধতি বাংলাদেশের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। পৃথিবীর যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব দেশে এই পদ্ধতিতে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও বিনিয়োগ যে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে তা বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিককালের বার্ষিক রিপোর্টসমূহ হতে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ মিশরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই মুসলিম দেশটির ইসলামী ব্যাংকগুলো একত্রে সেদেশের মোট বিনিয়োগ ও বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের এক-চতুর্থাংশ বা ২৫% নিয়ন্ত্রণ করছে। সুদের অভিশাপ মুক্ত হয়ে নিজেদের ক্ষুদ্র সাধ্য ও সামর্থ্যকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজে লাগাবার জন্যে অধুনা ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং পদ্ধতি যে সুযোগ করে দিয়েছে তার ফলে সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনে একটি লক্ষ্যণীয় সুপ্রভাব অনুভব করা যাচ্ছে।

৮.

ইসলামী অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বন্টনে ভারসাম্য অর্জনের জন্যে যে সব উপায় বা পদ্ধতি আলোচিত হলো সে সব বাস্তবায়নের জন্যে যুগপৎ ব্যক্তি ও সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহ তৎপর হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই উপার্জন ও সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর হতে পারে; আয় ও কর্মসংস্থানের পথ সকলের জন্যে উন্মুক্ত হতে পারে। এর ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দূর হয়ে একটি সমৃদ্ধ, গতিশীল ও সুস্থ অর্থনীতি বিনির্মাণের পথ সুগম হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস বাদ দিলে আজকের মুসলিম বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ পর্যন্ত আলোচিত উপায়সমূহের কোন একটিও পুরোপুরি অনুসৃত হচ্ছে না। ফলে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্য বিদ্যমান। এই অবস্থা নিরসনের জন্যে আমাদের অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে শাশ্বত সুন্দর ও স্থায়ী সমাধানদানকারী ইসলামের দিকেই। ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের সেটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাত

১. ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। আল-কুরআনে বারংবার নামায কায়েমের পরেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বলা হয়েছে- "সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।" (দ্রষ্টব্য : সূরা আল-বাকারাহঃ ৪৩, ৮৩, ১১০ ও ২৭৭ আয়াত; সূরা আন-নিসাঃ ৭৭ ও ১৬২ আয়াত; সূরা আন নূরঃ ৫৬ আয়াত; সূরা আল-আহযাব ৩৩ আয়াত, সূরা মুয্যাম্মিলঃ ২০ আয়াত)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন-"তাদের অর্থসম্পদ থেকে যাকাত উসুল করো যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" (সূরা আত্-তাওবাঃ ১০৩ আয়াত)

"মুশরিকদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তারা যাকাত দেয় না"। (সূরা হামীমঃ ৬-৭ আয়াত)

"আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও মূলতঃ তা যাকাত দানকারীরই সম্পদ বৃদ্ধি করে।" (সূরা আররুমঃ ৩৯ আয়াত)

রাসুলে করীম (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন-"তোমাদের সম্পদের যাকাত পরিশোধ করো"। (তিরমিযী, হিদায়া)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যাকাতের বিধি-নির্দেশ শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর উপরই নাযিল হয় নি, অতীত কালে অন্যান্য নবীদের উম্মতের উপরেও এই হুকুম ছিল আল্লাহর পক্ষ হতেই। হযরত ইসমাইল (আঃ) ও হযরত ঈসার (আঃ) সময়েও যাকাতের বিধান প্রচলিত ছিল। (সূরা মরিয়মঃ ৩১ ও ৫৫ আয়াত এবং সূরা আল আম্বিয়াঃ ৭৩ আয়াত)।

কেন যাকাতের এই গুরুত্ব? ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যাকাত সম্পদ বন্টনের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্যে যাকাত অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। কিন্তু যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয় বরং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্যে আল্লাহ্ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ-সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ। যাকাতের সংগে প্রচলিত অন্যান্য সকল ধরনের করের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, ইসলামের এই মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধারে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে। কিন্তু করের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক তাগিদ নেই।

যাকাত ও প্রচলিত করের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ কর হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যার জন্যে করদাতা কোন প্রত্যক্ষ উপকার প্রত্যাশা করতে পারে না। সরকারও করের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দরিদ্র ও অভাবী জনসাধারণের মধ্যে ব্যয়ের জন্যে বাধ্য থাকেন না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ অবশ্যই আল-কুরআনে নির্দেশিত নির্ধারিত লোকদের মধ্যেই মাত্র বিলি-বন্টন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু করের অর্থ যেকোন কাজে ব্যয়ের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যাকাত শুধুমাত্র *সাহেবে নিসাব* মুসলিমদের জন্যেই বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর, বিশেষতঃ পরোক্ষ কর, সর্বসাধারণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধারণের উপর কৌশলে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

চতুর্থতঃ যাকাতের হার পূর্ব নির্ধারিত ও স্থির। কিন্তু করের হার কোনক্রমেই স্থির নয়। যেকোন সময়ে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী করের হার ও করযোগ্য বস্তু বা সামগ্রীর পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং, যাকাতকে প্রচলিত অর্থে সাধারণ কর হিসাবে যেমন কোনক্রমেই গণ্য করা যায় না তেমনি তার সঙ্গে তুলনীয়ও হতে পারে না।

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির কত বড় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তা বুঝতে হলে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা.) সময়ের ঘটনা জানতে হবে। তিনি খলিফা হওয়ার পর পরই কিছু ভণ্ড নবীর প্ররোচনায় কয়েকটি গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে। খলীফার নিকট তারা যাকাত প্রদান হতে অব্যাহতি চাইল। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- "যদি কারো কাছে উট বাধার রশি পরিমাণও যাকাত প্রাপ্য হয় আর সে তা দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধেই আমি জিহাদ ঘোষণা করব।" ইতিহাস সাক্ষী, তিনি তা করেছিলেনও। এরই ফলশ্রুতিতে খলীফা উমর ইবন আব্দুল আযীযের সময়ে জাযিরাতুল আরবে যাকাত গ্রাহকের সন্ধান পাওয়া ছিল দুর্লভ। সেই যাকাত মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আজ শুধু প্রথা হিসেবে চালু রয়েছে। সেজন্যেই মুসলিম বিশ্বের দুঃস্থ অভাবী ও নিঃস্ব লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকাতের অর্থ ব্যয়ের বিদ্যমান প্রথায় না সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে, না অভাবী ও দরিদ্র জনগণের সমস্যার স্থায়ী সুরাহা হচ্ছে।

২. যাকাতের খাত ও হকদার

ইসলাম শরীয়াহ অনুসারে যে সমস্ত সামগ্রীর যাকাত দিতে হবে সেগুলো হলো-

ক) সঞ্চিত বা জমাকৃত অর্থ,

খ) সোনা, রূপা ও সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী অলংকার,

গ) ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী,
ঘ) কৃষি উৎপন্ন,
ঙ) খনিজ উৎপাদন, এবং
চ) সব ধরনের গবাদি পশু।

উপরোক্ত দ্রব্য সামগ্রীর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যখন কোন মুসলমান অর্জন করে তখন তাকে যাকাত দিতে হয়। এই পরিমাণকে 'নিসাব' বলে। নিসাবের সীমা বা পরিমাণ দ্রব্য হতে দ্রব্যে ভিন্নতর। একইভাবে যাকাতের হারও দ্রব্য হতে দ্রব্যে ভিন্নতর। যাকাতের সর্বনিম্ন হার শতকরা ২.৫% হতে শুরু করে সর্বোচ্চ ২০.০%।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ, কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

"দান খয়রাত তো পাওনা হলো দরিদ্র ও অভাবীগণের, যে সকল কর্মচারীর উপর আদায়ের ভার আছে তাদের, যাদের মন সত্যের প্রতি সম্প্রতি অনুরাগী হয়েছে, গোলামদের মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে (মুজাহিদদের জন্যে) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটি আলাহর তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ সব জানেন ও সব বুঝেন।" (সূরা আত্-তওবাঃ ৬০ আয়াত)

উপরের আয়াত হতে সুস্পষ্টভাবে আট শ্রেণীর লোকের জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যবহারের জন্যে নির্দেশ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছেঃ

ক) দরিদ্র জনসাধারণ (ফকীর),
খ) অভাবী ব্যক্তি (মিসকীন),
গ) যাকাত আদায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি,
ঘ) মন জয় করার জন্যে,
ঙ) ক্রীতদাস বা গোলাম মুক্তি,
চ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি,
ছ) আল্লাহর পথে, এবং
জ) মুসাফির।

এই আটটি খাতের মধ্যে ছয়টিই দারিদ্র্যের সংগে সম্পৃক্ত। অন্য দুটি খাতও (গ ও ছ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাকাত আদায় ও এর বিলিবন্টন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সুতরাং, তাদের বেতনও এই উৎস হতেই দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গতঃ যাদেরকে যাকাতের অর্থ-সম্পদ দেওয়া যাবেনা তাদের কথাও জেনে রাখা ভাল। এদের মধ্যে রয়েছে (১) নিসাবের অধিকারী ব্যক্তি, (২) স্বামী-স্ত্রী, (৩)

পুত্র-কন্যা ও তাদের সন্তান-সন্ততি, (৪) মাতা-পিতা ও তাদের উর্দ্ধতন পুরুষ, (৫) বনি হাশেমের লোকজন, (৬) উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, (৭) যাদের ভরণ-পোষণের দ্বায়িত্ব রয়েছে এবং (৮) অমুসলিম।

৩. যাকাতের নিসাব

যাকাতের নিসাব সম্পর্কেও অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই। সেজন্যে সংক্ষেপে যেসব পণ্য ও সম্পদের যাকাত আদায় করার শরয়ী হুকুম রয়েছে সেসব নিসাব ও যাকাতের হারসহ এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ সোনা বা এর তৈরী অলংকার অথবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি পরিমাণ রূপা. বা তার তৈরী অলংকার অথবা সোনা-রূপা উভয়ই থাকলে উভয়ের মোট মূল্য ৫২.৫ ভরি রূপার সমান হলে তার বাজার মূল্যের উপর ১/৪০ অংশ বা ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

২. হাতে নগদ ও ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের সমান হলে তার উপর ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

৩. ব্যবসায়ের মজুদ পণ্যের মূল্য ৫২.৫ ভরি রূপার মূল্যের বেশী হলে তার উপর ২.৫% হারে যাকাত প্রদেয়।

৪. গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে প্রথম ৩০টির জন্যে ১ বছর বয়সী ১টা বাছুর দিতে হবে এর উর্দ্ধের হার ভিন্ন।

৫. ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে প্রথম ৪০টির জন্যে ১টা এবং পরবর্তী ১২০টির জন্যে ২টা ছাগল/ভেড়া যাকাত দিতে হবে। [দ্রষ্টব্যঃ *বুখারী শরীফ, যাকাত অধ্যায়*]

যাকাত প্রদানের জন্যে ফল-ফসলাদি, খনিজ সম্পদ, গুপ্তধন, মধু এবং ব্যাণিজ্যিক খামারের মাছের ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য নয়। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উট ও ঘোড়া পালন করলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। খনিজ সম্পদেরও যাকাত প্রদেয়। তবে বর্তমানে সকল দেশেই খনিজ সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকার কারণে তার বিধান উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যেসব সামগ্রী বা সম্পদের যাকাত দিতে হবে না সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এসবের মধ্যে রয়েছেঃ (১) নিসাব অপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, (২) নিসাব বছরের মধ্যেই অর্জিত ও ব্যয়িত সম্পদ (৩) ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা যা বসবাস, দোকান-পাট ও কল-কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, (৪) ব্যবহার্য সামগ্রী (কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, গৃহস্থালীর তৈজসপত্র, বই-পত্র, (৫) যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম, (৬) শিক্ষার সমুদয় উপকরণ, (৭) ব্যবহার্য যানবাহন (৮) পোষা পাখী ও হাঁস-মুরগী, (৯) ব্যবহারের পশু (ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট) ও যানবাহন এবং (১০) ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি।

৪. উশরের বিধান

ধনসম্পদ গবাদিপশু, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার, ব্যবসায়িক পণ্য ও খনিজ সামগ্রীর উপর যেমন যাকাত আদায় ফরয তেমনি ফসলের উপর উশর আদায়ও ফরয। আল্-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

"তোমরা এগুলোর ফল ও ফসল খাও যখন ফল ধরে এবং আল্লাহর হক আদায় করো ফসল কাটার (বা আহরণ) করার দিন।" (সূরা আল-আনআম: ১৪১ আয়াত)

"তোমাদের জন্যে জমি থেকে যা কিছু বের করেছি তা থেকে খরচ করো (আল্লাহর পথে)"। (সূরা আল-বাকারাহ: ২৬৭ আয়াত)

তাফ্সীরকারীদের মতে আল্লাহর এই নির্দেশ অলংঘনীয়। তাফসীরে তাবারী অনুযায়ী এটা আল্লাহর নির্দেশ ... ফল বা শস্যের ফরয যাকাত আদায় করতেই হবে। তাফসীরে কাশশাফ অনুসারে এই আয়াতে উল্লেখিত 'হক' শব্দ দ্বারা কৃষিজাত ফসলের উপর ফরয যাকাতকেই বোঝানো হয়েছে।

উশরের বিধান সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা.) বলেন-

"যে সব জমি বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয় তাতে উশর (বা দশ ভাগের একভাগ) আর যেসব জমি সেচের সাহায্যে সিক্ত হয় তাতে নিসফ উশর (বা বিশ ভাগের একভাগ) আদায় করতে হবে।" (বুখারী, আবু দাউদ)।

সুতরাং, জমিতে ফল-ফসল উৎপন্ন হলে সেচ বা অসেচ জমিভিত্তিতে উৎপন্ন ফসলের ১০.০% বা ৫.০% যাকাত আদায় করা মুমিন মুসলমান নর-নারীর শরয়ী দায়িত্ব। যাকাতের অর্থসম্পদ ব্যয়ের জন্যে যে আটটি খাত নির্ধারিত, উশরের ক্ষেত্রেও সেই খাতগুলো নির্ধারিত। অবশ্য যাকাতের সঙ্গে উশরের বেশ কিছু পার্থক্য বা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে :

১. উশর আদায়ের জন্যে ফসলের এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। বরং প্রতি বছর প্রতিবার উৎপন্ন ফসলেরই উশর আদায় করতে হবে।

২. উশর আদায়ের জন্যে ঋণমুক্ত হওয়া শর্ত নয়।

৩. নাবালক ও পাগলের জমির ফসলেও উশর আদায় করতে হবে।

৪. উশর আদায়ের জন্যে জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়।

ফল ও ফসলের ক্ষেত্রে নিসাবের পরিমাণ হলো পাঁচ ওয়াসাক। অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলে উশর (বা উশরের অর্ধেক) আদায় করতে হবে। ওয়াসাকের দুটি মাপ রয়েছে- একটি ইরাকী, অপরটি হিজাযী । ইরাকী মাপ অনুসারে পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাণ ৯৮৮.৮ কেজি এবং হিজাযী মাপ অনুসারে এর পরিমাণ

৬৫৩.০ কেজি। এই উপমহাদেশের ওলামা-মাশায়েখগণ ইরাকী মাপটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, এই পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হলেই উশর দিতে হবে। তবে ইমাম আবু হানিফার মতে কৃষি ফসল ও ফলে কোন নিসাব নেই। যা উৎপন্ন হবে তার উপরই উশর বা অর্ধেক উশর ধার্য হবে। (মুহম্মদ রুহুল আমীন-*ইসলামের দৃষ্টিতে উশর: বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে:* ১৯৯৯, পৃ: ৩৩)

৫. যাকাত উসুল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

যাকাত উসুল ও তার বিলি-বন্টন ব্যক্তির খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বরং রাষ্ট্রীয়ভাবেই এর আদায় ও বন্টনের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাববুল আলামীন তাঁর রাসুলকে (সা.) নির্দেশ দিচ্ছেন-

"তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত উসুল করো যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" (সূরা আত্-তাওবা : ১০৩ আয়াত)

আল-কুরআনে আল্লাহ আরও বলেছেন-

"আমরা তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি, তারা আমাদের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে। ... আমরা ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভাল কাজ করার, নামাজ কায়েম করার ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়েছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৭৩ আয়াত)

"তারা এমন লোক যদি তাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করি তাহলে তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে।" (সূরা হজ্ব : ৪১ আয়াত)

উপরের আয়াতগুলো হতে পরিস্কারভাবে বোঝা যায় যে আল্লাহর অভিপ্রায়ই হলো রাষ্ট্রই যাকাত আদায় করবে এবং তা যাকাতের হকদারদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছেও দেবে। আল্লাহ যাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করেছেন, মানুষের নেতা বানিয়েছেন অন্যান্য কাজের মধ্যে তাদের অন্যতম অপরিহার্য দায়িত্ব হলো যাকাত আদায় করা ও আদায়কৃত যাকাত তার হকদারদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। এজন্যেই রাসুলে করীম (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদূনের (রা.) সময়ে যাকাতের অর্থ, সামগ্রী ও গবাদি পশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্যে আট শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল এরা হলো:

ক) সায়ী = গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক,
খ) কাতিব = যাকাতের খাতাপত্র লেখার করণিক,
গ) ক্বাসাম = যাকাত বন্টনকারী,
ঘ) আশির = যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সমন্ধ স্থাপনকারী;
ঙ) আরিফ = যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী,
চ) হাসিব = যাকাতের হিসাব রক্ষক,

ছ) হাফিজ = যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক,
জ) ক্বায়াল = যাকাতের পরিমাণ নির্ণয়কারী ও ওজনকারী।

[দ্রষ্টব্য: এস.এ. সিদ্দিকী (১৯৬২) *পাবলিক ফিন্যান্স ইন ইসলাম*, পৃ. ১৬০]।

আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যে আজকের যুগেও কর আদায়ের জন্যে এত বিভিন্ন পদের লোক নিযুক্ত হয় না, অথচ প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে যাকাত আদায় ও তার বিলি-বন্টনের জন্যে কত নিখুঁত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছিল।

এভাবেই তখন ধনীদের সম্পদের একাংশ গরীব ও অভাবীদের হাতে পৌঁছতো, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে খরচ হতো, মুসাফিরের কষ্ট লাঘব হতো। উপরন্তু ব্যক্তির খেয়াল খুশীর উপর যাকাত উসুল নির্ভরশীল না থাকায় আদায়কৃত যাকাতের পরিমাণ হবে যেমন বিপুল তেমনি তার দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব কল্যাণের ক্ষমতাও ছিল বিপুল। কিন্তু এই দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালিত না হওয়ায় অধিকাংশ মুসলিম দেশের জনসাধারণ আজ দারিদ্র্যপীড়িত এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও ভয়াবহ দুরবস্থার শিকার।

৬. সামাজিক কল্যাণে যাকাত ও উশর

যাকাতের নানাবিধ ইতিবাচক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রয়েছে। সেসবের মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ থাকলেও যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামজিক উদ্দেশ্য বিশেষ গুরুত্ববহ। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান এবং মুখ্য হচ্ছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যকে শুধু অপছন্দই করে না, বরং তা দূরীভূত করার কথাও বলে। তাই একটি সুখী সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দুর্দশা মোচনের জন্যে ব্যয় করতে হবে। এর ফলে যে শুধু অসহায় ও দুঃস্থ মানবতারই কল্যাণ হবে তাই নয়, সমাজে আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য অনেকখানি হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয়তঃ যাকাত মজুতদারী বন্ধ করারও এক বলিষ্ঠ উপায়। মজুতকৃত অর্থ-সম্পদের উপরেই যাকাত হিসাব করা হয়ে থাকে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ এবং মজুত সম্পদ যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই ধরনের অর্থের জন্যেই সরকার ফটকাবাজারী বন্ধ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে থাকেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সৃষ্ট নিদারুণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা তার প্রকৃষ্ট নজীর। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অবৈধ ও কালো টাকা জমছে প্রভুত পরিমাণে। উৎপাদনমুখী কোন কাজেই তা বিনিয়োগ হচ্ছে না। সরকারের নিকট এমন কোন কৌশল বা পদ্ধতি নেই যার দ্বারা এই অবৈধ অর্থের সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব। এ সবের উপর কোন প্রকার কর বসানো যাচ্ছে না। উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমুখী উদ্যোগ গ্রহণেও তাদের প্ররোচিত বা বাধ্য করা সম্ভব হচ্ছে

না। এজন্যে কোন কার্যকর আইনও নেই। পরিণামে নিরুপায় দর্শক হিসেবে সরকারকে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক ধ্বস দেখতে হচ্ছে।

মানুষের মনগড়া কোন পদ্ধতিই সার্থকভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। একমাত্র ইসলামেই এর সমাধান রয়েছে। কারণ, বিত্তবানদের জন্যে তাদের মজুতকৃত অর্থ বা সম্পদের একটা অংশ নিছক বিলিয়ে দেবার মতো কোন পার্থিব কারণ নেই। কিন্তু ইসলামে একজন মুসলমানের আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় রয়েছে। ফলে বিত্তবানদের সামনে দুটি মাত্র পথই খোলা রয়েছে-হয় মজুতকৃত অর্থ শিল্প বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা অথবা ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী তা ব্যয় করা। যার ফলে অর্থনীতির চাকা ঘুরবে, সমাজে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের বিস্তৃতি ঘটবে।

যাকাতের তৃতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এতে শুধু সমাজই নয়, রাষ্ট্রও উপকৃত হয় সমানভাবে। দারিদ্র্য মানবতার পয়লা নম্বরের দুশমন। ক্ষেত্র বিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যেকোন সমাজ ও দেশের জন্যে এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতির সৃষ্টি হয় দারিদ্র্যের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্র্যের জন্য। এর প্রতিবিধানের জন্যে যাকাত ইসলামের অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে ইসলামের সেই সোনালী যুগ হতেই। যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তির ফলে দরিদ্রদের জীবন যেমন আনন্দ ও নিরাপত্তার হয় তেমনি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়।

যাকাতের অর্থ-সামগ্রী যখন সমাজের দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তখন শুধু যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, বরং অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দরিদ্র ও দুর্গত লোকদের ক্রয় ক্ষমতা থাকে না। বেকারত্ব তাদের নিত্য সঙ্গী। যাকাতের অর্থ প্রাপ্তির ফলে তাদের হাতে অর্থাগম হয়। ফলশ্রুতিতে বাজারে কার্যকর চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র জনসাধারণের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume) সচারচর একের অধিক। অধিকাংশ মুসলিম দেশে এরাই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। তাদের হাতে যা আসে তার সবটুকুই খরচ করে ফেলে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্যে। এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদী সময়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিপুল সংখ্যক লোকের যদি ক্রয় ক্ষমতা ঠিক মতো চালু থাকে তাহলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণ ও সেবার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় অনুকূল পরিবেশের। পরিণামে সামাজিক শ্রেণীসমূহের মধ্যেই আয় বা ধনবন্টনগত পার্থক্য হ্রাস পেতে থাকে। তাই যাকাত শুধু অর্থনৈতিক সুবিচারই প্রতিষ্ঠা করে না, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতাও এনে দেয়। এটি যাকাতের চতুর্থ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

যাকাতের অপর হিতকর ও কল্যাণধর্মী দিক হলো ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্তি ও প্রবাসে বিপদকালে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা বা অন্য কোন প্রয়োজন মুকাবিলার কারণে যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সেই ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তাহলে যাকাতের অর্থ দিয়েই সংকট মোচন করা যায়। দেউলিয়া হয়ে সমাজে অসম্মানিত জীবন যাপনের গ্লানি মোচনে যাকাত এক মোক্ষম হাতিয়ার।

উপরন্তু যারা বিদেশ-বিভূঁইয়ে সহায়-সম্বল হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে তারা যাকাতের অর্থ হতেই সেই সংকট হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। শরীয়াহর বিধান অনুসারেই তারা সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার হকদার। স্বদেশে বিত্তশালী হলেও নিঃস্ব মুসাফির বিদেশে যাকাতের দাবীদার আল-কুরআনের বিধান অনুসারেই। মুসলমানরা যে দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এক উম্মাহরই অংশ এই ঐশী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা তারই বাস্তব প্রতিফলন।

৭. মুসলিম দেশসমূহের অভিজ্ঞতা

প্রসঙ্গতঃ মুসলিম দেশসমূহে বিরাজমান অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। বর্তমানে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে সরকারী আইন বা নির্দেশে ও প্রশাসনিকভাবে যাকাত আদায় হয়। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সউদী আরব, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, লিবিয়া, জর্দান, বাহরাইন, সুদান, কুয়েত ও ইয়েমেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে সৌদী আরবে ১৯৫১ সালে, লিবিয়ায় ১৯৭১ সালে, জর্দান ১৯৭৮ সালে, বাহরাইনে ১৯৭৯ সালে, কুয়েতে ১৯৮২ সালে এবং লেবাননে ১৯৮৪ সালেই যাকাত আইন প্রণীত হয়। গবেষকদের মতে রাসুলে করীম (সা.) কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় শুরু হওয়ার পর থেকে আজও ইয়েমেনে সেই বিধানই চালু রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, বাংলাদেশ, ওমান, কাতার প্রভৃতি দেশে যাকাত সংগ্রহের জন্যে সরকারের কিছু উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও এসব দেশে এজন্যে বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় কোন আইন আজ অবধি প্রণীত হয়নি। সরকারী উদ্যোগে গঠিত যাকাত বোর্ডের তহবিলে লোকেরা স্বেচ্ছাধীনভাবে তাদের যাকাতের অর্থ জমা দিতে পারে। এই অর্থ ব্যবহারের জন্যে একটা উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। বাংলাদেশে যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে। এই বোর্ডের তহবিলে যাকাতের অর্থ জমা দেওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তাই এ পর্যন্ত এর গড় বার্ষিক আদায় কুড়ি লক্ষ টাকার বেশী নয়। সেই তুলনায় চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সের গড় বার্ষিক যাকাত সংগ্রহের পরিমাণ ছয় লক্ষ টাকার উপর এবং হাটহাজারী মুইনুল ইসলাম মাদরাসার বার্ষিক যাকাত প্রাপ্তির পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে মুসলিমপ্রধান বহু এলাকায় রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনমূহ পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করে থাকে। দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকার মুসলমানদের জন্যে এই অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয়। সউদী আরবে যাকাত প্রদানে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। সউদী আরব ও কুয়েতে যাকাত আদায়ের রশিদ গেঁথে না দিলে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়নের আবেদন গৃহীত হয় না।

মালয়েশিয়াতে রাজ্যসমূহে State Council of Releigion-এর নির্দেশে প্রশাসনিকভাবে যাকাত আদায়ের বিধি রয়েছে। এটি চালু হয় ১৯৮০ হতে। তবে এ ব্যাপারে ফেডারেল সরকারের কোন আইন নেই। বিধি অনুসারে ব্যক্তির মোট যাকাতের দুই-তৃতীয়াংশ সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়। বাকী এক-তৃতীয়াংশ নিজ ইচ্ছা অনুসারে দান করা যায়। সরকারী হিসাব অনুসারে মালয়েশিয়ার ১৯৮৮ সালে যাকাতের প্রাক্কলিত পরিমাণ ছিল ৪৭৫.১৫ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে রাজ্যসমূহের তহবিলে এ বাবদে মোট জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৯.৩০ কোটি টাকা। তাই সম্প্রতি সেদেশে যাকাতবিধি লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

সুদানে যাকাত তহবিলের আইন পাশ হয় আগষ্ট, ১৯৮০ তে। তখন যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়নি। পরবর্তীকালে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ সালে প্রণীত আইনে সাহেবে নিসাব সকল মুসলমানের জন্যে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়। ইরানে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর সফল ইসলামী বিপ্লবের (১৯৭৯) অব্যবহিত পরে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং এর বন্টন ও ব্যবহারের জন্যে সরকারী দপ্তরের সৃষ্টি হয়েছে।

পাকিস্তানে সার্বিক যাকাত আদায়ের অধ্যাদেশ কার্যকর হয় ২০ জুন, ১৯৮০ হতে। উল্লেখ্য, ইরান ও পাকিস্তানে ব্যাংকসমূহ হতে উৎসমূলেই যাকাত আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। হিজরী ১৪০৯-১০ সালে যাকাত তহবিলে পাকিস্তান সরকারের আয় ছিল ২৬৮.৬০ কোটি টাকা। এই আইনের বিধানে স্থানীয় যাকাত কমিটি প্রশাসনিক কাজে মোট আদায়কৃত অর্থের ১০%-এর বেশী ব্যয় করতে পারবে না। পক্ষান্তরে পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচীর জন্যে কমপক্ষে ৪৫% ব্যয় করার ও জীবন ধারণের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ৪৫%-এর বেশী ব্যয় না করার বিধি রয়েছে। পাকিস্তানে উশর আদায়ের অধ্যাদেশ কার্যকর হয় ১৫ মার্চ, ১৯৮৩ হতে।

এসব তথ্য হতে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে:

১. বাংলাদেশসহ সকল মুসলিম দেশে সরকারীভাবে যাকাত আদায়ের আইন থাকলে এবং তা যথাযথ প্রতিপালিত হলে দেশীয় উৎস হতেই বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় হতে পারে এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ দুঃস্থ জনগণের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যেই তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে বিদেশী এনজিও নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে।

২. বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রেক্ষিতেই কয়েকটি মুসলিম দেশে যাকাতের আইন গৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে ১৯৮০ এর দশক হতে। তা সত্ত্বেও মাত্র পাঁচ-ছয়টি দেশ ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত আদায় বাধ্যতামূলক নয়।

৩. প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আদায়কৃত যাকাতের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। যাকাত আদায়ে ফাঁকি দেওয়াই এর প্রধান কারণ। এর প্রতিবিধানের জন্যে সরকারের পূর্ণ হস্তক্ষেপ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

এজন্যেই খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) এ ব্যাপারে এত সতর্ক ও কঠোর ছিলেন। পরবর্তীকালেও ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাযম, আবু ইসহাক আল-শাতিবী, আল-গাজ্জালী প্রমূখ প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাবিদগণ এ প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৮. বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন

ক. বিদ্যমান অবস্থা

আমাদের দেশে প্রবাদ রয়েছে, অভাবে স্বভাব নষ্ট। তাই সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা জরুরী। কিন্তু এজন্যে যেসব বাধা প্রধান সেসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব, প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব। এছাড়া রয়েছে প্রাকৃতিক দূর্বিপাকের ফলে ফসলহানি, বন্যা, অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্পে গৃহহানি, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে গোটা পরিবারের ভিক্ষুক হওয়ার অবস্থা। রয়েছে রোগ-ব্যাধি। দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হওয়া বা অসুস্থতায় শারীরিকভাবে পঙ্গু ও অক্ষম হওয়া তো রয়েছেই। ফলে আমাদের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের পরিমাণ দুটোই বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়। অথচ বাংলাদেশের অবস্থা এমন হবার কথা নয়। এদেশের ৮৬% লোক মুসলমান। ব্যক্তি জীবনে নিষ্ঠাবান এবং খোদাভীরু মুসলমানদের উপর আল্লাহর তরফ হতেই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট রয়েছে যা যথারীতি অনুশীলন করলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দারিদ্র্য থাকার কথা নয়। ইসলামের সোনালী যুগে তা ছিলও না। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জাযিরাতুল আরবে যাকাতের অর্থ নেবার লোক না থাকায় সেই অর্থ নতুন বিজিত দেশসমূহের জনগণের কল্যাণেই ব্যয় হতো।

অনেকেই মনে করেন দরিদ্র জনগণের অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে চাই সরকারী সাহায্য নয়তো বিদেশী অনুদান। বস্তুতঃপক্ষে এদেশে এখন বহু এনজিও বিদেশী অনুদান নিয়েই দরিদ্র জনগণ, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের গরীব জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে চলেছে। তারা প্রধানতঃ সুদের ভিত্তিতে অর্থ ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। বাস্তবে এরা দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দারিদ্র্যের চাষ করছে। এদের সৃষ্ট গোলক ধাঁধাঁ হতে বেরিয়ে আসতে

পারছে না ঋণ গ্রহীতারা। এ কাজে খৃষ্টান মিশনারী এনজিওগুলোও কম তৎপর নয়। অনেক বুদ্ধিজীবী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি হতাশা প্রকাশ করে থাকেন, তাদের হাতে নগদ অর্থ নেই বলেই দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যের চাকা ঘোরানো যাচ্ছে না। একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যেত এদেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে বিতরণ করা হয় তার সুষ্ঠু, সংগঠিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার হলে এসব দরিদ্র লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা খুবই সম্ভব ছিল।

উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, বহু ধনী ব্যক্তি লক্ষাধিক টাকার উপর যাকাত দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সাধারণতঃ এই অর্থের বড় অংশ দশ-বিশ টাকার নোটে পবিত্র রমযান মাসের শেষ দশ দিনে বাড়ির গেটে উপস্থিত গরীব নারী-পুরুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন অথবা শাড়ী-লুঙ্গি আকারে বিতরণ করে থাকেন। কখনও কখনও এরা এলাকার মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং বা ইয়াতিমখানাতে এই অর্থের কিছুটা দান করে থাকেন। এরা মুসাফির ঋণগ্রস্ত অসুস্থ লোকদের কথা আদৌ বিবেচনায় আনেন না। বিবেচনায় আনেন না আল্লাহর পথে মুজাহিদদের কথা। অথচ এরাই যদি পরিকল্পিতভাবে এলাকার দুঃস্থ, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন পরিবারের মধ্যে থেকে বাছাই করে প্রতি বছর অন্তরঃ তিন-চারটি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে রিক্সা নৌকা সেলাই মেশিন অথবা কয়েকটা ছাগল কিনে দিতেন তাহলে দেখা যেত তার একার প্রচেষ্টাতেই পাঁচ বছরে তার এলাকায় অন্ততঃ কুড়িটি পরিবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। ভিক্ষুক ও অভাবী পরিবারের সংখ্যাও কমে আসছে।

সমাজে বিদ্যমান অসহনীয় দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসনকল্পে বর্তমান সময়ে যাকাতের অর্থ দিয়ে একটি তহবিল গঠন এবং সেই তহবিল হতেই দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। ব্যাংকটি তার নিজস্ব তহবিলের যাকাত দিয়ে গড়ে তুলেছে ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন। মূলতঃ তিনটি উদ্দেশ্যে এই তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে: (ক) নগদ সাহায্য, (খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং (গ) কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন। অভাবী ও অসহায় লোকদের আশু প্রয়োজন পূরণের জন্যে (যেমন-বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত) নগদ সাহায্য প্রদান ছাড়াও চিকিৎসা সুবিধা দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, কর্মসংস্থানের জন্যে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পেশার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (বিশেষতঃ মিশুক, সেলাই মেশিন, ওয়েল্ডিং সরঞ্জাম, রিক্সা ভ্যান, রিক্সা, হাঁস-মুরগী, নৌকা ইত্যাদি) সরবরাহ করাই এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

খ. বাংলাদেশে দারিদ্র্যের চিত্র

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০% লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে যারা দৈনিক ১,৮০৫ কিলো ক্যালোরী বা তার কম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তারাই চরম দারিদ্র্য সীমায় রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা দৈনিক ২,১১২ কিলো

ক্যালোরী বা তার কম গ্রহণ করতে পারে তারা রয়েছে দারিদ্র্য সীমায়। ক্রয় ক্ষমতার অভাবই এর মূল কারণ। তাই হয় এদেরকে খাদ্য সাহায্য দিতে হবে অথবা ক্রয় ক্ষমতা বাড়াবার উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। নইলে এরা সম্পদের পরিবর্তে দেশের বোঝা বা দায় হয়ে রইবে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে কত? বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথমবারের মতো ২০০০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি [Cost of Basic Needs (CBN) Method] ব্যবহার করে Household Income and Expenditure Survey (HIES) পরিচালনা করে। এই পরিমাপ পদ্ধতিতে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৯.৮ শতাংশ। শহর অঞ্চলে এর পরিমাণ ৩৬.৬ শতাংশ হলেও পল্লী এলাকায় এর পরিমাণ ৫৩.১ শতাংশ (*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০০৪; পৃ. ১৫৬)।

এই ভয়াবহ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে সরকারের গৃহীত সাধারণ কর্মসূচী যেমন কোনক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, তেমনি একাজ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিওদের উপরও ফেলে রাখা যায় না। সমকালীন সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা বেকার দুঃস্থ ও গরীব জনগণকে কর্মসংস্থানের জন্যে সত্যিকার কোন সাহায্য করতে অপারগ। কোলেট্যারাল বা জামানত ছাড়া তারা ঋণ দেয়না। যেসব বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলা, বিকলাঙ্গ মানুষ সমাজের জন্যে দায়, যারা নিজেদেরকে অন্যের গলগ্রহ মনে করে সদা সর্বদা মানসিকভাবে সংকুচিত থাকে তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার কোন অবদান নেই।

সমাজকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে যখনই ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছে, নিজের চেষ্টায় রুটি-রুজীর ব্যবস্থা করতে পেরেছে তখন শুধু তারই পারিবারিক উন্নতি হয়নি, গোটা সমাজের চেহারাও বদলাতে শুরু করেছে। কিন্তু এদের সহায়তা করার জন্যে সুদী এনজিওর কোন উদ্যোগ নেওয়া সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। উপরন্তু সুদের ভিত্তিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে যেসব এনজিও তারা এই দারিদ্র্য দূর করতে তো পারেই নি বরং এর পরিধি আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

মনে রাখা দরকার, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে প্রদত্ত মাইক্রো ফাইন্যান্স ও মাইক্রো ক্রেডিট সমার্থক নয়। ফাইন্যান্সের সাথে মুনাফার সম্ভাব্যতা যুক্ত থাকলে তা হয়ে দাঁড়ায় ইনভেষ্টমেন্ট বা বিনিয়োগ। পক্ষান্তরে ফাইন্যান্সের সাথে সুদ যুক্ত হলে তা ক্রেডিট বা ঋণের রূপ লাভ করে। এই ক্রেডিট বা ঋণ নিয়ে বেকার নারী-পুরুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারে ঠিকই কিন্তু তার আয়ের সিংহভাগই চলে যায় কিস্তিতে সুদসহ ঋণ শুধতে। পরিণামে স্বাবলম্বী হতে পারা তার জন্যে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যেই বিশ্ব জুড়ে মাইক্রো ক্রেডিটের এত বন্দনা চললেও এর দ্বারা স্বাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বাড়ে নি, দারিদ্র্য দূর হয়নি। বরং অনেকেরই মতে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। কারো কারো অভিমত মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে এনজিওগুলো আসলে দারিদ্র্যেরই চাষ করছে।

সমাজের যে বিপুলসংখ্যক লোক কর্মজীবী হলে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গতিধারা সচল হয়, কীন্‌সের ভাষায় পূর্ণকর্মসংস্থান মাত্রা অর্জিত হয়, সেই স্তরে পৌঁছুতে হলে দরকার একটা Big Push বা প্রবল ধাক্কা। সুদী এনজিওগুলো এই ধাক্কা দিতে কখনই সমর্থ নয়। বরং তারা যদি কখনও উদ্যোগ নেয়ও পরিণামে শুরু হয়ে যায় ব্যবসায় চক্র বা Buisiness cycle যা অর্থনীতির জন্যে খুবই অশুভ। তাই যদি বিনা সুদে বা কোনও রকম মুনাফার অংশ দাবী না করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যায়, কাজের বা উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করা যায় তাহলে সমাজে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয় তার চেইন রিঅ্যাকশন চলে দীর্ঘদিন ধরে। এক্ষেত্রে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় না বলে উদ্যোক্তারা প্রকৃত অর্থেই স্বাবলম্বী হতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উদ্যোক্তা উন্নয়ন তথা ভিখারীর হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে রূপান্তরের মধ্যে দিয়েই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম। এজন্যেই ভিখারী তথা অভাবগ্রস্তকে কর্মীতে রূপান্তরের যথাযথ কৌশল উদ্ভাবন ও তার ব্যবহারই হবে যথোচিত পদক্ষেপ। এই কর্ম কৌশলই হলো মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড। দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গৃহীত না হলে সমাজে স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন অসম্ভব। জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তর তথা মানব সম্পদে উন্নীত করার জন্যে যেসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে হবে সেসবের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা এবং গৃহায়ন। অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি এগুলো পূরণ না হলে জাতি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। এজন্যে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, যুবক-যুবতীদের স্বউদ্যোগে কর্মসংস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ এবং একটি সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্যে যে মননশীলতার প্রয়োজন তার উপযুক্ত পরিচর্যাই হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল।

গ. বাংলাদেশে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে যাকাত ও উশরের মাধ্যমে কত টাকাই বা আদায় হতে পারে? এ প্রসঙ্গে সঠিক ধারণার জন্যে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

(ক) বেসরকারী এক হিসাব মতে এদেশে এখন রাজধানী শহর হতে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ/বাণিজ্যিক এলাকাতে যেসব কোটিপতি বাস করে তাদের সংখ্যা ১০,০০০ ছাড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে অন্ততঃ ১০০ জন ১০০ কোটি টাকা বা তারও বেশী অর্থের মালিক। এরা সকলেই তাদের সঞ্চিত সম্পদ, মজুত অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের কারবারের সঠিকভাবে যাকাত হিসেব করলে এবং প্রতিজন গড়ে ন্যূনতম টাঃ ২.৫০ লক্ষ হিসেবে যাকাত আদায় করলে বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

(খ) এদেশের ব্যাংকিং সেক্টর হতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে আদায় হতে পারে তা কখনও খতিয়ে দেখা হয়নি। উদাহরণতঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৩ সালে যাকাত আদায় করেছে টা. ৪.৯৬ কোটিরও বেশী। দেশে চালু অর্থ হতে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থায় যে নগদ টাকা জমা হয় এবং ব্যাংকগুলো তা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ব্যবহার করে তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর অংশ মাত্র ০.৪% (অর্থাৎ প্রতি টাঃ ১,০০০-তে টাঃ ৪/- মাত্র)। এই ০.৪% অর্থ কাজে লাগিয়েই যদি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ টাঃ ৪.৯৬ কোটি যাকাত দিতে পারে তাহলে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টর হতে হিসেব মতো ১,২৪০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, বীমা কোম্পানীগুলোকে এই হিসেবের আওতায় ধরা হয়নি।

(গ) যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা সরকারকে আয়কর দিয়ে থাকে শরীয়াহ মুতাবিক তাদের সকলেরও যাকাত আদায় করা প্রয়োজন। এরা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করলে এর পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

(ঘ) যারা আয়কর দিয়ে থাকে তারা সকলেই সাহেবে নিসাব। এদের একটা অংশ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। কিন্তু সকলেই সঠিক হিসাব মুতাবিক যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণও শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

(ঙ) যেসব কোম্পানী (ঔষধ রসায়ন জ্বালানি প্রকৌশল খাদ্য বস্ত্র গার্মেন্টস সিরামিক সিমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি) সরকারকে আয়কর দেয় তাদেরও যাকাত দেওয়া উচিত। দেশের বিদ্যমান আইনে এই বাধ্যবাধকতা নেই। এরা যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অভিজ্ঞ মহলের হিসাব।

(চ) যেসব মহিলা ব্যাংকের লকারে স্বর্ণ অলংকার রাখেন তারাও শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া এদের অধিকাংশই যাকাত আদায় করেন না।

(ছ) শহরতলী ও মফঃস্বল এলাকার ছোট ব্যবসায়ী আড়ৎদার হোটেল মালিক ঠিকাদারদের অনেকের মধ্যে যাকাত দেবার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। অথচ এসব ব্যক্তির অধিকাংশই সাহেবে নিসাব। এছাড়া পরিবহন ব্যবসা ইটের ভাটা হিমাগার কনসালটিং ফার্ম ক্লিনিক বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও যাকাতের আওতাভুক্ত। এদের যাকাতের পরিমাণ বার্ষিক শত কোটি টাকা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

(জ) যারা সরকারের বিভিন্ন ধরনের মেয়াদী সঞ্চয়পত্র কিনে রেখেছেন, যারা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা জমা রেখেছেন ও বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার কিনেছেন, যারা পোষ্টাল সেভিংস একাউন্টে মেয়াদী আমানত রেখেছেন অথবা যারা আইসিবির ইউনিট ফান্ড ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট কিনেছেন তারাও শরীয়াহ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। এ খাত হতে বছরে ৩,০০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশের ব্যাংকসমূহে ২০০২-২০০৩ সালে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭,২৫১ কোটি টাকা (*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০০৪; পৃ. ২১৯)। মেয়াদী আমানত যেহেতু এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে হয়ে থাকে এবং আমানতকারী স্বেচ্ছায় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই জমা রাখে সেহেতু এর যাকাত উসুল করা ফরয। এই অর্থের ২.৫% হারে যাকাতের পরিমাণ দাঁড়াবে ২,১৮১ কোটি টাকার বেশী।

ঘ. বাংলাদেশে প্রাপ্তব্য উশরের পরিমাণ

যেসব কৃষি জমির মালিকের নিসাব পরিমাণ ফসল হয় তাদের মধ্যে কতিপয় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্যরা ফসলের উশর আদায় করে না। বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার দিকে তাকালে দেখা যাবে সমগ্র উত্তর অঞ্চল তো বটেই, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলেও চাষাধীন জমির বৃহৎ অংশের মালিক মোট কৃষকের ১৭% - ২০%। অথচ এরা ফসলের উশর আদায় করে না। এদেশের সাহেবে নিসাব পরিমাণ ফসলের অধিকারী জমির মালিক নিজ উদ্যোগেই যদি উশর আদায় করতো তাহলে এর পরিমাণ কম করে হলেও ১,০০০ কোটি টাকার বেশী হতো।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা স্পষ্ট করা যায়। বাংলাদেশে গত ২০০০-২০০৩ বছরে গড়ে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে সেচ দেওয়া হয় গড়ে ৯৪ লক্ষ একর জমিতে যা চাষকৃত জমির ৩৫.৩০%। বিগত ২০০০-২০০৩ সালে এদেশে ধান উৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এ থেকে সেচকৃত জমির অংশ বাদ দিলে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ২৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে থেকে ক্ষুদে ও প্রান্তিক মালিক চাষী (৪০%) এবং মাঝারী চাষীদের অর্ধেককেও (২০%) যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে বাকীদের (৪০%) কাছ থেকে উশর আদায়যোগ্য ফসলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১ লক্ষ ৫৫ হাজার মেট্রিক টন।

প্রতি মেট্রিক টন চাউলের গড় দাম টা: ১৫,০০০/- ধরলে এ থেকে উশর আদায় হবে ৭৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (মূল্যের ১০% হারে)। একইভাবে সেচকৃত জমির উৎপাদন হতে পূর্বে উল্লেখিত শ্রেণীর কৃষকদের অংশ বাদ দেওয়া হলে উশর আদায়যোগ্য ফসলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৭ লক্ষ ৮৮ হাজার মেট্রিক টন। পূর্বে উল্লেখিত মূল্যে এক্ষেত্রে উশরের পরিমাণ (মূল্যের ৫% বা *নিসফে উশর* হারে) দাঁড়াবে ৩৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ফলে সেচবিহীন ও সেচকৃত জমির ধানের আদায়যোগ্য উশরের পরিমাণ দাঁড়াবে সর্বমোট ১,১৩১ কোটি টাকা। এছাড়া গম, আলু আখ প্রভৃতি ফসলের উশর আদায় করলে এই পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

উপরে উপস্থাপিত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সব ধরনের উৎস মিলিয়ে প্রতি বছর চার হাজার কোটি টাকার মতো যাকাত আদায় হওয়া খুবই সম্ভব। তবে অবশ্য পালনীয় শর্ত হলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই তা আদায়ের যথাযথ উদ্যোগ নিতে

হবে। এজন্যে শরীয়াহর বিধানসমূহ জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য কর আদায়ে সরকার যেমন কঠোর ও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে এক্ষেত্রেও তা হুবহু অনুসরণ করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যাকাত আদায় ও তা বন্টনের শরয়ী হুকুম সম্পর্কে এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের মধ্যে কিছুটা হলেও ধারণা রয়েছে। কিন্তু উশর সম্বন্ধে যে একেবারেই নেই তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। অথচ যথাযথভাবে উশর ও অর্ধ-উশর আদায় ও তা হকদারদের মধ্যে সুচারুভাবে বন্টিত হলে গ্রামাঞ্চলে বিরাজমান নিদারুণ দারিদ্র্য ও চরম ধনবৈষম্য বিদ্যমান থাকার কথা নয়। এক্ষেত্রে নির্মম সত্য হলো এই যে উশর আদায়ের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে বিত্তশালী জোতদার ও গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উপমহাদেশের অন্যতম মুজাদ্দিদ ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর উদ্দেশ্যে তাঁর হন্তারকের নিষ্ঠুর মন্তব্য ছিল- "এখন তোমার উশর বুঝে পেয়েছো তো মৌলানা?" এথেকেই বোঝা যায় তাঁর উশর আদায়ের আন্দোলনকে সেকালের ধনী জমিদার ও জোতদার মুসলমানরা কিভাবে গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশে যাকাত খাত হতে প্রাপ্তব্য এই বিপুল অর্থ দিয়ে যেসব ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব সে বিষয়ে নীচে আলোকপাত করা গেল। অবশ্য এটা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের Action Plan। প্রয়োজনে এর পরিবর্তন হবে এবং আরও লাগসই ও যথাযথ কর্মসূচী উদ্ভাবিত হবে। ত্রাণ ও কল্যাণমর্ধী পদক্ষেপ গ্রহণের মূল লক্ষ্যই হবে দারিদ্র্য বিমোচন বা দারিদ্র্য দূরীকরণ। আশা করা যায়, এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হতে দারিদ্র্য সত্যিকার অর্থেই বিদায় নেবে।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ পল্লী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণেই এটি অপরিহার্য। তাই প্রস্তাবিত কর্মসূচীগুলো অবশ্যই শহরের বস্তির পরিবর্তে পল্লীকেন্দ্রিক হবে এবং এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে হবে। যাকাতভিত্তিক কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্যই হবে মানব কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

ঙ. বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা

ত্রাণ ও কল্যাণধর্মী কর্মসূচী :

১। বৃদ্ধদের জন্যে মাসোহারাঃ এদেশে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে যারা অবসর নেয় শুধুমাত্র তারাই পেনশন পেয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবির বার্ধক্যে কোন আর্থিক সংস্থান নেই। এদের জন্যে কিছু করা খুবই জরুরী। অনেক সময়ে নিজেদের পরিবারের কাছেও এরা গলগ্রহ। এদের এই

অসহায় অবস্থা দূর করার জন্যে প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন (৪,৪৫১) এবং পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ ওয়ার্ডের (৫৮৪) প্রতিটি হতে প্রতিবছর যদি অন্তত: পঞ্চাশ জনকে মাসিক টা: ১,০০০/- হিসাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায় তাহলে ২,৭১,৭৫০ জন উপকৃত হবে। তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের খানিকটা পূরণ হবে। এজন্যে প্রয়োজন হবে বার্ষিক ৩০২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

সম্প্রতি সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার ওয়ার্ডপিছু পাঁচ জন সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ ও বিধবাদের টা: ২০০/- হারে সরকারীভাবে মাসোহারা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্ট হতে জানা যায় জনকল্যাণের চেয়ে পলিটিক্যাল স্টান্টবাজিই এর পেছন বেশী কাজ করছে। সাহায্যপ্রার্থীরা বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে সেটাই বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। যাকাতের অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে এধরনের উদ্দেশ্য কোনক্রমেই কাঙ্খিত হবে না।

২। **বিধবা/বিকলাঙ্গদের কল্যাণ:** বাংলাদেশে বিধবা এবং নানাভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া পরিবার প্রধানদের পরিবারের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নেই। ভিক্ষুকের মতোই এদের জীবন যাপন অথবা ভিক্ষাবৃত্তিই এদের একমাত্র সম্বল। এদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্যে প্রাথমিকভাবে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন এবং পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ ওয়ার্ডের প্রতিটি হতে কমপক্ষে কুড়ি জন করে বিধবা/বিকলাঙ্গ পরিবার বেছে নেওয়া হয় তাহলে সর্বমোট ১,০০,৭০০টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। এদেরকে মাসিক ন্যূনতম টা: ১,০০০/- করে সাহায্য করলে বার্ষিক ১৭০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

৩। **মৌলিক পারিবারিক সাহায্য:** এদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরতলীতেও বহু পরিবারের মশার আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যেমন মশারী নেই তেমনি শীতের প্রকোপ হতে বাঁচার জন্যে লেপ বা কম্বল নেই। শিশু ও বৃদ্ধদের কষ্ট শীতকালে অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তীব্র শীতের কারণে প্রতি বছর বহু শিশু ও বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করে। এ ছাড়া নানা অসুখের শিকার তো হয়ই। এর প্রতিবিধানের জন্যে যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড হতে প্রতি বছর কমপক্ষে পঞ্চাশটি পরিবারকে বেছে নিয়ে তাদের একটা করে বড় মশারী (৫'×৭') ও একটা বড় লেপ (৬'×৭.৫') কিনে দেওয়া যায় তাহলে তারা দীর্ঘদিনের জন্যে মশার আক্রমণ ও শীতের প্রকোপ হতে রক্ষা পাবে। এ জন্যে চাই সত্যিকার উদ্যোগ ও আন্তরিকতা। যদি প্রতিটি মশারীর গড় মূল্য টা: ২৫০/- ও লেপের মূল্য টা: ৬০০/- হয় তাহলে এজন্যে প্রয়োজন হবে ২১ কোটি ৩৯.৫ লক্ষ টাকার। এর ফলশ্রুতিতে দশ বছরে ২৫ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশী পরিবার উপকৃত হবে।

৪। **কন্যাদায়গ্রস্তদের সাহায্যঃ** আমাদের দেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের অন্যতম কঠিন সমস্যা মেয়ের বিয়ে। যৌতুকের কথা বাদ দিলেও মেয়েকে মোটামুটি একটু সাজিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাবার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই হাজার হাজার পরিবারের। এছাড়া বিয়ের দিনের আপ্যায়ন ও অপরিহার্য কিছু খরচও রয়েছে যা যোগাবার সাধ্য অনেক পরিবারেরই নেই। এসব কারণে বিয়ের সম্বন্ধ এলেও মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়ে উঠে না। পিতা বেঁচে না থাকলে বিধবা মায়ের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে ন্যূনতম টাঃ ৫,০০০/- সহযোগিতা করলে একটি মেয়েকে স্বামীর ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। যদি দেশের সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতি বছর পাঁচটি করে মেয়ের বিয়ের জন্যে এধরনের সহযোগিতা দেওয়া যায় তাহলে বছরে ব্যয় হবে ১২ কোটি ৫৮.৭ লক্ষ টাকা। দশ বছরে বিয়ে হবে ২,৫১,৭৫০টি মেয়ের। ফলে যে বিপুল সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হবে অর্থমূল্যে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

৫। **ঋণগ্রস্ত কৃষকদের জমি অবমুক্তকরণঃ** বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় এমন গ্রামের সংখ্যাই বেশী যেখানে বর্তমানে ভূমিহীন কৃষকদের অনেকেই কয়েক বছর পূর্বেও ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল এবং কৃষি জমির মালিক। কিন্তু পারিবারিক কোন বড় ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ব্যাংক বা গ্রামীণ মহাজনের নিকট হতে টাকা ঋণ নেওয়ার ফলে তার শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বেহাত হয়ে গেছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকরাই এই তালিকায় সংখ্যাগুরু। ছেলে-মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে শস্যহানির ক্ষতিপূরণের জন্যে শেষ সম্বল দুই বা তিন বিঘা চাষের জমি তারা রেহেন বা বন্ধক রাখে। এসব ঋণ গ্রহীতাদের অধিকাংশই এ ঋণ আর শুধতে পারে না। ফলে তাদের জমি চলে যায় মহাজনের হাতে। এর প্রতিবিধানের জন্যে যাকাতের অর্থ হতেই এদের সাহায্য করা যায়। যদি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা করে প্রতি ইউনিয়নে গড়ে কুড়ি জন কৃষককেও সাহায্য করা যায় তাহলে ৮৯,০২০ জন কৃষককে প্রতি বছর ঋণমুক্ত করা যায়। জমি ফেরত পেয়ে তারা আবার চাষ-আবাদ করতে ও জমির মালিক হিসাবে নিজেদের উপর আস্থা ফিরে পেতে পারে। এতে বার্ষিক ব্যয় হবে ৪৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং দশ বছরের মধ্যে প্রায় সকল ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষক ঋণমুক্ত হয়ে যাবে।

৬। **দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি সাহায্যঃ** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, শহরেও বস্তি এলাকাতে অগণিত শিশু নিদারুণ পুষ্টিহীনতার শিকার। ফলে এরা যৌবনেই নানা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেকে সারাজীবনের মতো রাতকানা স্কার্ভি রিকেট ম্যারাসমাস ঘ্যাগ পাইলস প্রভৃতি নানা রোগের শিকার হয়। এর প্রতিবিধানের জন্যে যাদের বয়স দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল, ভিটামিন 'সি' ট্যাবলেট, আয়োডিনযুক্ত লবণের প্যাকেট ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। এজন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে দুই হতে চার বছর বয়সের ১০০ জন শিশুকে বাছাই করা হয় তবে প্রতিবছর ৫,০৩,৫০০ শিশু এর

আওতায় আসবে। শিশুর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যে শিশুপ্রতি মাসিক ব্যয় যদি ন্যূনতম টা: ৬০/- ধরা হয় তাহলে বছরে খরচ হবে ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

৭। প্রসবকালীন সহযোগিতা: প্রসূতি মাতা ও ৬ সপ্তাহ বয়সের মধ্যের শিশুদের মৃত্যু উন্নয়নশীল বিশ্বে উঁচু মৃত্যু হারের অন্যতম কারণ। এদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও গর্ভবর্তী ও প্রসূতি মায়েদের যথাযথ পরিচর্যা, সেবা-যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার যোগানোর ব্যাপারে একদিকে যেমন বিপুল অমনোযোগিতা ও অশিক্ষা বিদ্যমান তেমনি সামর্থ্যের অভাবও স্বীকৃত। ফলে গর্ভবতী মায়েদের শেষের ছয় সপ্তাহে যখন পুষ্টিকর খাবারের বেশী প্রয়োজন তখন তারা তা যেমন পায় না প্রসবের পরেও সেই অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে না। ঘটনাক্রমে যদি উপর্যুপরি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তাহলে প্রসূতির অনাদর-অবহেলার সীমা থাকে না। উপরন্তু প্রসবকালে যে পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত কাপড়-চোপড়, জীবানুনাশক সামগ্রী ও ঔষধপত্র প্রয়োজন দরিদ্র পরিবারে তার খুব অভাব। এর প্রতিবিধান করতে পারলে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের কল্যাণ হবে, তাদের অকাল মৃত্যুর হার কমে যাবে। একই সাথে নবজাতকের মৃত্যুর হারও কমে আসবে। এজন্যে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডপিছু যদি কুড়িটি দরিদ্র পরিবারের গর্ভবর্তী মাকে বেছে নেওয়া হয় এবং ন্যূনতম টা: ২০০০/- সহযোগিতা দেওয়া যায় তাহলে বছরে প্রয়োজন হবে মোট ২০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

৮। মুসাফিরদের সাহায্য: নিঃস্ব মুসাফিরের জন্যেও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে আমাদের। কারণ এ হলো খোদায়ী বিধান। দেশের শহরগুলোর মসজিদে তো বটেই, থানা পর্যায়ের মসজিদেও প্রায়ই নামাজ শেষে দেখা যায় দু-একজন মুসাফির দাঁড়িয়ে যায় যার সব সম্বল শেষ। চিকিৎসা করতে এসে বাড়ী ফেরার মত অর্থ নেই, কাজের খোঁজে এসে কাজ না পেয়ে ফিরতে হচ্ছে কর্পদকশূন্য অবস্থায়, অথবা দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। এদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা আমাদের শরয়ী দায়িত্ব। এজন্যে মসজিদের ইমাম সাহেবদের সাহায্য নিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে তাদের হাতে মাসে গড়ে টা: ২,০০০/- তুলে দিলে এধরনের মুসাফিরদের নিজ এলাকায় ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করা সহজ হবে। দেশের ৬৪টি জেলা শহরে গড়ে পাঁচটি ও প্রতি থানা সদরে একটি করে মসজিদ বাছাই করা হলে মোট মসজিদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩২০+৪৬০=৭৮০। এসব মসজিদে মুসাফিরদের জন্যে মাসে গড়ে টা: ২,০০০/- ব্যয় করলে বছরে খরচ হবে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এর ফলে যে বিপুল সামাজিক উপকার হবে তা বলে শেষ করার নয়।

৯। ইয়াতীমদের প্রতিপালন: বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি জেলা সদরে সরকারী শিশুসদন রয়েছে। কিন্তু দেশের অগণিত ইয়াতীম শিশু-কিশোরদের স্থান সংকুলান এসব শিশুসদনে হওয়ার কথা নয়। উপরন্তু এখানে কিশোর নির্যাতন এবং তাদের আহার ও পোষাকের যে দুঃখবহ চিত্র মাঝে-মধ্যেই ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে তা হৃদয়

বিদারক। তাছাড়া ভয়াবহ বন্যায় কত যে শিশু-কিশোর ইয়াতীম ও নিঃস্ব হয় তার সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও শিক্ষার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা খুবই উপযুক্ত পদক্ষেপ হতে পারে। এজন্যে নতুন ইয়াতীমখানা তৈরী ও ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সাধারণ শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ১০০ জন ইয়াতীমের একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে বার্ষিক ন্যূনতম সার্বিক ব্যয় বারো লক্ষ টাকা ধরা হয় তবে এরকম পঞ্চাশটি ইয়াতীমখানার জন্যে বছরে ব্যয় হবে ছয় কোটি টাকা।

১০। **ইউনিয়ন মেডিক্যাল সেন্টার:** এদেশের পল্লী এলাকায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা যে কত অপ্রতুল ও অবহেলিত তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এদেশের গ্রামীণ জনগণ সুচিকিৎসার সুযোগের অভাবে তাবিজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করে অথবা হাতুড়েদের হাতে জীবন সঁপে দিয়ে ধুঁকে ধুঁকে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দেশের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র। এদেরকে সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ দিতে হলে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা পল্লী এলাকায় পৌঁছে দিতে হবে। এজন্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন মেডিক্যাল সেন্টার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকার 'স্যাটেলাইট ক্লিনিক' নামে ইউনিয়নভিত্তিক কর্মসূচী চালু করেছেন আজ হতে দুই দশক আগে। সে ধাঁচেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নকেন্দ্রিক এই সেন্টার গড়ে উঠতে পারে। এটি হবে মূলতঃ ভ্রাম্যমান বা মোবাইল। এখানে থাকবে একজন এমবিবিএস ডাক্তার, একজন করে পুরুষ মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ও মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী এবং পল্লী এলাকায় সব ঋতুতে ব্যবহার ও চলাচল উপযোগী বিশেষভাবে তৈরী ভ্যান।

এই ভ্যানেই থাকবে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও চিকিৎসার অপরিহার্য সামগ্রী বা সরঞ্জাম। ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত গ্রামগুলোতে পালা করে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হবে এই ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল সেন্টার। জনসংখ্যা ও দূরত্বের বিচারে কোথাও এই সেন্টার একই দিনে দুই গ্রাম আবার কোথাও বা দুই দিন একই গ্রামে যাবে। বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ পাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ। এখানে রেফারাল সুবিধার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এর ফলে পরবর্তী পর্যায়ে একই উদ্দেশ্যে জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত উন্নতমানের হাসপাতালগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রোগীর দ্রুত ও উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত হবে। ইউনিয়নপিছু কেন্দ্রের গড় মাসিক ব্যয় (ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, ভ্যানচালকের বেতন ও ঔষধসহ) ন্যূনতম কুড়ি হাজার টাকা ধরলে দেশের ৪,৪৫১টি ইউনিয়নের জন্যে বার্ষিক ব্যয় দাঁড়াবে ১০৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

১১। **মরণোত্তর ঋণ পরিশোধ :** সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, ঋণ রেখে মারা গেলে আল্লাহ শহীদকেও ক্ষমা করবেন না। ঋণ বান্দার হক, এই ঋণ পরিশোধ না করার গুণাহ আল্লাহও ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না ঋণদাতা তা ক্ষমা না করে দেয়।

সুতরাং, ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেলে এবং তার সন্তান-সন্ততি বা উত্তরাধিকারীরা সেই ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে আখিরাতে ঐ ব্যক্তির অনন্ত আযাবের আশংকা রয়েছে। তাই, ঋণগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকের জমি অবমুক্ত করার জন্যে যে ধরনের সহযোগিতার প্রস্তাব ইতিপূর্বে করা হয়েছে অনুরূপ সাহায্য এক্ষেত্রেও দেওয়া যেতে পারে। বরং এর ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। কৃষি কাজ ছাড়াও নানা কারণে লোকে ঋণ নেয় এবং অনেকে তা সাধ্যমতে চেষ্টা সত্ত্বেও শুধতে পারে না। এদের মরণোত্তর ঋণ পরিশোধে এগিয়ে এলে অসহায় সন্তান-সন্ততি ও বিধবা স্ত্রী পীড়ন ও অসম্মান হতে রেহাই পাবে। উপরন্তু ঋণ যদি জমি বন্ধক রাখার কারণে হয়ে থাকে তাহলে ঋণ পরিশোধের ফলে জমি ফিরে পাবে ওয়ারিশরা। এতেও বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

১২। **শরণার্থী সহায়তা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন** : বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা সন্ত্রাসের শিকার। স্বদেশ ছেড়ে পার্শবর্তী দেশে আশ্রয় নিচ্ছে অসহায় হাজার হাজার নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ। জীবন বাঁচাবার জন্যে নিরুপায় হয়ে অনেকেই শুধু পরনের কাপড়টুকু সম্বল করে অজানা গন্তব্যের দিকে যারা পাড়ি জমিয়েছিল তাদের বর্তমান বিভীষিকাময়, ভবিষ্যৎ অজানা ও অনিশ্চিত। চেচনিয়া বসনিয়া মায়ানমার মেসিডোনিয়া কাশ্মীর মিন্দানাও ইথিওপিয়া পূর্ব তিমুর নাইজেরিয়া এবং আফগানিস্তান এর জ্বাজ্বল্যমান উদাহরণ। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু হাইকমিশনের দেওয়া সাহায্য এবং মাঝে মাঝে মুসলিম বিশ্বের কোন কোন দেশের পাঠানো মানিবক সাহায্য বিপুল প্রয়োজনের সমুদ্রে গোস্পদ মাত্র। লাখো লাখো বনি আদমের সাহায্যে মুসলিম মিল্লাতকেই এগিয়ে আসতে হবে। উম্মাহর এই দুর্দিনে রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যক্তি মুসলমানকেও এগিয়ে আসতে হবে তার শক্তি সামর্থ্য নিয়ে। সেই সাথে যাকাতের অর্থও দিতে হবে আকাতরে এসব অভাবী ভাইবোনদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে, তাদের পুনর্বাসনের জন্যে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের পাশাপাশি শীতের ঠান্ডা ও গ্রীষ্মের দাবদাহ হতে রক্ষার জন্যে চাই উপযুক্ত আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশে এখনও মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান এবং আটকেপড়া পাকিস্তানীদের অনেকেই মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। এদের প্রয়োজন পূরণ ও প্রত্যাবাসনেও যাকাতের অর্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। চাই শুধু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও যথাযথ পরিকল্পনা।

১৩। **স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার:** দেশের পল্লী এলাকায় তো বটেই, শহরতলীতেও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের অভাব প্রকট। হাজার হাজার পরিবারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার বানাবার আর্থিক সামর্থ্য নেই। সেজন্যেই যেখানে সেখানে প্রস্রাব ও পায়খানার কদর্য ও স্বাস্থ্যবিধি বহির্ভূত অভ্যাস আরও বেশী প্রসার লাভ করে চলেছে। ফলে সহজেই পানি দূষিত হচ্ছে, সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে, পুঁতিগন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। উপরন্তু গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের পক্ষে ইজ্জত-আবরু বজায় রেখে প্রাকৃতিক এই প্রয়োজন পূরণ করা খুবই দুরূহ। দেশের উত্তরাঞ্চলে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশী প্রকট। এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত

শৌচাগারের ব্যবস্থা করা জরুরী। এজন্যে প্রয়োজন একটা প্যানসহ স্লাব ও সিমেন্টের ২ বা ৩টা রিং। এজন্যে সর্বোচ্চ খরচ পড়বে সাড়ে তিনশ টাকা। গ্রহীতারা নিজেরাই পাটখড়ি, শুকনা কলাপাতা বা পলিথিন দিয়ে এটা ঘিরে নিতে পারে। যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে বছরে ৫০টি করে পরিবারকে এই সুবিধা দেওয়া যায় তাহলে প্রয়োজন হবে ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এভাবে ১০ বছরে ২৫,১৭,৫০০ পরিবার এই কর্মসূচীর আওতায় চলে আসবে। পর্দা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশদূষণ রোধে এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী।

১৪। **নওমুসলিম পুনর্বাসন:** দেশে প্রতি বছরই বিভিন্ন জেলায় কিছু কিছু ব্যক্তি বা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করছে। ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই এরা পারিবারিক সম্পদ ও সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়। এদের সন্তান-সন্ততিরাও লেখা-পড়ার সুযোগ পায়না। এদের সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্যে সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব। তবে ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের মতো এদের জন্যে পৃথক কোন অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা না করে বরং সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে মিশে যেতে সাহায্য করাই শ্রেয়। যদি গোটা দেশে প্রতি বছর অন্তত: পঞ্চাশটি নওমুসলিম পরিবারকে এ উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মাসিক টা: ৫,০০০/- হারে একবছর ভাতা প্রদান ও কর্মসংস্থানের জন্যে এককালীন দশ হাজার টাকা সাহায্য করা যায় তাহলে বছরে ব্যয় হবে ৩০ লক্ষ টাকা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী

১। **দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে সহযোগিতা:** ইসলামী শিক্ষা অর্জন ব্যতিরেকে প্রকৃত মুমিন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এদেশে ক্রমেই সেই সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসছে। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদরাসাগুলো কোনক্রমে টিকে রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় এদেশে ১৯৯১-৯২ সালে দাখিল মাদরাসার সংখ্যা ছিল ৪,৪৬৬। এ সংখ্যা ১৯৯৪-৯৫ সালে ৪,১২১ এ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ তিনবছরে মাদরাসার সংখ্যা কমেছে ৩৪৫টি। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে প্রাইমারী স্কুল ও হাইস্কুলের প্রাইমারী অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবই বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে। উপরন্তু শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখা) কর্মসূচীও চালু রয়েছে। কিন্তু মাদরাসাগুলো এসব সুযোগ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মাদরাসাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ধরে রাখতে হলে তাদের জন্যেও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। বিনামূল্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বই প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পোষাক যোগান দিতে হবে। এজন্যে যদি দাখিল মাদরাসাগুলোসহ আলিম ও ফাযিল মাদরাসার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেছে নেওয়া হয় তাহলে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১০ লাখের মতো। এদের বই সরবরাহ করতে গড়ে মাথাপিছু টা: ১৫০/- হিসাবে দরকার হবে ১৫ কোটি টাকা। এক সেট পোশাক সরবরাহ করলে খরচ পড়বে গড়ে মাথাপিছু টা: ২০০/- হারে ২০ কোটি টাকা। এছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ভিটামিন ও আয়রন ট্যাবলেট সরবরাহ করলে প্রয়োজন হবে আরও ১০ কোটি টাকার। সর্বসাকুল্যে এই ৪৫ কোটি টাকার বিনিময়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের যে স্থায়ী ভিত রচিত হবে তার ভবিষ্যৎ মূল্য অপরিসীম। এসবের পাশাপাশি মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংগুলোতেও খাদ্যমান বাড়াবার জন্যে যাকাতের অর্থ ব্যবহার অপরিহার্য।

২। **ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ** : মনে রাখা দরকার, ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসালমী জীবনব্যবস্থা কায়েমের জন্যে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও সেসবের বিকাশের কোন বিকল্প নেই। যেকোন আন্দোলন বা জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য নির্ভর করে তার Institution building ক্ষমতার উপরে। সে জন্যেই মাদরাসাসহ অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান দ্বীনের কাজে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে। একই সাথে ইসলামী চিন্তা ও বিশ্বাসের ধারক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কাজে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। সহজবোধ্য করে লেখা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদী শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ অথচ স্বল্প আয়তনের বইয়ের আজ বিশেষ প্রয়োজন। এসব বই পৌঁছে দিতে হবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের হাতে। এছাড়া পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দুনিয়াসবর্স্ব জীবনদর্শনের মুকাবিলা করা আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ ইউসুফ আল-কারযাবীর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেন-

> "যাকাত খাতের সমস্ত আয় সাংস্কৃতিক, প্রশিক্ষণমূলক ও প্রচারধর্মী কার্যাবলীতে ব্যয় করাই এ কালে উত্তম। ... সঠিক ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন এ কালে সব কয়টি মহাদেশেই একান্ত কর্তব্য। কেননা এ কালে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলছে। একাজও *জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ* রূপে গণ্য হতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং মুসলিম যুবসমাজকে একাজে নিয়োজিত ও প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক। ... খালেস ইসলামী মতবাদ ও চিন্তাধারামূলক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রচার করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা প্রতিহত করবে বিধ্বংসী ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার যাবতীয় কারসাজি। তার ফলেই আল্লাহর কালেমা প্রাধান্য লাভ করতে পারে এবং সত্য সঠিক চিন্তা সর্বত্র প্রচারিত হতে পারে। এ কাজও আল্লাহর পথে জিহাদ। ... ঘুমন্ত মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করা এবং খৃস্টান মিশনারী ও নাস্তিকতার প্রচারকদের মুকাবিলা করা নিশ্চয়ই ইসলামী *জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ*।" (ইউসুফ আল-কারযাবী- *ইসলামে যাকাত বিধান*, ২য় খণ্ড, অনুবাদ- মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩; পৃ. ১৭৫-১৭৬)

৩। **দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ** : স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি আহবান বা দাওয়াত এবং প্রচার বা তাবলীগের কাজ খুব অবহেলিত। ইসলামের শিক্ষা ও তার দাবী সম্বন্ধে অনবহিত হওয়ার কারণেই আজ যুব সমাজ বিপথগামী, ভিন্ন জীবন দর্শনের অনুরাগী। এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করার বিকল্প নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, তাদের হাতে ইসলামী সাহিত্য পৌঁছে দেওয়া, খৃষ্টান মিশনারী ও এনজিওদের অপতৎপরতা সম্বন্ধে

ওয়াকিবহাল করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে অপপ্রচার ও শ্বেতসন্ত্রাস চলছে সে সম্বন্ধে অবহিত করার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ নিতান্তই জরুরী। এই উদ্দেশ্যে ইসলামী সাহিত্যের প্রচার ও পাঠাগার গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। দেশের সর্বত্র এই কাজের যথাযোগ্য আনজাম দেবার জন্যে কমপক্ষে থানাভিত্তিক লোক নিয়োগ করতে হবে। এজন্যে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা খরচ করলে সারা দেশে বছরে খরচ হবে মাত্র তিন কোটি টাকা। দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থ বিবেচনায় এই অর্থ একেবারেই নগণ্য।

উপরন্তু দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে যদি অন্ততঃ প্রথম পর্যায়ে পাঁচ বছরের জন্যেও ইসলামী সাহিত্য বিতরণ ও পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পিছু ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার ঢাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় তাহলে বছরে খরচ হবে পঁচিশ কোটি টাকার কিছু বেশী। ইসলামবিরোধী শক্তির আগ্রাসন মুকাবিলার জন্যে এই অর্থ একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। অথচ এই ব্যয় জাতির স্বার্থে অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই পরিমাণ অর্থ সাধারণভাবে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। তাই যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে হলেও যুব সমাজকে চিন্তা ও মননশীলতার দিক থেকে ধ্বংসের পথ হতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তৎপরতা গ্রহণ একান্তই জরুরী।

৪। **ছাত্রদের জন্যে বৃত্তিঃ** দেশের মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে তাদের বিরাট অংশ ক্ষুদে ও মাঝারি কৃষক পরিবারের সন্তান। তারা দারুণ আর্থিক সংকটের শিকার। এদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্যে মাতাপিতাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বিক্রী করতে হয় অথবা বন্ধক রাখতে হয়। অনেককে নিরুপায় হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়। এদের মধ্যে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, সম্মান ও মাষ্টার্স শ্রেণী, মাদরাসার ক্ষেত্রে আলিম ফাজিল ও কামিল শ্রেণী, প্রকৌশল ও মেডিক্যাল কলেজ এবং পলিটেকনিক ও ভকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে অধ্যয়নের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যদি প্রতিবছর পঞ্চাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বাছাই করা হয় এবং মাসিক টা: ১,৫০০/- হারে বৃত্তি দেওয়া হয় তাহলে বার্ষিক ব্যয় হবে ৯০ কোটি টাকা। এভাবে দশ বছরে পাঁচ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

উল্লেখ্য, যেহেতু দ্বিতীয় বছরে নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এ প্রকল্পের আওতায় আসবে এবং পুরাতনরাও অধ্যয়নরত থাকবে সেহেতু তখন প্রয়োজন হবে ১৮০ কোটি টাকা। তৃতীয় বছরে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২৭০ কোটি টাকা। চতুর্থ বছর হতে প্রয়োজন হবে ৩৬০ কোটি টাকার। সম্ভাব্য বৃত্তিভোগীদের বাছাই করার সময়ে মেধার পাশাপাশি প্রকৃতই পারিবারিক আর্থিক অনটন রয়েছে এমন প্রত্যয়নপত্রের প্রয়োজন হবে। এলাকার দুজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর আমল-আখলাক ও তাকওয়া সম্বন্ধে গোপনে প্রত্যয়ন করবেন। উপরন্তু বৃত্তিভোগীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রাপ্ত অর্থের অন্তত: ৫০% ওয়াকফ তহবিলে কিস্তিতে পরিশোধ করবে এরকম বিধান করাও সম্ভব।

৫। মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: মহিলাদের ঘরে বসেই জীবিকা উপার্জনের পথ করে দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন ধরনের সেলাই , কাটিং-নিটিং, এমব্রয়ডারী, বুটিক, ফেব্রিকস প্রিন্ট, ফুল, চামড়া ও কাপড়ের সৌখিন সামগ্রী, উলের কাজ ইত্যাদি শেখানোর জন্যে জেলা ও থানাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মহিলাই কাজ শেখার সুযোগ পাবে। এজন্যে বড় বড় শহরে একাধিক এবং ছোট জেলা ও বড় থানাগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে মোট ১০০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষকের বেতন, শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয়সহ মাসিক ন্যূনতম গড় ব্যয় টা: ৮,০০০/- ধরলে বছরে ব্যয় হবে ৯৬ লক্ষ টাকা। বিনিময়ে হাজার হাজার মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে। তাদের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, পরিবারের বিপর্যয়ও রোধ হবে।

৬। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ: ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার। যদি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে যাবে। এ ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যেই অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সে দেশের সরকার উদ্যোগ নিয়ে V-Sat চ্যানেলের সংযোগ নিয়েছে এবং শুধুমাত্র ডাটা এন্ট্রি করেই প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। আমাদেরও আগামী শতাব্দীর চাহিদা ও কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখনই যুগপৎ প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো (Communication infrastructure) গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। যদি প্রাথমিকভাবে দেশব্যাপী ১০০টি সঠিক মানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তাহলে বছরে ন্যূনতম ১২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। এজন্যে প্রথম বছরে ৫ কোটি টাকার মতো ব্যয় হলেও শেষে এটা বছরে দুই কোটি টাকার নীচে নেমে আসবে।

কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচী

১। গরু/বলদ ক্রয়ে সাহায্য: গ্রাম বাংলায় কৃষি কাজের প্রধান অবলম্বন চাষের বলদ। একই সঙ্গে পুষ্টি ও উপার্জনের সহায়ক হলো দুধেল গাই। বহু কৃষকের জমি থাকলেও এক জোড়া বলদ নেই। কেনার সামর্থ্যও নেই। এদের হালের বলদ বা দুধেল গাই কিনে দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। প্রতিটি গরু বা বলদের দাম যদি গড়ে টা: ৭,৫০০/- ধরা যায় এবং প্রতি ইউনিয়নে গড়ে কুড়ি জনকেও এ ধরনের সাহায্য করা যায় তাহলে প্রতি বছর ব্যয় হবে ৬৬ কোটি ৭৬.৫ লক্ষ টাকা। এ কর্মসূচী দশ বছর চালু থাকলে চাষাবাদ ও দুধের মাধ্যমে উপার্জন ও পুষ্টির ক্ষেত্রে বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। গতিবেগ সঞ্চারিত হবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে।

২। **বিভিন্ন পেশাগত কর্মস্থান**: শহরতলীসহ বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় নিদারুণ বেকারত্ব বিদ্যমান। দেশে কর্মরত এনজিওগুলো এসব বেকারদের, বিশেষতঃ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্যে নানা ধরনের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঋণ দিচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এ ঋণ নিয়ে তারা স্বনির্ভর হতে পেরেছে, না সুকৌশলে তাদের শুষে নিয়ে এনজিওগুলো নিজেরাই ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে সেই বিচার আজ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিপরীতে যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি নীচের খাতগুলোতে উপকরণ/সরঞ্জাম কিনে সাহায্য করা যেত তাহলে কি পরিমাণ উপকার হতে পারতো তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

গ্রামবাংলার ইউনিয়নসমূহ ও শহরতলীর এলাকাগুলোতে যেসব পেশায় অধিক সংখ্যক লোকের কাজের সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো:

ক) *ক্ষুদ্র আকারের উৎপাদন:* চাল/চিড়া/মুড়ি/মোয়া/খই তৈরী, পাটি তৈরী, চাটনী/আচার /মোরব্বা তৈরী, মিঠাই তৈরী, লুঙ্গি/তোয়ালে/গামছা বোনা, বাঁশ-বেতের কাজ, নকশী কাঁথা তৈরী, খেলনা তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, সব্জী চাষ ইত্যাদি।

খ) *পেশাগত সরঞ্জাম ক্রয়, সংযোজন ও মেরামত:* রিক্সা ও রিক্সাভ্যান তৈরী ও মেরামত, জাল তৈরী, গরু ও ঘোড়ার গাড়ীর চাকা তৈরী ও মেরামত, চাষাবাদের সরঞ্জাম তৈরী ও মেরামত, ইলেকট্রিক সামগ্রী মেরামত, স্যালো মেশিন মেরামত ইত্যাদি।

গ) *ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসা.* মুদী দোকান, মনিহারী দোকান, এ্যালুমিনিয়াম/মাটির তৈজসপত্রের দোকান, চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, মাছের ব্যবসা, সব্জীর ব্যবসা, মৌসুমী ফলের ব্যবসা, ফুলের দোকান, ফেরীওয়ালা ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত চল্লিশ ধরনের কাজের মধ্যে যদি প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে যেকোন দশটি পেশায় প্রতি বছর গড়ে দশ জন হিসাবে একশত জন বেকার অথচ উদ্যোক্তা পুরুষ ও নারীকে গড়ে পাঁচ হাজার টাকার উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করা যায় তাহলে বছরে প্রয়োজন হবে সর্বমোট ২৫১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এ সুযোগ একজন লোক মাত্র একবারই পাবে। ফলে প্রতি বছর কর্মসংস্থান হবে ৫,০৩,৫০০ জনের। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক বাদে উল্লেখযোগ্য এনজিওগুলোর প্রদত্ত ঋণের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ ছিল ৪,৩৯৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র ১৯৯৭ সালে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৫০৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এবছরে ঋণগ্রহীতাদের গৃহীত মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র টাঃ ২,২৩৮/-। (তথ্যসূত্র: CDF Statistics, Vol. 5, December 1997, Credit and Development Forum, Dhaka, p. 60.)। এই ঋণ সবটাই শুধতে হয়েছে সুদসহ যার হার খুবই চড়া। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ হার ১২২% হতে ১৭৩%, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে ২১৯% পর্যন্ত (*ইনকিলাব*, ৯ ও ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭)। এরই বিপরীতে যাকাতের মাধ্যমে উপকরণ গ্রহীতাকে সাহায্য করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং প্রদত্ত অর্থও (যার পরিমাণ এনজিওগুলো প্রদত্ত গড় অর্থের দ্বিগুণেরও বেশী) তার কাছে রয়ে যাচ্ছে মূলধন আকারেই।

৩। **গৃহায়ণ কর্মসূচী:** বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে প্রতি তিন জনের একজনেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। প্রতি বছর অগ্নিকাণ্ড, বন্যা ও নদী ভাঙনের ফলে ক্রমেই এই সংখ্যা বাড়ছে। শহর রক্ষাকারী বাঁধ, রেল লাইনের দুপাশ, নদীর উঁচু পাড়, বেড়ী বাঁধ প্রভৃতি জায়গায় কোন রকমে খুঁটির মাথায় পলিথিন, চট, সিমেন্টের ব্যাগ দিয়ে আচ্ছাদন তৈরী করে বাস করছে দুর্গত বনি আদমরা। সেখানে না আছে আলো-বাতাস, না আছে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা। লেখাপড়া বা চিত্ত বিনোদনের কথা নাই বা বলা হলো। এছাড়া অফিস-আদালত ও স্কুল-কলেজের বারান্দায়, রেল স্টেশন ও বাস টার্মিনালে বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল নারী-পুরুষ রাত কাটায়। এদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করতে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারী খাস জমি বা জেগে ওঠা নতুন চরে এদের বহুজনেরই বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রয়োজন ন্যূনতম তিন বান টিন, গোটা দশেক বাঁশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম। এছাড়া বেড়াও দিতে হবে। বিশুদ্ধ পানির জন্যে প্রয়োজন টিউবওয়েলের। হাজার বিশেক টাকার মধ্যে এসব প্রয়োজন পূরণ সম্ভব। দেশের ৫,০৩৫টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে প্রতিবছর যদি অন্তত: পাঁচটি করে পরিবারকে ঘর বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে উপকৃত হবে ২৫,১৭৫টি পরিবার, ব্যয় হবে ৫০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

এভাবে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী বৃহৎ বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করে স্থায়ী কর্মসংস্থানের যেমন সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তেমনি এসব বিনিয়োগ হতে নিয়মিত ও স্থায়ী উপার্জনেরও সুযোগ হয়। এর ফলে পুরাতন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীগুলো অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে। উদাহরণতঃ পরিবহন শিল্পের কথা ধরা যেতে পারে। দেশে সড়ক যোগাযোগের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আন্তঃজেলা ও রাজধানীর সাথে সড়ক পথে যাতায়াতের পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। এই সুযোগ গ্রহণ করে যদি আধুনিক ২০০ বাস (এয়ার কণ্ডিশনড নয়) রাস্তায় নামানো যায় তাহলে সর্বসাকুল্যে ব্যয় হবে ১০০ কোটি টাকা। এথেকে যে আয় হবে তা যেমন পুনরায় বিনিয়োগ করা যাবে তেমনি বিপুল সংখ্যক লোকেরও কর্মসংস্থান হবে। ড্রাইভার কন্ডাকটর হেলপার ওয়েলম্যান মেকানিক ওয়ার্কশপ ইত্যাদি মিলে বিরাট সংখ্যক লোক কর্মব্যস্ত থাকার সুযোগ পাবে।

চ. সমস্যা

যাকাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জাতি তা থেকে বঞ্চিত। কারণ যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে বিষম বাধা। এসব সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে আলোকপাত করা অপরিহার্য। নীচে সংক্ষেপে এসব প্রসঙ্গ তুলে ধরা হলো।

প্রথমতঃ বাংলাদেশে ইসলামের মৌলিক যেসব প্রসঙ্গ নিয়ে জোরদার আলোচনা কম হয়েছে যাকাত সে সবের অন্যতম। যাকাত সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় যদিও

কিছু কিছু আলোচনা হয় ওয়াজ মাহফিল বা তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে আলোচনা হয় তার চেয়ে অনেক কম। দেশে যতলোক পত্র-পত্রিকা পড়েন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী লোক ওয়াজ মাহফিলে জমায়েত হয় এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তৃতা হতে শিক্ষা লাভ করে অনুপ্রাণিত হয়। ওলামা মাশয়েখগণ যদি জনগণকে যাকাতের হাকীকত ও ফযীলত এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা সম্বন্ধে যথাযথ বক্তব্য রাখতেন তাহলে এতদিনে যাকাতের উপযুক্ত ব্যবহার ও উসুল সম্পর্কে আরও বেশী সচেতনতা লক্ষ্য করা যেতো। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও ব্যবহার হলে যে কল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়া যেতো সে বিষয়েও জনগণের প্রায় কোন ধারণাই নেই।

দ্বিতীয়তঃ সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাকাত আদায়ের জন্যে এদেশে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। প্রয়োজনীয় আইন বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গৃহীত না হওয়াই এজন্যে প্রধানতঃ দায়ী। যারা যাকাত দিয়ে থাকেন তাদের কেউ কেউ অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতীমখানায় তাদের যাকাত পৌঁছে দেন। কখনও বা এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে লোক নিয়োগ করে যাকাত সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিপুলসংখ্যক যাকাত প্রদানকারী পুরুষ ও মহিলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মর্জিমাফিক তাদের প্রদেয় যাকাতের অর্থ বিলি-বন্টন করে থাকেন। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন খুব সহজসাধ্য নয়।

তৃতীয়তঃ সরকার যদি যাকাত আদায় ও তার ব্যবহার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করেও তবু জনগণের পক্ষ হতে কাংখিত সাড়া বা সহযোগিতা লাভ খুব সহজ হবে না। কারণ এদেশের সরকারের আর্থিক লেনদেন ও অর্থব্যয়ের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের আচরণ ব্যক্তিজীবন ও ইসলামের প্রতি তাদের কমিটমেন্টের প্রতি সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে, পর্যবেক্ষণ করবে। বলাই বাহুল্য, সেই মাপকাঠিতে অনেক ঘাটতি, অনেক অপূর্ণতা ধরা পড়বে। দ্বীনদার মুসলমানরা চাইবে তাদের এই আর্থিক ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হোক, প্রকৃত হকদারদের হাতেই এই অর্থ পৌঁছুক। অর্থ আত্মসাৎ বা দুর্নীতি দূরে থাক, এক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি বা অপূর্ণতাও তারা মেনে নেবে না। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যে সঠিক জনশক্তি নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণের কোন বিকল্প নেই।

কিন্তু এ কাজ যেমন সহজসাধ্য নয়, তেমনি স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করারও নয়। এজন্যে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজন হবে একটা পাইলট স্কীম তৈরী করে তার বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। এই পাইলট স্কীম সফল হলে সেই আলোকেই প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা সাপেক্ষে এর সার্বজনীন রূপ দেওয়া যেতে পারে, আইন তৈরী হতে পারে এবং দেশব্যাপী তার প্রয়োগ শুরু হতে পারে। এজন্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে উপযুক্ত কর্মকৌশল নির্ধারণের কাজ এখনি শুরু হতে পারে।

ছ. সম্ভাবনা

উপরের আলোচনা হতে এ সত্য দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই আল্লাহর দেওয়া বিপুল সম্পদ রয়েছে। এর সঠিক ব্যবহার করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে কোন আলাউদ্দিনের চেরাগের দরকার নেই। দরকার নেই বিদেশী সাহায্যের। যা দরকার তা হলো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও দাবী সম্বন্ধে জনগণের ওয়াকিবহাল হওয়া, যাকাত আদায় ও বিলি-বন্টন সম্পর্কে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও সরকারী নীতি-নির্দেশনা এবং একটি সুদূরপ্রসারী কার্যকর পরিকল্পনা। তাহলে এনজিওদের কবলমুক্ত এবং সুদের অভিশাপমুক্ত হয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সাহেবে নিসাব ব্যক্তিরা যাকাত উসুল করে থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং তা বিলি-বন্টনও করে থাকে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে। বহু ব্যক্তি প্রতিবছর লক্ষাধিক টাকা যাকাত আদায় করে থাকেন। কিন্তু তাদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় ব্যয়িত এই অর্থ হতে দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ বা দারিদ্র্য দূরীকরণ কোনটাই হয় না। অথচ এসব ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করে এদেরই দেয় যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র আকারে বা স্থানীয়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কঠিন বা অসম্ভব কাজ নয়। প্রয়োজন এদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সুফল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেওয়া। আশার কথা, ইতিমধ্যেই দেশের কোন কোন অঞ্চলে সাংগঠনিকভাবে এই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং তার উপকারও চাক্ষুষ করা যাচ্ছে।

তৃতীয়তঃ যাকাত আদায় ও তা বিলিবন্টনের জন্যে সরকার বা কোন সংস্থার বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। যাকাত আদায়কারীই যেহেতু আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসারে যাকাতের অর্থ পেতে পারে (সূরা আত্-তওবা: ৬০ আয়াত) সেহেতু আদায়কৃত যাকাত হতেই আদায়কারীকে এর একটা অংশ সম্মানী বা বেতন হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান একাজে এগিয়ে এলে তাকেও এ অর্থ দেওয়া সম্ভব। এর ফলে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। উপরন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যাকাত সংগ্রহ ও অর্থ-সামগ্রী বিতরণ করার কাজটিও সহজ হবে।

চতুর্থতঃ এ ব্যাপারে দেশের ওলামা-মাশায়েখদের ঐক্যবদ্ধ, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত ও উশর আদায় এবং তার সর্বোচ্চ কল্যাণমুখী ব্যবহারের জন্যে জনগণকে আহ্বান জানাতে পারেন। একই সঙ্গে সরকারকেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গঠনের জন্যে বলতে পারেন। অনুরূপভাবে দেশের বিভিন্ন দ্বীনি সংগঠন ও ইসলামপ্রিয় শিক্ষিত জনগণের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা গ্রহণের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। তবে মনে রাখা দরকার, যাকাতই দেশের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সমাজ কল্যাণের একমাত্র হাতিয়ার নয়, অন্যতম হাতিয়ার মাত্র। শরয়ী এই ইবাদাতের পাশাপাশি সচেতন দেশবাসী ও রাষ্ট্রকে এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য উৎস ও পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহারে আন্তরিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখাও অপরিহার্য।

পঞ্চমতঃ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ঐক্যজোটের সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন তারা ইসলামী মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আশা-আকাঙ্খা পূরণে তারা তৎপর হবেন এই প্রত্যাশা দেশবাসীর। এই সরকার একটু উদ্যোগ নিলেই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব। বিশেষত: এই খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা বৃহত্তর সমাজকল্যাণের কাজেই যেহেতু ব্যয়িত হবে সেহেতু এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ও বিষয়টি নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করতে পারে। তৈরী করতে পারে একটা প্রকল্পপত্র এবং সেটি সরকারের অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত হতে পারে।

তবে এ ব্যাপারে বাধা আসবে ইসলামবিরোধীদের চাইতে তথাকথিত ইসলাম দরদীদের কাছ থেকে। এসব বাধা জয় করার দৃঢ় মানসিকতা থাকতে হবে। সুদান, পাকিস্তান প্রভৃতি বৃটিশশাসিত দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবিরাই সেসব দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈরী ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু জেনারেল জিয়াউল হকের মতো নেতারা তাদের কাছে মাথা নোয়ান নি। তাই ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জনগণ সঙ্গতঃভাবেই আশা করতে পারে সরকার এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখবেন এবং মুমিন মুসলিমের বহুদিনের অন্তরলালিত বাসনা পূরণে সমর্থ হবেন।

সরকারের যথোচিত উদ্যোগ, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং কার্যকর ভূমিকা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বারো কোটি তৌহিদী জনতা অধ্যুষিত এই দেশে যারা *সাহেবে নিসাব* তারা সকলেই যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিয়মিত যাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে আল-কুরআনে উল্লেখিত খাতগুলোতে ব্যয়ের জন্যে উদ্যোগী হন তাহলে দেশে গরীব জনগণের ভাগ্যের চাকা যেমন ঘুরবে তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি হবে আরও বিস্তৃত। এজন্যে প্রয়োজন আজ সদিচ্ছার, সুষ্ঠু পরিকল্পনার এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে প্রকৃতই দৃঢ় অভিলাষের।

সুদ : অর্থনৈতিক কুফল ও উচ্ছেদের উপায়

"... এবং আল্লাহ্ ব্যবসাকে করেছেন হালাল ও সুদকে করেছেন হারাম।"
(সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৫ আয়াত)

আল্লাহতায়ালা কালাম-ই-পাকে এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার মাধ্যমে সর্বকালের ও সকল বনি আদমের জন্যে একদিকে যেমন ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্যদিকে সুদ ও সুদভিত্তিক সকল কার্যক্রমকে চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। অর্থনীতিতে শোষণের অবসান ও যুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি ইসলাম হেনেছে তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনীতিতে যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। বস্তুতঃ সুদের মত সমাজবিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দুটি নেই। সুদের কুফলগুলোর প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কেন সুদ চিরতরে হারাম ঘোষিত হয়েছে।

সুদের অর্থনৈতিক কুফল

মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা হতে সুদের নানাবিধ কুফলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুদের নৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিক এমনকি মনস্তাত্বিক কুফলও রয়েছে। কিন্তু সেসব আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধুমাত্র দৃশ্যমান ও বড় ধরনের অর্থনৈতিক কুফল সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১। সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বা উপায়। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণ গ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।

২। সুদের কারণেই সমাজে দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরো ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ

প্রয়োজনের সময়ে সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় প্রকার কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদনী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও বিনা সুদে ঋণ মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদ শোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে উত্তমর্ণ আরো ধনী হয় । বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য।

বাংলাদেশে ধনীরা যে ক্রমাগত ধনী হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিশেষ সহযোগিতা। যোগ্যতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় জামানত দিতে না পারার কারণে সুদী ব্যাংকগুলো হতে ঋণ পায় না, অথচ বিত্তশালী ব্যবসায়ী বা শিল্প উদ্যোক্তারা সহজেই ঋণ পায়। ব্যাংক হাজার হাজার লোকের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু ঐ অর্থ ঋণ আকারে পায় মুষ্টিমেয় বিত্তশালীরাই। এ থেকে উপার্জিত বিপুল মুনাফা তাদের হাতেই রয়ে যায়। ফলে সঞ্চয়কারী হাজার হাজার লোক তাদের অর্থের প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত হয়। বিত্তশালী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা যে সুদ পরিশোধ করে তা জনগণের কাছ থেকে দ্রব্যমূল্যের সাথেই তুলে নেয়। ফলে তাদের গায়ে আঁচড় লাগে না, কিন্তু অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় সাধারণ জনগণের। পরিণামে ধনীরা আরও ধনী হয়, গরীবরা হয় আরও গরীব। সমাজ হিতৈষীরা তাই যতই 'গরীবি হঠাও' বলে চিৎকার করুক সমাজের মধ্যেই এই দৃঢ়মূল সুকৌশল ও সর্বব্যাপী শোষণ প্রক্রিয়া বহাল থাকা অবস্থায় দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন প্রেসক্রিপশনই কার্যকর হবে না।

৩। সুদ মানুষকে স্বার্থপর ও কৃপণ করে। অর্থলিপ্সা, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা সুদখোরদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনাশ্রমে উপার্জনের আকাংখা ও অর্থলিপ্সা হতেই সুদ প্রথার জন্ম। সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয়প্রাপ্তির লোভ সুদখোরদের বিচার-বিবেচনা, আবেগ-অনুভূতি এমনকি বিবেককে পর্যন্ত নিঃসাড় করে দেয়। সুদখোরদের মধ্যে লোভ ও কৃপণতা ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রসার লাভ করে, তাদের আচার-আচরণের এতখানি পরিবর্তন ঘটে যে তারা হয়ে ওঠে সমাজের ঘৃণিত জীব। তাদের প্রবাদতুল্য কৃপণতা গল্প-কাহিনীরও খোরাক হয়ে ওঠে। ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদী সম্রাট সেক্সপীয়রের অমর সৃষ্টি শাইলকের (The Merchant of Venice) নাম কে না জানে? ইটালীয় সাহিত্যের মহাকবি দান্তে সুদখোরদের ঠাঁই দিয়েছেন নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে (Divina Comedia)। মধ্য যুগে ইউরোপে চার্চ সুদখোরদের আচরণ ও সীমাহীন লোভের জন্যে তাদেরকে দেহপসারিণীদের সাথে তুলনা করেছিল।

৪। সুদ শ্রমবিমুখতা ও অলসতা সৃষ্টি করে। সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে কোন পরিশ্রম ও ঝুঁকি ছাড়াই সুদের মাধ্যমে নির্ধারিত হারে অর্থ পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থা যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান ও কর্মঠ লোককেও অকর্মণ্য ও অলস বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা স্থাপন অর্থাৎ উৎপাদনধর্মী কাজে যে চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার সুদভিত্তিক সঞ্চয়কারীরা তা আর করে না। বরং ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হতে বিনাশ্রমে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হারে আয় পেয়ে তারা পরিতৃপ্ত থাকে। ধীরে ধীরে আলস্য তাদের গ্রাস করে। এভাবে সুদের কারণেই যাদের হাতে অঢেল বিত্ত রয়েছে তাদের শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ফসল হতে সমাজ বঞ্চিত হয়। সৃষ্ট হয় শ্রমবিমুখতা ও অলসতা। এ দেশের সাহিত্য হতেই এর ভুরি ভুরি নজীর মিলবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সুদী ব্যবস্থায় কেউ ব্যাংকে দশ লাখ টাকা জমা রেখে কোন রকম ঝুঁকি বা দুঃশ্চিন্তা ছাড়াই ঘরে বসে প্রতি মাসে এগারো হাজার টাকা পেতে পারে।

৫। সুদভিত্তিক বিনিয়োগের ফলেই সামাজিক শোষণ সার্বিক ও সামষ্টিক, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক হওয়ার সুযোগ হয়েছে। সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কারণে ছোট ছোট সঞ্চয় সমাবেশ ও সঞ্চালনের সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই পুঁজি চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। একই সাথে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের বাছ-বিচারের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্য। অর্থাৎ, শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস না পেয়ে আরও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। উপরন্তু বাংলাদেশের সুদী ব্যাংকগুলো তাদের প্রদত্ত সুদকে ক্ষেত্রবিশেষে মুনাফার লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টাও করছে। ফলে প্রতারিত হচ্ছে সরল প্রাণ ধর্মভীরু মানুষ।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে শোষণ যে কত সার্বিক ও কৌশলপূর্ণ একটা উদাহরণের সাহায্যে তা তুলে ধরা হলো। ব্যাংকে আমানতকারীরা যে অর্থ সঞ্চিত রাখে তার পুরোটা ব্যাংক কখনই গচ্ছিত রাখে না। সাধারণতঃ ঐ অর্থের ৯০% ঋণ দিয়ে থাকে ব্যবসায়ী-বিনিয়োগকারী-উদ্যোক্তাদের। তারা এই অর্থের জন্যে ব্যাংককে যে সুদ দেয় তা আদায় করে নেয় জনগণের নিকট হতেই তাদের প্রদত্ত সেবা ও পণ্যসামগ্রীর মূল্যের সঙ্গেই। এদের মধ্যে ঐ সব আমানতকারীরাও রয়েছে যারা ব্যাংকে অর্থ রেখেছে সুদের মাধ্যমে নিশ্চিত নিরাপদ আয়ের উদ্দেশ্যে। আদায়কৃত সুদ হতে ব্যাংক একটা অংশ নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্যে রেখে বাকি অংশ আমানতকারীদের হিসাবে জমা করে দেয় তাদের প্রাপ্য সুদ বাবদ। এভাবেই ব্যাংক মাছের তেলে মাছ ভেজে নেয়। অন্যদিকে প্রতারিত হয় আমনতকারীরা। কিন্তু তারা কি কখনও তা তলিয়ে দেখার অবকাশ পায়? বরং বছর শেষে পাশ বই বা কম্পিউটারাইজড একাউন্ট শীটে যখন জমার বিপরীতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দেখে তখন তারা দৃশ্যতঃ পুলকিত বোধ করে।

উদাহরণ-১

সুদ বাবদ আমানতকারী (= ভোক্তা) ব্যবসায়ী / উৎপাদনকারীকে মূল্যের আকারে প্রদান করে.	১৬%
- সুদ বাবদ আমানতকারী ব্যাংক হতে পায়	৮%
= ব্যাংকে জমার বিপরীতে আমানতকারীর নীট লোকসান দাঁড়ায়	৮%

বিদ্যমান সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতি ও আইন এবং সমষ্টি অর্থনীতির (Macroeconomics) কর্মকৌশলের প্রেক্ষিতে কোনভাবেই এই অদৃশ্য অথচ প্রকৃতই লোকসান তথা শোষণ প্রতিরোধের উপায় নেই। এর প্রতিবিধান রয়েছে একমাত্র ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যাংকিং পদ্ধতির কর্মকৌশলের মধ্যে।

৬। সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকেরা ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়। সরকারের কৃষি ব্যাংক থেকেও নেয়, নেয় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকেও। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়েই অনিশ্চিত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হয়। তখন হয় তাকে আবার নতুন ঋণের সন্ধানে বের হতে হয় অথবা জমি-জিরাত বেচে কিংবা বন্ধক রেখে সুদ-আসলসহ শুধতে হয়। তা না হলে কি মহাজন, কি ব্যাংক সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে তার সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে।

ধরা যাক, কৃষি ব্যাংক হতে আলু চাষের জন্যে কোন কৃষক ১৬% সুদে ২০০০/-টাকা ঋণ নিলো। তাকে অবশ্যই এজন্যে বছর শেষে বাড়তি ৩২০টাকা পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ, ঐ কৃষকের জমিতে আরও বেশী আলু উৎপন্ন হতে হবে। গড়ে আশি টাকা মণ হলে বাড়তি চার মণ আলু উৎপাদন হওয়া চাই। মজা হলো, আলুর ফলন বেশী হলে তা সবারই ক্ষেতে হবে। ফলে দাম পড়ে যাবে। আলুর দাম যদি মণপ্রতি টা: ৮০/- হতে টা: ৭০/-তে নেমে আসে তাহলে চাষীর মণপ্রতি টা: ১০/- অর্থাৎ মোট টা: ৪০/- ঘাটতি থেকে যাবে। ঋণের পরিমাণ যত বেশী হবে ঘাটতির পরিমাণও তত বেশী হবে। বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র কী? ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকদের ২৭% ভূমিহীন ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৭ বছরের মধ্যে এই চিত্র পাল্টে গেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারী হতে দেখা যায়, বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা মোট কৃষিনির্ভর পরিবারের ৬৮.৮% এ দাঁড়িয়েছে (সূত্র: *স্ট্যাটিস্টিকাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ* ১৯৯৬, পৃ. ১৭৯)।

প্রসংগতঃ মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতেই এদেশে কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকদের অব্যাহতভাবে ঋণ দেওয়া শুরু করে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে তাঁর নির্দেশে দেওয়া একশ কোটি টাকার আই.আই.সি.পি. ঋণের প্রায় সবটাই আজও অনাদায়ী রয়ে গেছে। এরপরও বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নির্বাচনী ওয়াদা মুতাবিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের আমলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা প্রদান রহিত করা হয়। এরপরেও কেন দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে? এর অন্যতম কারণ সুদভিত্তিক ঋণ প্রদান বা গ্রহণ। শুধু এদেশেই নয়, যে সমস্ত দেশে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক কৌশলগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি অথবা মূল্য সহায়তা (price support) বা উৎপাদন ভর্তুকী (input subsidy) আকারে বিশেষ সরকারী সহায়তা দেওয়া হয়নি সেসব দেশে সুদনির্ভর লেনদেনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে যাচ্ছে।

৭। সুদের পরোক্ষ ফল হিসেবে একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্যে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে পারে ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় অসম সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরো বড় হয়। ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, পুঁজিপতি ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সুদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্যে আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজারে একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে সামাজিক বৈষম্য আরো প্রকট হয়।

৮। সুদের ফলেই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে পুঁজি সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ পায়। তাদের হাতেই পুঁজি আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা সুদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণী বিনাশ্রমে এর সাহায্যে উপার্জন করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে, অবৈধভাবে বা অন্য কোন উপায়ে কেউ প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে সুদের বদৌলতেই সে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে পারে। এজন্যে এদের মধ্যে অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা ও দুষ্কর্মের প্রসার ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই তখন সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়।

৯। সুদের জন্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশীবার সুদ যুক্ত হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের প্রয়োজনে আমদানীকারকরা ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় বিদেশ থেকে তূলা আমদানীর জন্যে তার সুদ যুক্ত হয় ঐ তূলার বিক্রি মূল্যের উপর। এরপর সূতা তৈরীর কারখানা ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যুক্ত হয় ঐ তূলা থেকে তৈরী সূতার উপর। পুনরায় ঐ সূতা হতে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল সংস্থা বা কোম্পানী যে ঋণ নেয় সেই সুদ যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের এজেন্ট বা ডীলার তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক হতে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যোগ করে দেয় ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের উপর। এভাবে চারটি স্তর বা পর্যায়ে সুদের অর্থ যুক্ত হয়ে বাজারে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশী দাম দিয়ে থাকে।

একটা নমুনা হিসাবের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হলো। ধরা যাক, বিদেশ হতে তূলা আমদানীর জন্যে কোন ব্যবসায়ী ব্যাংক হতে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিলো। এরপর বিভিন্ন পর্যায় পার হয়ে তা থেকে তৈরী কাপড় বাজারে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত সুদজনিত মূল্যবৃদ্ধির চিত্রটি কেমন দাঁড়াবে? দুটো অনুমিতি (Assumption) এখানে ধরা হয়েছে: (ক) উৎপাদন, বিপণন, গুদামজাতকরণ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাংক হতে ঋণ নেওয়া হয়েছে, এবং (খ) সুদের হার সকল ক্ষেত্রেই ১৬%। এই উদাহরণে বিভিন্ন পর্যায়ের অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় (যেমন-জাহাজ ভাড়া, কুলি খরচ, বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যয়, গুদাম ভাড়া, পরিবহন ব্যয়, শ্রমিকের বেতন/মজুরী, সরকারী কর/শুল্ক ইত্যাদি) ধরা হয়নি।

<u>উদাহরণ-২</u>

ক) আমদানীকারীর বিদেশী তূলার ক্রয়মূল্য টা: ১,০০,০০০/০০ হলে তূলার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টা: ১,১৬,০০০/০০;

খ) সুতা তৈরীর মিলের তূলার ক্রয়মূল্য টা: ১,১৬,০০০/০০ হলে সুতার বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টা: ১,৩৪,৫৬০/০০;

গ) কাপড় তৈরীর মিলের সুতার ক্রয়মূল্য টা: ১,৩৪,৫৬০/০০ হলে কাপড়ের বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টা: ১,৫৬,০৮৯/০০;

ঘ) মিল হতে এজেন্ট/ডিলারের কাপড়ের ক্রয়মূল্য টা: ১,৫৬,০৮৯/০০ বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টা: ১,৮১,০৬৪/০০;

ঙ) এজেন্টের কাছ থেকে পাইকারী বিক্রেতার কাপড়ের ক্রয়মূল্য টা: ১,৮১,০৬৪/০০ হলে বিক্রয়মূল্য দাঁড়ায় টা: ২,১০,০৩৪/০০।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যে তূলার মূল ক্রয়মূল্য ছিল টা: ১,০০,০০০/০০ সেই তূলা হতে তৈরী কাপড় ভোক্তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে সুদ বাবদেই মূল্যের সাথে

অতিরিক্ত টা: ১,১০,০৩৪/০০ যুক্ত হয়েছে যা ভোক্তাকেই দিতে হবে। কারণ চূড়ান্ত বিচারে শেষ অবধি প্রকৃত ভোক্তাই মোট সুদের ভার বহন করে। এর অন্তর্নিহিত অর্থই হচ্ছে সুদ দিতে না হলে অর্থাৎ সুদ উচ্ছেদ হলে এই অতিরিক্ত বিপুল অর্থ (টাকাপিছু ১.১০ টাকা) ভোক্তাকে দিতে হতো না।

এভাবে সমাজে দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। নিরুপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সুদ না থাকলে অর্থাৎ, সুদবিহীন অর্থনীতি চালু থাকলে এই যুলুম হতে জনসাধারণ রেহাই পেত। এতে শুধু তাদের জীবন যাত্রার ব্যয়ই কম হতো না, জীবন যাপনের মান হতো আরো উন্নত।

১০। সুদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক। কারণ সুদের হার উচ্চ থাকলে বিনিয়োগ থাকে ন্যূনতম কোঠায়। তখন শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষে মুনাফা অর্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে সময়ে মজুরী বৃদ্ধি মানেই লোকসানের ঝুঁকি নেওয়া। সুদের হার কম থাকলে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বেশী হতে পারে কিন্তু পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় না। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে শ্রমিকের চাহিদাও কম থাকে। অন্যদিকে, চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান অনেক বেশী থাকার ফলে তাদের দিক থেকে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন আদৌ সহজ হয় না। উপরন্তু কম মজুরীতেই চাহিদার চেয়ে শ্রম সরবরাহ বেশী হওয়ায় উদ্যোক্তারা মজুরী বৃদ্ধির দাবী মেনে নিতে চায় না। ফলে অনিবার্যভাবেই সংঘাত দেখা দেয়। কর্মবিরতি ঘেরাও, ধীরে চলো ধর্মঘট হরতাল অবস্থান ধর্মঘট এরই বাস্তব রূপ। পরিণামে মালিক পক্ষ ছাঁটাই, লক আউট ইত্যাদি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে সুদের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে বিক্রীও হ্রাস পায়। এই অবস্থায় মজুরী বৃদ্ধি পেলে মুনাফার হার হ্রাস পেয়ে সুদের হারের চেয়েও নীচে নেমে যেতে পারে। তাই মজুরী বৃদ্ধির কোন দাবীই শিল্প মালিকদের পক্ষে বিবেচনায় আনা সম্ভব হয় না।

এই কারণেই জাপানে মেইজী শাসন আমলে মজুরী বৃদ্ধির জন্যে শ্রমিকদের জোর দাবী থাকলেও যাইবাৎসু গোষ্ঠী তা মেনে নেয়নি, সরকারও এ ব্যাপারে শ্রমিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। বৃটেনেও কৃষকদের স্বার্থে প্রণীত ১৮১৫ সালের শস্য আইন (Corn Law) ত্রিশ বছর পরেই বাতিল করা হয় শিল্পপতিদের স্বার্থে। শস্য আইন বহাল থাকলে গমের দাম বৃদ্ধি পেতো। এতে কৃষকেরা লাভবান হতো। কিন্তু শিল্প শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হয়ে পড়তো যার ফলে শিল্পপতিদের মুনাফা হ্রাস পেতো।

১১। সুদ দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে। সুদনির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পুঁজি আটকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এমন ধরনের বিনিয়োগে আদৌ উৎসাহ দেখায় না। এ জন্যেই দেশে ব্যয়বহুল বড়

শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে পারে না। এসব শিল্প-কারখানা স্থাপনে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তা সুদের ভিত্তিতে যোগান দিলে প্রতি বছর বিপুল অংকের অর্থ সুদ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। বড় বড় কারখানা সাধারণত: প্রতিষ্ঠিত হয়ে চালু হতে দুই হতে তিন বছরের gestation period প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময়ে সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এমন অংক দাঁড়াবে যে সে বোঝা বহন করা লাভজনক শিল্পের পক্ষেও সম্ভব নয়। আর লোকসান হলে সুদে-আসলে ঋণের যে অংক দাঁড়ায় তা পরিশোধ করা কখনো সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোক্তা তখন দেউলিয়া হতে বাধ্য হয়।

১২। সুদ সঞ্চয়কে অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। সুদী অর্থনীতির ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকাররা ঝুঁকিমুক্ত, নিশ্চিত ও নির্ধারিত আয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণের গচ্ছিত আমানতের বিরাট এক অংশ ট্রেজারী বিল ক্রয়, বিনিময় বিল ভাঙানো, সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্র ক্রয় ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব দেখা দেয়। পরিণামে সুদের হার বৃদ্ধি পায় এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা আরো হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। কর্মসংস্থানের সংকোচন ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে। অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় সংকটের। এই অবস্থায় সরকারকেই এগিয়ে আসতে হয় সংকট মোচনের জন্যে।

১৩। সুদ বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ায়। উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রায়শঃ শিল্প ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্যে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ঐ সব ঋণ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায়ই দেখা যায় ঐসব ঋণ না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যায়, না উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে কাংখিত উন্নতি অর্জন করা যায়। ফলে ঋণ পরিশোধ তো দূরের কথা, অনেক সময় শুধু সুদ শোধ দেওয়াই দায় হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্যে এসব দেশ আবার নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে। এই নতুন ঋণ সুদে-আসলে পূর্বের ঋণকে ছাড়িয়ে যায়।

অনুরূপভাবে দেশে কোন বিপর্যয় বা সংকট দেখা দিলে অথবা খাদ্য শস্যের মতো অপরিহার্য পণ্যের ঘাটতি ঘটলে তা পূরণের জন্যে সরকারকে বন্ধু দেশ বা ঋণদানকারী কনসর্টিয়াম থেকে ঋণ নিতে হয়। ভোগের জন্যে গৃহীত এই ঋণের বিপরীতে যেহেতু কোন উৎপাদন বা কর্মসংস্থান হয় না, সেহেতু এই ঋণের আসল পরিশোধ তো দূরের কথা সুদই পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। সুদ-আসলে সমুদয় ঋণই বোঝা হয়ে চাপে জনগণের কাঁধে। এক্ষেত্রে হয় বাড়তি কর আরোপ করে এই অর্থ জনগণের কাছ থেকেই আদায় করতে হয়, নয়ত আবারও ঋণ নিতে হয়।

১৪। সুদের বিদ্যমানতার ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, সুদের কারণেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় অবশ্যম্ভাবীভাবে

ও অপ্রতিহত গতিতে। উপরন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণও সুদ। এই দুইয়ের যোগফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে। নির্দিষ্ট আয়ের শ্রমজীবী, সাধারণ কৃষিজীবী, নানা ধরনের পেশাজীবী ও বেতনভুক কর্মচারীরা এই সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল। এদের আয়ের স্তর ও পরিমাণ যেহেতু মোটামুটি একটা দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম থাকে সেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে একদিকে যেমন জীবন যাপনের মানের অবনতি ঘটে অন্যদিকে বাজারে কার্যকর চাহিদার সংকোচন ঘটে। এরই চূড়ান্ত পরিণাম হিসাবে কলকারখানায় মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাও রুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে এক্ষেত্রে পুনরায় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় শিল্প-উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা তখন কমে যায় আরও এক ধাপ।

১৫। সুদভিত্তিক ঋণে তৈরী প্রতিষ্ঠান কোন ক্ষতির সম্মুখীন হলে উদ্যোক্তা সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে। উদ্যোক্তা যতক্ষণ ব্যাংকের সুদ পরিশোধ করে ততক্ষণ ব্যাংক তার ঋণ মঞ্জুরী অব্যাহত রাখে। এমন কি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিও করে। কিন্তু যখনই কারবারে লোকসান দেখা দেয় তখন ব্যাংক নতুন অর্থ লগ্নি করা দূরে থাক পূর্বের ঋণ ফেরত দেবার জন্যেই চাপ দেয়। এই অবস্থায় উদ্যোক্তা মাথায় হাত দেয়। কারণ তার নিজের পুঁজি ছিল সামান্যই, পুরো ব্যাপারটাই ছিল পরের ধনে পোদ্দারী। ফলে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিণামে গোটা কারবারটি বন্ধ বা ধ্বংস হয়ে যায়।

১৬। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের কারণে ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্বের বোঝা চাপে সমগ্র জাতির ঘাড়ে। বাংলাদেশ এর উজ্জ্বলতম উদাহরণ। ধনী ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে ব্যাংক হতে তাদের দেওয়া Collateral বা জামানতের বিপরীতে দশগুণ বা তারও বেশী পরিমাণ ঋণ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ, নিজেদের দশ লক্ষ টাকা থাকলে তারা এক কোটি টাকা ঋণ পায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাব বা সম্পৃক্ততাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোটি টাকারও বেশী এই অর্থের ব্যবসা বা শিল্পে যে মুনাফা হয় তার সবটুকুই ভোগ করে ঐ ঋণগ্রহণকারী উদ্যোক্তা। ব্যাংকে অর্থ আমানতকারীরা সুদ পেলেও মুনাফার কোন অংশই তারা পায় না। অথচ লোকসানের কারণে ঐ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে তার দায়ভার চাপে গোটা জাতির উপর। জনগণের সঞ্চয় তখন আর ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার দৃশ্যমান লোকসান ঐ দশ লাখ টাকা হলেও (যদিও পূর্বের মুনাফা সে পুরোটা একাই ভোগ করেছে) জনসাধারণের লোকসান পুরো কোটি টাকাই। কষ্ট করে এই টাকা যারা সঞ্চয় করে ব্যাংকে আমানত রেখেছিল তাদেরই এখন ফতুর হবার পালা।

বাংলাদেশের ঋণ খেলাপী শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রী করে দিলেও ব্যাংক হতে তাদের গৃহীত ঋণ শোধ হবার নয়। কারণ এর পিছনে অদৃশ্য হাতের কারসাজি কাজ করেছিল। রাজনৈতিক মদদে ঋণ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে

অথবা ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্যরই নামে-বেনামে ঋণ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশের কোন তোয়াক্কা না করেই। অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকল্প সমীক্ষাও করা হয় না। শুধুমাত্র সুদের হিসাব কষেই কল্পিত মুনাফার লোভনীয় টোপ দিয়ে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা যা আর কোন দিনই ব্যাংকে ফিরে আসবে না। রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকগুলো সরকারী তহবিলের মদদ পেলেও বেসরকারী ব্যাংকগুলো এই দায় উদ্ধারের জন্যে কার মদদ পাবে?

১৭। সুদ অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতার অন্যতম মূখ্য কারণ। একথা সর্বজনবিদিত যে পুঁজি বাজারে মূলধনের চাহিদা হ্রাস পেলে সুদের হার হ্রাস পায়, আবার মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হারও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের সুদের হারের ওঠানামার কালীন সারির তথ্য (Time series data) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কোন দেশে সুদের হার দীর্ঘকাল স্থিতিশীল থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন কারণে তেজীভাব শুরু হলে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পুঁজির যোগানদার তখন সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে পুঁজির চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তা পূর্বের চেয়েও হ্রাস পায়। এর মুকাবিলায় সুদের হার আবারও হ্রাস করা হয়। পুনরায় মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুদের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এভাবে সুদের হারের ঘন ঘন ওঠা-নামার কারণে বিনিয়োগকারীরা নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চয়তার মধ্যে। এরই ফলে বিনিয়োগ, শেয়ার, পণ্য ও মুদ্রা বাজারে দারুণ অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শিকার হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রীডম্যান বলেছেন সুদের হারের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত ওঠানামার ফলে যেকোন দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে।

১৮। সুদের কারণে অর্থনীতির কল্যাণকর খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পেতে বাধ্য। পরিণামে সামাজিকভাবে কাম্য সেবা ও দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহে সংকোচন ঘটে অনিবার্যভাবেই। সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, তা উৎপাদনমুখীই হোক আর সেবামূলকই হোক, একই হারে মুনাফা হয় না। কোন ক্ষেত্রে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশী, কোথাও সমান, আবার কোথাও বা কম। সাধারণভাবে বিলাস সামগ্রী ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর খাতে উৎপাদন ও ব্যবসায়ে মুনাফার হার হয়ে থাকে সর্বোচ্চ। প্রসাধন ও বিলাস সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্য, মদ ও নেশার বস্তু ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে সমাজের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় ও কল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার ক্ষেত্রে মুনাফার হার প্রায়শঃই খুব কম থাকে। এমন কি তা প্রদেয় সুদের হারের চেয়েও কম হতে পারে। ফলে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যেখানে মুনাফার হার সুদের হারের চেয়ে বেশী সেখানেই বিনিয়োগ হয় সর্বাধিক। অপর দিকে যেসব অত্যাবশ্যকীয় খাতে মুনাফার হার সুদের হারের সমান বা কম সেখানে কোন বিনিয়োগকারী এগিয়ে আসতে

সঞ্চয়ী হয় না। কারণ সুদ প্রদানের পর তার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এই খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে জরুরী। যদি অর্থনীতিতে সুদ না থাকতো তাহলে বিনিয়োগকারীরা (এবং মূলধনের যোগানদারেরাও) প্রাপ্তব্য মুনাফাতেই (তার হার যত কমই হোক না কেন) পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিধা করতো না। ফলে সমাজের অপরিহার্য ও কল্যাণকর খাতের সম্প্রসারণ ও কর্মদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হতো।

১৯। সুদের কারণেই অর্থনীতিতে ব্যবসায় চক্রের (Business Cycle) সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে। যার ফলে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। যেকোন অর্থনীতির জন্যে এ অবস্থা অনাকাংখিত। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সুদের হার যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণ গ্রহীতারা হিসেব করে যদি দেখে যে অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা খুব কম তখন তারা ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয়, ব্যবসায়ে সৃষ্টি হয় মন্দা। এভাবে পুঁজির চাহিদা খুব কমে যাওয়ায় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন করে ঋণ নিয়ে তখন উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দেয়। ক্রমে মন্দা কেটে গিয়ে পুনরায় তেজীভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে বারবার মন্দা ও তেজীর সৃষ্টি অর্থনীতির জন্যে যে অত্যন্ত অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতির জন্ম দেয় সে বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তরাও একমত।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুদ আসলেই অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য নয়, সঞ্চয়ের জন্যে তো নয়ই। বরং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সুদনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্স তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *The General Theory of Employment, Interest and Money*-তে প্রমাণ করেছেন সঞ্চয়ে সুদের কোন ভূমিকা নেই। সুদ বিদ্যমান না থাকলেও লোকে ব্যক্তিগত কারণেই অর্থ সঞ্চয় করবে। দুর্দিনের খরচ ও আকস্মিক বড় ধরনের ব্যয় মেটাবার প্রয়োজনেই তারা সঞ্চয় করে।

২০। সুদ ধনবন্টনের অসমতার কারণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। কীনস দেখিয়েছেন সুদের জন্যেই বরং বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। যেকোন দেশের অর্থনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুদের উচ্চ হারের সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াস সংকুচিত হয়েছে। অপরদিকে সুদের হার যখন ন্যূনতম তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসও বেড়ে গেছে। এসব হতে বুঝতে বাকি থাকে না যে সুদ অর্থনৈতিক সাম্যেরই বিরোধী নয়, অগ্রগতিরও বিরোধী।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির জন্যে সুদ কি ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। সুদের যে সব অকল্যাণকর দিক সম্বন্ধে বলা হলো সেসব ছাড়াও সুদের নৈতিক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এখানে সেসব আলোচনার সুযোগ নেই। সুদনির্ভর অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে কতদূর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হতে পারে তা তুলে ধরাই ছিল এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য।

অর্থনীতি সুদবিহীন হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বন্টন ঘটবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবণতা দূর হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও বড় ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যেই ইসলাম সুদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হলে তার উৎসকেই সমূলে বিনাশ করতে হয়। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা।

সুদ উচ্ছেদের উপায়

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যেখানে দীর্ঘদিন ধরে সুদভিত্তিক অর্থনীতি চালু রয়েছে সেদেশে কিভাবে সুদ উচ্ছেদ করা সম্ভব? সুদের অভিশাপ মুক্ত হয়ে কিভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিচারের ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে? এজন্যে নীচে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়। আমাদের বিশ্বাস যদি প্রচেষ্টায় আমরা আন্তরিক ও যত্নবান হই তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম রহমতের ছায়াতলে আমাদের ঠাঁই দেবেন।

ক. ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপন

এ কথা আজ অবিসংবাদী সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত যে বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি শুধু সফলই প্রমাণিত হয়েছে তাই নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর চাইতে অধিকতর যোগ্যতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যে আজ অমুসলিম দেশে, এমনকি অমুসলিম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর বড় উদাহরণ লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুই দশকেরও বেশী আগে এবং সাফল্যের সাথে ব্যাংকটি কাজ করে যাচ্ছে। আরও দুটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এদেশের জনগণের মন-মানসিকতা প্রবলভাবে ইসলামমুখী অথচ বিদ্যমান আইন কাঠামো, সমাজব্যবস্থা এমনকি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই মন-মানসিকতা ইসলামবিরোধী। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও রোমান-বৃটিশ আইন দ্বারা আজও

এদেশের ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, বাংলাদেশে আরও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং সেসবের সেবা গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

খ. করযে হাসানা ও মুদারিবাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে করযে হাসানা ও মুদারিবাত পদ্ধতি। ইসলামী সমাজের এই অপরিহার্য বিধানটি এদেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি সংখ্যালঘু মুসলমানের দেশ শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানা প্রদান ও সোসাইটিভিত্তিক মুদারিবাত ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ দেশেও এই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তশালী লোকদের করযে হাসানা দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্যোগ যদি মসজিদকেন্দ্রিক হয় তাহলে সত্যিকার যোগ্য লোককে যেমন সুযোগ দেওয়া যাবে তেমনি এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

মুদারাবা পদ্ধতি এদেশে চালু করতে সময়ের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে আইন কাঠামো বদলানোর পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের লোক সৃষ্টির। উত্তম ও যোগ্য লোকেরা মুদারাবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি উভয়বিধ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু সমাজের বিত্তশালী লোকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্যে প্রয়োজন তাদের ইসলামী অনুশাসন জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। করযে হাসানা দিলে সেই অর্থের জন্যে আয়কর দিতে হবে না এবং মুদারাবার ক্ষেত্রে সাহিব আল-মালকে মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধের জন্যে আয়কর দিতে হবে এমন আইন করে বিত্তশালী মুসলিমদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব।

গ. পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা

বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের তথা মুসলমান জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আকীদার কোন সম্পর্ক নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোন পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানার ও অনুশীলনের কোনও সুযোগ নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সকল শিক্ষাক্রমে ইসলামী অর্থনীতি পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশে তো বটেই, অমুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও ইসলামী অর্থনীতির পাঠ দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ এদের সবার পেছনে। দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের পাঠ্যক্রমে বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন পত্রে 'ইসলাম' শব্দ জুড়ে দিয়ে দায় সারা হচ্ছে। অথচ প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচীর সংস্কার। যারা আগামী দিনে এদেশের প্রশাসন বিচার আইন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে তাদের যদি এখনই সুদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায় তাহলে জাতি যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই রয়ে যাবে।

ঘ. গণসচেতনতা সৃষ্টি

ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল ইসলামী অর্থনীতি অর্জনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হতে পারে। জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। ইসলামী অর্থনীতি চালু বা বাস্তবায়ন করা হবে প্রচলিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্যে সবার আগে চাই গণসচেতনতা। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর। সেজন্যে কাজটা একটু কঠিন ও আয়াসসাধ্য বটে তবে অসম্ভব নয়। কারণ এদেশের জনগণ ধর্মভীরু এবং সরল প্রকৃতির। তাদের যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবী কি এবং তা অর্জনের উপায় কি এটা বোঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে এদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। এজন্যে দুটো উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ মসজিদে খুতবার সাহায্য গ্রহণ। বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুম'আর নামাযে শামিল হন। এই নামাযের খুতবায় নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি খতিব বা ইমাম সাহেব সুদী অর্থনীতির কুফল এবং দেশ ও জাতির জন্যে তা কতখানি ক্ষতিকর বুঝিয়ে বলেন তাহলে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়তঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর মাহফিল ও ইসলামী জলসায় ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসীরে কুরআনগণ বক্তৃতা করে থাকেন। ঐসব অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির উপযোগিতা এবং সুদী অর্থনীতির কুফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহলে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার ধাক্কাতেই সুদী অর্থনীতি উৎখাত হতে পারে, বাস্তবায়িত হতে পারে ইসলামী অর্থনীতি। এর জন্যে চাই দীর্ঘ মেয়াদী সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা।

ঙ. গণপ্রতিরোধ গঠন

উপরে বর্ণিত উপায়গুলো ছাড়াও সুদ নির্মূল করার আরও কয়েকটি ছোট-খাট উপায় রয়েছে। এগুলো সবই অবশ্য জনগণনির্ভর। জনগণ গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে

পারে সুদের বিরুদ্ধে, সুদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সুদের নাগপাশ [illegible]। এসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা গেল।

১. সুদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। সমাজে যারা সুদখোর বলে পরিচিত, তাদের পরিচিতি যাই হোক না কেন ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে সুদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সংগ বর্জন করছেন বা তাদের এড়িয়ে চলছেন। কাজটা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

২. সুদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোন কাজে সুদখোরদের নির্বাচিত হতে দেওয়া হবে না। তারা ভোটপ্রার্থী হলে যেন ভোট না দেওয়া হয় সেজন্যে জোর প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে এই সব লোকের কার্যক্রমের জন্যেই সমাজে শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকবে।

৩. সুদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা। যারা সুদের ব্যবসা করে, গ্রামে মহাজনী কারবারের (গ্রামাঞ্চলে সুদী ব্যবসার প্রচলিত নাম) সাথে যারা যুক্ত তাদের ছেলে-মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়ানোও উত্তম প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে। বাংলাদেশেই আজ হতে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সুদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইতো না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দ্বীনি শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

৪. সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার উপর সুদ দিতে হয়। সুদের বদলে সরকার জরিমানা আরোপ করতে পারে। ঈমান ও আকীদাবিরোধী সুদ কেন দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেন খাজনার খাত থেকে সুদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা চালু করে সেই লক্ষ্যে জনমত গঠন করা উচিৎ।

আশা করা যায়, এসব উপায় অনুসরণের মধ্যে দিয়ে এদেশে সুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে, আল্লাহ ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস সূচিত হবে। পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে আপামর জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ সাধ্যমতো দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। বস্তুতঃ আমাদের দায়িত্বই হচ্ছে চেষ্টা করা এবং তার মধ্যে দিয়ে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই প্রয়াসে তিনি আমাদের সহায় হোন এই হোক আমাদের ফরিয়াদ।

ইসলামী ব্যাংকিংএর রূপরেখা

ক. বৈশিষ্ট্য

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বকালের জন্যে, সকল বনি আদমের জন্যে একদিকে যেমন ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্য দিকে সুদ ও সুদভিত্তিক সকল কার্যক্রমকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ আজকের দুনিয়ায় সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব চলছে। সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যবসায়িক কায়-কারবার সর্বত্রই সুদের অপ্রতিহত ও অবারিত গতি। সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যুলুমের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সুদের মাধ্যমে সমাজকে সবচেয়ে সুকৌশলে ও বেশী শোষণ করছে আজকের সনাতনী ব্যাংক ব্যবস্থা। কি পুঁজিবাদী দেশ, কি সমাজতন্ত্রী দেশ, কি মুসলিমপ্রধান দেশ সর্বত্রই সনাতনী ব্যাংকগুলো সুদী কারবারে লিপ্ত। যারা ব্যাংক হতে নানা প্রয়োজনে ঋণ নেয় তারা তো সুদ দিতে বাধ্য হয়ই, এমন কি যারা শুধু নিরাপত্তা ও সঞ্চয়ের জন্যেই ব্যাংকে টাকা আমানত রাখে তাদেরও মুনাফার লেবাস পরিয়ে ব্যাংক সুদ নিতে প্ররোচিত করে।

সমাজবিধ্বংসী, যুলুমকারী এবং শোষণের সকল মাধ্যম এই সুদের হাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্যেই বর্তমানকালে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেনারেল সেক্রেটারিয়েট ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে- "Islamic bank is a financial insititution whose statues, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations".

অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংক এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা তার বিধি, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার কোন কার্যক্রমেই সুদের কোনও রকম লেনদেন করে না।

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু ইসলামে অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারস্পরিক লেন-দেন প্রভৃতি সব কিছুরই সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। অথচ সুদ প্রথা চালু থাকার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান মেনে এসব কাজে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব। ইসলামী ব্যাংক এই সমস্যা পূরণের জন্যেই এগিয়ে এসেছে। এর কাজের পদ্ধতি অন্যান্য সব ধরনের ব্যাংক হতে ভিন্ন। কোন কোন দিক হতে ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক হতে পৃথক এবং কিভাবে এই ব্যাংক তার

কার্যপদ্ধতি পরিচালনা করে থাকে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এই পার্থক্যগুলোই ইসলামী ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে পাঁচটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যথাঃ-(১) সুদ বর্জন, (২) শরীয়াহ্‌সম্মত উপায়ে শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ, (৩) শরীয়াহ্ সুপারভাইজারী বোর্ড, (৪) যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, এবং (৫) সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণ।

১. **সুদ বর্জন :** ইসলামী ব্যাংকের প্রথম ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোন প্রকার লেন-দেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না। যে সুদ হারাম, ঘৃণ্য ও সমাজবিনাশী সেই সুদের অনুপ্রবেশ যেন ইসলামী সমাজে ঘটতে না পারে সেজন্যে এই ব্যাংক নিজেই শুধু সুদী কারবার হতে বিরত থাকবে না, অন্যকেও বিরত থাকতে সহায়তা করবে। সুদ নেবে না, দেবে না, খাবে না এবং খাওয়াবে না। সুতরাং, সুদের হিসাব রাখা বা সাক্ষী থাকারও প্রয়োজন হবে না। সহীহ হাদীস অনুসারে সুদের হিসাব লেখা ও সুদের সাক্ষী থাকাও কবীরা গুণাহ। তাই সুদের পাপ হতে মুসলিমদের মুক্ত রাখার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করবে এই ব্যাংক। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা স্থাপন, বৈদেশিক লেন-দেন সব ক্ষেত্রেই এই ব্যাংকের নীতি ও কৌশল হচ্ছে সুদ বর্জন করা এবং ধীরে ধীরে সমাজ হতে এর উচ্ছেদ করা।

২. **শরীয়াহসম্মত শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ :** ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শরীয়াহসম্মত শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ। শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের সময় ঐসব উদ্যোগ শরীয়াহ্‌র বিচারে হালাল না হারাম তাও ইসলামী ব্যাংক বিচার করে থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন ঋণ দেওয়ার সময় আদৌ বিচার করা হয় না যে, যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সেই কাজটি সমাজের জন্যে কল্যাণকর না ক্ষতিকর। সমাজের তাতে মঙ্গল হবে, না সর্বনাশ ডেকে আনবে। সমাজের বিপর্যয় ও সর্বনাশ সৃষ্টিকারী মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, চরিত্রবিধ্বংসী নানা ধরনের উপকরণসহ সিনেমা, নাচ-গান, তামাক ও সিগারেটের মতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, মজুতদারী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি নানা কাজে সুদী ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়ে থাকে। এতে সমাজের সর্বনাশ আরও বেশী করে ডেকে আনা হয়। আগুনে পেট্রোল ঢাললে যেমন আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এও ঠিক তেমনি। সমাজ হতে অনাচার, পাপাচার, অশ্লীলতা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করা দূরে থাক সুদী ব্যাংকগুলো নির্বিচার ঋণ দেওয়ার ফলে এসব বরং আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এর প্রতিরোধ করতে চায়। এ জন্যেই শুধু শরীয়াহসম্মত শিল্প কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে এই ব্যাংক সহযোগিতা করে। ব্যাংক দুভাবে এটি করে থাকে: (ক) লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের চুক্তিতে অংশ গ্রহণ এবং (খ) প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ।

(ক) লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের চুক্তিতে অংশ গ্রহণ: ইসলামী ব্যাংকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি তৈরীতে তার মূলধন বা তহবিল দিয়ে অংশ

গ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সাথে লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের চুক্তিতে পুঁজির অংশবিশেষ বা পুরোটাই সরবরাহ করতে পারে। এসব কাজে লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুসারেই ব্যাংক তা ভাগাভাগি করে নেবে। অর্থাৎ, লাভ হলে ব্যাংক যেমন তার পূর্ব নির্ধারিত অংশ পাবে, তেমনি লোকসান হলে তারও অংশ ব্যাংক বহন করবে।

(খ) প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ: ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল এবং আমানতকারীদের সম্মতিক্রমে তাদের তহবিল হতে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে, নিজস্ব মালিকানাতেই শরীয়াহ অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি গড়ে তুলবে। এ ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন তার দায়-দায়িত্ব ব্যাংকেরই। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো এরকম কোন উদ্যোগ নেয় না।

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার কোথাও এমন পদ্ধতি নেই। প্রচলিত ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয় ঠিকই, কিন্তু ব্যাংক নিজে এসব প্রকল্প বা ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েনা। তাই ঐসব কারবারের লাভ-লোকসান বা সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাংকের কোন মাথা ব্যাথা নেই। বরং লোকসানের কোন রকম সম্ভাবনা দেখলেই সুদনির্ভর ব্যাংকগুলো তাদের দেওয়া ঋণ দ্রুত পরিশোধের জন্যে চাপ দেয় কিংবা ঋণ প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ঐ ব্যবসা বা কারবারটি আরও সংকটের সম্মুখীন হয়, এমন কি ধ্বংসও হয়ে যায়।

৩. শরীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড : ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি প্রধান ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ড। ব্যাংকের লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বা তহবিল বিনিয়োগ, নিজস্ব প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদি কোন কিছুতেই যেন সুদের স্পর্শমাত্র না থাকে, কোন কাজেই যেন শরীয়াহর বরখেলাপ না হয় তা দেখার জন্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক তার প্রতিষ্ঠার শুরুতেই গঠন করে শরীয়াহ বোর্ড। কোন কোন ইসলামী ব্যাংকে এর নাম শরীয়াহ সুপারভাইজরী কাউন্সিল। এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ বা সাত জন হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে সংখ্যাগুরু থাকেন সুবিজ্ঞ আলেম ও ফকিহগণ। বাকীদের মধ্যে থাকেন একজন প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও অন্যজন অভিজ্ঞ ইসলামী আইনবিদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে একজন প্রবীণ ব্যাংকার। এঁরা শুধু যে ব্যাংককে শরীয়াহসম্মতভাবে চলতে পরামর্শই দেন তা নয়, ব্যাংক ভুল পথে চলতে চাইলে ব্যাংকের আর্টিকেলস অব এগ্রিমেন্টেই তাতে বাধা দেবার ক্ষমতাও এই বোর্ডের রয়েছে।

৪. যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন : ইসলামী ব্যাংকের চতুর্থ ও অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকুনের অন্যতম এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে নামাযের পরেই এর স্থান। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্বৃত্ত তহবিল ও অব্যবহৃত অর্থের উপর যাকাত দিয়ে থাকে। ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট থেকেও যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। যাকাত তহবিলের এই টাকা ব্যাংক শরীয়াহসম্মত

খাতেই ব্যয় করা হয়। আজকের সমাজে মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে যাকাত প্রদান করে থাকে। এতে সমাজের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন হয় না। দরিদ্র ও সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই ইসলামী ব্যাংক চেষ্টা করে যাকাত তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানমুখী উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করার পাশাপাশি স্কুল, মক্তব ও হাসপাতাল প্রভৃতির মতো সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে একই সঙ্গে কর্মসংস্থান ও নিয়মিত আয়ের একটা নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বদ্ধপরিকর। সমাজের ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে এটি একটি কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

৫. সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংকের সর্বশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সামাজিক উন্নতি অর্জন করা। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক না থাকলে কারোরই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। তাই ইসলামী ব্যাংক কি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, কি নিজস্ব প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সব সময়ই এই লক্ষ্য সামনে রাখে যে, এসব কাজ সমাজের উন্নতিতে কতটা সহায়ক হবে? ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে জনসাধারণের উন্নতি কতটা হবে?

সমাজের প্রয়োজন ব্যাপক ও বহুমুখী। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যেই সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো সিনেমা হল নির্মাণ বা সিনেমা শিল্পে অর্থলগ্নী করে। ইসলামী ব্যাংক তা আদৌ চাইবে না। কারণ সিনেমার প্রসারের ফলে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় আরও দ্রুত ও ব্যাপক হবে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আদৌ এ বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই। আবার ইসলামী ব্যাংকগুলো সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিত্তহীন লোককে করযে হাসানা বা মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করবে, কিন্তু সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো এই উদ্যোগ নেবেনা। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হলো ব্যক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তার ও তার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে সমাজে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো শুধু স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তৎপর। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে দুস্তর ও দুরতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। বিশেষ করে সমাজকল্যাণ ও সমাজের সুস্থ ও সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্যে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর কোন পরিকল্পনা নেই। এদিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি স্বস্তিকর ও মহৎ ব্যতিক্রম। এটি এই ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে।

এ সব বৈশিষ্ট্য অর্জনের সাথে সাথে নিচের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকগুলোকে তৎপর থাকতে হবে। তাহলে একাধারে ইসলামী বৈশিষ্ট্য অর্জন ও দেশের অর্থনীতিতে কাঙ্খিত অবদান রাখার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ তাদের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক সত্যিকার কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হবে। এসবের মধ্যে রয়েছেঃ

১. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা;
২. বিত্তহীন ও স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৪. ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
৫. মানব কল্যাণের সাথে পরিবেশ উন্নয়ন।

খ. বিনিয়োগ কৌশল

সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের যে বিপুল পার্থক্য তার প্রায় সবটাই কাজের প্রকৃতির ক্ষেত্রে। ব্যাংককে যেমন তহবিল ও আমানত সংগ্রহ করতে হয় তেমনি তা কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনও করতে হয়। আমানত সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার দুটি ভিন্নধর্মী কাজ। প্রথমটির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতির সাথে সুদী ব্যাংকিং পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। পার্থক্য যা তা অধিকাংশই আমানতের শিরোনাম ও ব্যবহারগত। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেই সুদী ব্যাংকের সাথে রয়েছে তার আমূল পার্থক্য।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে চালু ও সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকতে হলে এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চাইলে ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে হবে। এথেকে তার নিজস্ব পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ মেটানো ছাড়াও শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের সন্তোষজনক হারে ডিভিডেণ্ড ও মুনাফা দিতে হবে। এই সমুদয় কাজই করতে হবে শরীয়াহসম্মত উপায়ে। কিন্তু কিভাবে?

প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলো এমন অনেক উপায়ে উপার্জন করে যেগুলো শরীয়াহ্র দৃষ্টিতে বৈধ। কিন্তু যেহেতু সেই আয় পৃথক করে না রেখে অন্যান্য সুদী আয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয় সেহেতু তা শরীয়াহর দৃষ্টিতে আর হালাল বা বৈধ থাকে না। সুদী ব্যাংকের এসব আয়ের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জ বা 'উজরার' (ফি ও কমিশন) বিনিময়ে জনসাধারণের জন্যে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ। উদাহরণস্বরূপ ডিমান্ড ড্রাফট, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি ইস্যু, বিভিন্ন বিলের অর্থপ্রদান, অর্থ সম্পদ হস্তান্তর, লকার সার্ভিস, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে সাহায্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মোট আয়ের ৩০%-এরও বেশী এই ধরনের সেবামূলক কাজ হতে আয় করে থাকে। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকও জনগণকে এই ধরনের সেবা দিয়ে যাবে এবং সঙ্গতভাবেই তার মোট আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রথাগত কিন্তু হালাল উপায়ে উপার্জন করবে।

প্রশ্ন হলো: ইসলামী ব্যাংক কিভাবে তার তহবিল বিনিয়োগ করবে? সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ শরীয়াহ্সম্মত। সুতরাং, ইসলামী ব্যাংক সুদের পরিবর্তে লাভ-লোকসানের

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেই উপার্জনের চেষ্টা করবে। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী ব্যাংকের সকল ধরনের আর্থিক সহযোগিতাই বিনিয়োগমূলক, সুদী ব্যাংকের মতো ঋণমূলক নয়। এভাবে বিনিয়োজিত অর্থ হতে প্রাপ্ত মুনাফা থেকেই ইসলামী ব্যাংক তার পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের মুনাফা দেবে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কুড়িটি পদ্ধতি আর্থিক দিক দিয়ে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যাংকগুলো শুধু যে আত্ম নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বরং উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু মুসলিম দেশসমূহেই নয়, অমুসলিম দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলোও একই পদাংক অনুসরণ করে চলেছে। এই পদ্ধতিগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়াহ্সম্মত। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১. **মুদারাবা:** এই পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন যৌথ উদ্যোগ ব্যবসায় বা কারবারে একাই সমুদয় অর্থ সরবরাহ করে এবং উদ্যোক্তা তার শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা বিনিয়োগ করে থাকে। এখানে ব্যাংককে বলা হয় *সাহিব আল-মাল* এবং তহবিল ব্যবহারকারী বা উদ্যোক্তাকে বলা হয় *মুদারিব*। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক সরাসরি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয় না অথবা মুদারিবের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তা পূর্ব নির্ধারিত হারে (৭৫% ঃ ২৫%; ৭০% ঃ ৩০%; ৬০% ঃ ৪০%; ৫০%ঃ ৫০%; ৪৫% ঃ ৫৫%; ৪০% ঃ ৬০% ইত্যাদি) লাভের অংশ ভাগ করে নেয়। মূলধনের পরিমাণের সাথে লাভের অংশ কোনক্রমেই সম্পর্কযুক্ত নয়। উপরন্তু কোনপক্ষই মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে না। তবে লোকসান হলে তার পুরোটাই ব্যাংক বহন করবে। এক্ষেত্রে মুদারিব বা উদ্যোক্তাকে হারাতে হয় তার শ্রম ও সময়, কোন আর্থিক লোকসান তাকে বহন করতে হয় না। অবশ্য যদি নিরপেক্ষ তদন্তে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মুদারিবের গাফলতির জন্যেই লোকসান হয়েছে তাহলে ব্যাংক লোকসানের পুরো দায়ভার বহনে সম্মত নাও হতে পারে।

মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা বৈধ হতে হলে নীচের শর্তগুলো পূরণ করা অত্যাবশ্যক। যথা:

ক) *সাহিব আল-মাল* ও *মুদারিবের* মধ্যে লিখিত চুক্তি হতে হবে। চুক্তিতে মূলধনের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

খ) মূলধন নগদ অর্থের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে; পণ্য সামগ্রীকেই মূলধন হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

গ) সমুদয় মূলধন মুদারিবের কাছে হস্তান্তর করতে হবে যেন মুদারিব নিজেই তা বিনিয়োগ করতে পারে।

ঘ) যদি সাহিব আল-মাল মুদারিবের সাথে সরাসরি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

ঙ) কারবারের মুনাফায় মুদারিবের সুনির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ থাকবে, কোন সুনির্দিষ্ট অংকের উল্লেখ থাকবে না।

চ) মুদারিব কারবারের মুনাফা হতেই তার অংশ পাবে, মূলধন হতে নয়। যদি কারবারে লোকসান হয় তবে কোন অবস্থাতেই মুদারিব মূলধন থেকে কিছু দাবী করতে পারবে না।

এই পদ্ধতি স্বনির্ভর সমাজ গঠনে উৎসাহ যোগায়। দক্ষ কিন্তু অসচ্ছল ব্যক্তিরা মুদারাবা পদ্ধতিতে নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারে। ফলে বেকার জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যাংকও বিনা ঝামেলায় পুঁজি বিনিয়োগ ও মুনাফা উপার্জনের সুযোগ পায়। এসব সুবিধার জন্যেই মুসলিম দেশ ছাড়াও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সম্প্রতি বহু মুদারাবাভিত্তিক বিনিয়োগ কোম্পানী গড়ে উঠছে। এগুলো ক্রমেই সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কোম্পানী ব্যবসায়সফল প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইতিমধ্যে পরিচিতিও লাভ করেছে।

২. **মুশারাকা**: এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে অংশীদারী ভিত্তিতে চুক্তি অনুসারে সুনির্দিষ্ট কারবার পরিচালিত হয়। আরবী পরিভাষায় একে বলা হয় *শিরকাতুল উকুদ*। ব্যাংকসহ সকল অংশীদারই পরস্পর সম্মত অংশ অনুসারে মূলধন সরবরাহ করে এবং স্বীকৃত অনুপাত অনুসারে মুনাফা ভাগ করে নেয়। লোকসান হলে অবশ্য প্রত্যেকে মূলধনের অনুপাতেই তার ভাগ নেবে। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যথা: অংশীদারগণ তাদের কারবারের যাবতীয় হিসাব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করবে, অংশীদারদের নৈতিক মান উন্নত হবে এবং কারবারের/প্রকল্পের যথাযথ তদারকী ও পর্যবেক্ষণের জন্যেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক জনশক্তিও থাকতে হবে। পুঁজির প্রকৃতি অনুসারে *শিরকাতুল উকুদ* চার ধরনের হয়ে থাকে: (ক) *শিরকাত আল-মুফাওয়াদা* (সমঅংশীদারী কারবার); (খ) *শিরকাত আল-ইনান* (অসমঅংশীদারী কারবার); (গ) *শিরকাত আল-সুনায়ী* (পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার); এবং (ঘ) *শিরকাত আল-ওয়াজুহ* (সুনামভিত্তিক অংশীদারী কারবার)। মধ্যম শ্রেণীর বিত্তবান লোকেরা বা বিভিন্ন সংস্থা এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের সহায়তা লাভের সুযোগ নিতে পারে। ফলে ব্যাংক যেমন বিস্তৃত পরিসরে বিনিয়োগের সুযোগ পায় তেমনি অর্থনীতিতে কর্ম উদ্যোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. **বায়ই মুরাবাহা**: ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রীর আমদানী-রপ্তানী ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। ব্যাংক সাধারণত আগ্রহী ক্রেতার চাহিদামাফিক পণ্য ক্রয় করে তার সাথে একটা মুনাফা (মার্ক আপ নামে সচরাচর পরিচিত) যুক্ত করে তার কাছেই এটা বিক্রয় করে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ বৈধ। তবে পদ্ধতিটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্যে নীচের শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছে।

ক) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষই দ্রব্য সামগ্রীর মূল ক্রয়মূল্য সম্বন্ধে অবহিত থাকবে;

খ) উভয়প্যর অন্তর্নিহিত মুনাফার পরিমাণ বা হার সম্বন্ধে অবহিত থাকবে;

গ) মূল ক্রয় মূল্য এবং নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যের মধ্যে সুদের কোন অংশ বা সংশ্রব থাকবে পণ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ, গুণাগুণ সরবরাহের স্থান ও সময় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকবে; এবং

ঘ) ব্যাংক গ্রাহকের নিকট বিক্রির উদ্দেশ্যে পণের মূল্য নির্ধারণের সময়ে ক্রয়মূল্য ছাড়াও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচও যোগ করার এখতিয়ার রাখে।

ক্রেতা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকের নিকট থেকে একবারে কিংবা কিস্তিতে পণ্যটি পূর্ব নির্ধারিত মূল্যেই ক্রয় করে। চুক্তিতে নির্ধারিত মুনাফা কোনভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না, এমনকি গ্রাহক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটির ডেলিভারী নাও নেয়। এই পদ্ধতিতে যদি পণ্য সামগ্রী তাৎক্ষণিক ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে হবু ক্রেতাকে কোন সিকিউরিটি বা জামানত দিতে হয় না, অথবা মূল্যের কোন অংশ পূর্বাহ্নেই আমানত হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখতে হয় না। শুধু একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় যেন হবু ক্রেতার পক্ষে ব্যাংকই বিক্রয়ের ঝামেলা বা দায় সম্পন্ন করতে পারে এবং সঙ্গত কোন কারণে হবু ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটি কিনতে অপারগ হলে ব্যাংক ঐ পণ্য অন্যের কাছে বিক্রী করে দিতে পারে।

এদেশে বিদ্যমান ব্যাংকিং আইনের আওতায় কোন ব্যাংকই সরাসরি পণ্য বাণিজ্যে নিয়োজিত হতে পারে না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের ইসলামী ব্যাংকগুলো অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে। এটি ইসলামী ব্যাংকের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক কর্মকাণ্ডের বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে এই পদ্ধতি।

৪. ব্যায়-ই-সালাম: (অগ্রিম ক্রয়): এই পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের চুক্তি করতে প্যারে এই শর্তে যে বিক্রেতা আগাম মূল্য নেবে এবং নির্ধারিত সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে পণ্যটি সরবরাহ করবে। ব্যাংক পণ্যটি পরে নিজের পছন্দমতো সময়ে ও মূল্যে বিক্রয় করতে পারবে। অগ্রিম ক্রয় চুক্তি সম্পাদনের সময়েই বিক্রেতার নিকট মূল্য হস্তান্তরিত হবে। চুক্তি বৈধ হওয়ার স্বার্থে চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য, সরবরাহের স্থান, পরিবহন খরচ, গুদামভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কৃষিজাত পণ্য ও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা খুবই উপযোগী। ইসলামী ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আসছে এবং প্রভূত মুনাফা অর্জন করছে। কৃষিপ্রধান দেশে এই পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদেরও স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৫. বায়-ই-মুয়াজ্জাল (বাকীতে বিক্রয়): এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা (ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান) ক্রেতার পক্ষে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট মূল্যে

তার কাছে বিক্রয়ের চুক্তি করে। ক্রয়মূল্য পরিশোধের পূর্বেই পণ্য সামগ্রী ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়। এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়মূল্য, লাভের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ জানাতে বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে বাধ্য নয়। কেবল বিক্রয়মূল্য উল্লেখই যথেষ্ট। এই ব্যবস্থায় নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে একসাথে বা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ রয়েছে। চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরণ, গুণাগুণ, পরিমাণ সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। উল্লেখ্য, চুক্তিপত্রে নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য কোন অবস্থাতেই হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাবে না। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ যোগানোর জন্যেও এ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি উপযোগী। ব্যাংক কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই ব্যবস্থায় সরবরাহ করতে পারে। কৃষকরা শস্য কাটার পর বা অন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ পরিশোধ করতে পারে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করছে।

৬. **ইজারা:** মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্যে ইজারা একটি বিশেষ কৌশল। এই পদ্ধতিতে সম্পদের মালিকানা ইজারাদারেরই (এক্ষেত্রে ব্যাংকের) থাকে। ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের চুক্তিতে ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগ দখল করে থাকে। এই পদ্ধতিতে ইজারাদাতা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে পণ্যের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ থেকে তার মূলধন ব্যয় পূরণ করে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিও অনেক কম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ সাফল্যের সাথে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পুঁজিনিবিড় মূলধন সামগ্রী ব্যবহার করার সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পণ্যবাহী জাহাজ, তেলবাহী ট্যাংকার, রেলওয়ে ওয়াগন, মাছ ধরার ট্রলার, দামী ও অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রভৃতি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের কাছে, ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়নশীল দেশের সরকারের কাছেও ইজারা দিচ্ছে।

৭. **ইজারা বিল-বাইই (ক্রয়ের চুক্তির ভাড়া):** এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পূর্ণ নিজস্ব তহবিল দিয়ে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী কোন সামগ্রী ক্রয় করে এবং তার নিকট এই শর্তে ভাড়া দেয় যে, গ্রাহক যদি কিস্তিতে সামগ্রীর মূল্য ও নির্ধারিত হারে ভাড়া পরিশোধ করে তাহলে চুক্তি মুতাবিক নির্ধারিত সময় শেষে গ্রাহক সামগ্রীটির মালিক হয়ে যাবে। সম্পদের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক নির্ধারিত হারে ভাড়া পেতে থাকবে। চুক্তি সম্পাদন হওয়ার সাথে সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্পদ গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু সম্পদটির মালিকানা থাকে ব্যাংকের হাতেই। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিক্রিত সম্পদের পূর্ণ মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আসছে।

৮. **হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (যৌথ মালিকানাভিত্তিক ভাড়ায় ক্রয়-বিক্রয়)**: এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী তার নিকট বিক্রী করার চুক্তিতে অংশীদারী ভিত্তিতে পুঁজির যোগান দিয়ে গাড়ী, যন্ত্রপাতি, বাড়ী ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। এরপর নির্ধারিত কিস্তিতে বিক্রীমূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহক পণ্যটি ক্রয়ের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। একই সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের জন্যেও অঙ্গীকার করে। যৌথভাবে পুঁজির যোগান দেবার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া তাদের স্ব স্ব পুজিঁর অংশ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সামগ্রীটির ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশের বিক্রয় মূল্য ও ভাড়ার অংশ কিস্তিতে পরিশোধিত হয়ে গেলে চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক সামগ্রীটির নিরংকুশ মালিকানা লাভ করে। পদ্ধতিটি বর্তমানে খুব জনপ্রিয়।

৯. **কিস্তিতে বিক্রয়**: ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের অপর অন্যতম কৌশল হলো কিস্তিতে বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে স্বল্প আয়ের লোকদের, বিশেষতঃ চাকুরীজীবীদের কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ব্যাংক গৃহসামগ্রী, কম্পিউটার, এয়ারকুলার ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে। ফলে স্বল্প আয়ের লোকেরা যেমন উপকৃত হয় তেমনি ব্যাংকও তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে।

১০. **ইসতিসনা**: এ পদ্ধতিতে ব্যাংকে কোন প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনকারীকে ফরমায়েশ মত কোন জিনিস নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত সময়ে তৈরী বা উৎপাদন করে সরবরাহের প্রস্তাব করলে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ তা মেনে নিলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত বলে গণ্য হয়। এ ক্ষেত্রে ফরমায়েশকৃত দ্রব্য সামগ্রীর দাম, পরিমাণ, প্রকৃতি, গুণাগুণ ইত্যাদি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদনকারী (*সানী*) এবং ফরমায়েশ দাতার (*মুসতাসনি*) মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার পথ রুদ্ধ হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর কোন পক্ষই এক তরফাভাবে শর্তের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনা বা এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। প্রকৃতিগতভাবে তাই ইসতিসনা চুক্তি চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। ইসতিস্নায় সাধারণতঃ অগ্রিম কোন অর্থ প্রদান করতে হয় না।

১১. **জু'আলাহ**: জু'আলাহ প্রকৃতিতে অনেকটাই ইসতিসনার মতো। ইসতিসনায় বিক্রেতা দ্রব্য সামগ্রী বা পণ্য সরবরাহ করে, জু'আলাহতে বিক্রেতা সেবা সরবরাহ করে থাকে। বিক্রেতা নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে সেবা প্রদান বা সরবরাহ করে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগকারীকে বলা হয় *জায়েল*, স্বীকৃত মজুরী বা দেয় অর্থকে বলা হয় *জোআল* এবং সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে বলা হয় *আমেল*। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক বা অন্যান্য সেবামূলক কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যাংক নিজেই আমেল-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। যেক্ষেত্রে ব্যাংক এধরনের ভূমিকা নেবে সেক্ষেত্রে জো'আলাহ চুক্তিতে অন্য কাউকে ব্যাংক আমেল হিসেবে নিয়োগের ক্ষমতা রাখে এমন ব্যবস্থাও থাকতে পারে। এটি হতে পারে মূল চুক্তির আওতায় সহযোগী চুক্তি। অনুরূপভাবে ব্যাংক যখন জায়েল তখন মূল আমেল

ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি নিয়ে কাউকে সহযোগী আমেল হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে। সেবা প্রদানের জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেল বা জায়েল যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবে তাও সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে পারে।

১২. মুজারাহ্: এই পদ্ধতিতে ব্যাংক যদি কোন কৃষি জমির মালিক বা অন্য কোনভাবে স্বত্বাধিকারী হয় তাহলে তা চাষ করার জন্যে কৃষকদের সাথে চুক্তি করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক *(মোজারে)* নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটি কৃষককে *(আমেল)* চাষের জন্যে দেবে। বিনিময়ে ব্যাংক নির্ধারিত হারে উৎপাদিত ফসলের অংশ পাবে। চুক্তির মধ্যেই উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্যে উন্নতমানের বীজ সার সেচসুবিধা পরিবহন ও কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অবশ্য এজন্যে ফসলের প্রাপ্য হারেরও তারতম্য হবে।

১৩. মুশাকাত: এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক তার মালিকানাধীন অথবা কোন-না-কোন ভাবে স্বত্বাধীন বৃক্ষ, ফলের বাগান ইত্যাদির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে কৃষককে দায়িত্ব অর্পণের জন্যে চুক্তি করে। উৎপন্ন ফল বা কাঠ উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুসারে বন্টিত হয়। মুজারাহ্ পদ্ধতির মতো এ ক্ষেত্রে সেচ, পরিবহন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের সুবিধা প্রদান এবং সেই অনুসারে ফসলের অংশ প্রাপ্তির শর্তের তারতম্য হতে পারে।

১৪. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়: ইসলামী ব্যাংক শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনা-বেচায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে এবং কার্যত: নিচ্ছেও। যথাযথভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে এটিও ব্যাংকের বিনিয়োগ ও আয়ের অন্যতম উৎস হওয়া সম্ভব। সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচালিত ও সন্তোষজনকহারে ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম এমন সরকারী ও বেসরকারী যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা কোম্পানীর স্টক ও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক তার তহবিল বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে এই ব্যাংক যেহেতু শুধুমাত্র হালাল ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেহেতু শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং দেখতে হবে ঐসব কোম্পানীর কার্যক্রম শরীয়াহ্সম্মত কি না। অর্থাৎ, তাদের লেনদেনে সুদের সংশ্রব আছে কিনা এবং কার্যক্রমে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে কি না। যদি তা না হয় তাহলে ঐসব কোম্পানীর শেয়ার কেনা-বেচায় অংশ নেওয়া যাবে না।

১৫. বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়: ইসলামী ব্যাংক খোলা বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা কিনে আবার তা খোলা বাজারেই বিক্রয় করতে পারে। এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। শরীয়াহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার স্বার্থে বৈদেশিক মুদ্রা উপস্থিত ক্রয় বা বিক্রয় করতে হবে এবং তা অবশ্যই নগদ মূল্যে হতে হবে।বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিশেষত: মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সেসব দেশের ইসলামী ব্যাংক এই ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ

করছে এবং এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। কোন কোন ব্যাংকের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশই অর্জিত হচ্ছে এই একটি মাত্র পদ্ধতি থেকেই।

১৬. মেয়াদী অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট: ইসলামী ব্যাংকগুলো কখনও তারল্যের সমস্যায় পতিত হয়নি। বরং তাদের হাতে বিপুল অব্যবহৃত আমানত পড়ে থাকে। এই অর্থ অনায়াসে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্যে ব্যবহার করা যায়। বহু ইসলামী ব্যাংক তাই বর্তমানে পাঁচ হতে দশ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ইস্যু করছে যেন গৃহ নির্মাণ, স্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন প্রভৃতি কাজে এই অর্থ বিনিয়োগ করা যায়। এই ধরনের সার্টিফিকেট ন্যূনতম এক বছরের পূর্বে ভাঙানো যায় না। লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের শর্ত থাকে বলেই ক্রেতারা যেমন মুনাফা আশা করে তেমনি লোকসানের অংশ নিতেও প্রস্তুত থাকে। দেখা গেছে এসব বিনিয়োগে মুনাফাই হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় আরও লক্ষ্য করা গেছে, ইসলামী ব্যাংক এই ধরনের সার্টিফিকেট ক্রেতাদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম নিশ্চিত বা গ্যারান্টিযুক্ত সুদের চেয়েও বেশী হারে মুনাফা প্রদান করেছে। এ থেকে এই ধরনের বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

১৭. বিনিয়োগ নীলাম: বিনিয়োগ নীলাম ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিল্পখাতে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ বা সহযোগিতার জন্যে এটি একটি কার্যকর পন্থা। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক একা কিংবা অন্যের সাথে যৌথভাবে শিল্প প্রকল্প প্রস্তত করে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এরপর ঐ প্রকল্পটি নীলামের ব্যবস্থা করে। অবশ্য প্রকল্পটি তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করেও ব্যাংক নীলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত হারে লাভ ধরেই ব্যাংক প্রকল্পটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যে কোন দরপত্র বা নীলাম ডাক গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারও ব্যাংকের থাকে। কৃতকার্য ক্রেতার নিকট থেকে ব্যাংক সম্পূর্ণ অর্থ নগদে গ্রহণ করতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দিতে পারে। ইসলামী ব্যাংকের জন্যে এটি একটি লাভজনক বিনিয়োগ কৌশল। দ্রুত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও পুঁজি সংগঠনের জন্যেও পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে সহায়ক।

১৮. সরাসরি বিনিয়োগ: ইসলামী ব্যাংক কারো সাহায্যে না নিয়ে নিজেই কোন লাভজনক প্রকল্প বা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের প্রকল্প স্থাপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্কীম তৈরী থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগেই করে থাকে। প্রকল্পের মূলধন সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থায়ী মালিকানা সকল কিছুই ব্যাংকের নিজের হাতে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর লাভ হলে তার পুরোটাই ব্যাংকের। লোকসান হলে তারও পুরোটাই ব্যাংক বহন করে। পৃথিবীর বহু ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে। এসবের মধ্যে ডেইরী ফার্ম হতে এলুমিনিয়াম ও ফাইবার গ্লাস ফ্যাক্টরী, মাছ ধরার ট্রলার হতে গৃহায়ন প্রকল্প সবই রয়েছে।

১৯. স্বাভাবিক মুনাফার হারে বিনিয়োগঃ চায়ের দোকান, ফেরীওয়ালা, কামার, নাপিত, মুদীওয়ালা প্রভৃতি নানা ধরনের ছোট ছোট দোকানদার রয়েছে যাদের পুঁজির প্রয়োজন। তারা ব্যবসার দৈনন্দিন হিসাবপত্র রাখে না বা রাখতে পারে না। এজন্যে উপরের পদ্ধতিগুলোর কোনটির মাধ্যমেই এদের আর্থিক সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। অথচ এদেরকে পুঁজি দিয়ে সহযোগিতা করতে পারলে এরা কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ঋণ ফেরত দিয়ে থাকে। বরং বড় ঋণ গ্রহীতারাই ঋণ পরিশোধে দীর্ঘসূত্রীতা অবলম্বন করে। তাই ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত স্বাভাবিক হারে মুনাফা প্রদানের শর্তে এসব ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

স্বাভাবিক মুনাফার হার নির্ধারণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এই ধরনের ব্যবসাসমূহের কমপক্ষে তিন বছরের লেন-দেনের হিসাব নেবে, লাভ-লোকসানের হিসাব করবে এবং এর গড় হারের ভিত্তিতেই মুনাফার স্বাভাবিক হার নির্ধারিত হবে। সুদের হারের মতো এই হার স্থির বা সুনির্দিষ্ট নয়। অবশ্য বিনিয়োগের সময় চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, যদি প্রকৃত লাভ নির্ধারিত স্বাভাবিক মুনাফার হারের চেয়ে বেশী হয় তাহলে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত লাভের অংশবিশেষ ব্যাংককে প্রদান করবে। অপরপক্ষে যদি অর্জিত মুনাফা নির্ধারিত স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয় কিংবা লোকসান হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পারে তাহলে ব্যাংক মুনাফার ঐ নিম্নহার বা লোকসানই মেনে নেবে। সুতরাং, মুনাফার স্বাভাবিক হার আসলে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশল মাত্র। সন্দেহ নেই, অর্থায়নের এই পদ্ধতি খুব আকর্ষণীয় ও সহজ। কিন্তু এর সঠিক বাস্তবায়ন খুবই দুরূহ। বিশেষত: ঐ সব ক্ষেত্র যেখানে 'স্বাভাবিক' মুনাফার হার নির্ধারণ ক্রটিপূর্ণ বা বিতর্কিত। ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের পদ্ধতি ব্যাংকের ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

২০. করযে হাসানাঃ দানের চেয়ে করযে হাসানার সওয়াব বেশী। সওয়াবের নিয়তে এবং গ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে তার অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যেই এবং কোন রকম প্রত্যুপকারের বিন্দুমাত্র আশা না করে করযে হাসানা প্রদানকারী অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে। সুদনির্ভর ব্যাংকগুলো তো বটেই, বিত্তশালীরা পর্যন্ত এরকম ঋণ দিতে নারাজ। অথচ সচ্ছল ব্যক্তিরও অনেক সময় ঋণের প্রয়োজন পড়ে সাময়িক অভাব বা প্রয়োজন পূরণের জন্যে। সে সময় যদি করযে হাসানার সুযোগ না থাকে তাহলে তাকে হয় সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হবে অথবা নিরুপায় হয়েই সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হবে। ইসলামী ব্যাংক এই সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যেই করযে হাসানা দিয়ে থাকে। সুদভিত্তিক ব্যাংকে এই ধরনের সহযোগিতা পাওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদের জরুরী ও স্বল্প মেয়াদী প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম হারে সার্ভিস চার্জের বিপরীতে ঋণ দিয়ে থাকে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই হার ০.৫০% হতে সর্বোচ্চ ২.০% পর্যন্ত। পাকিস্তানে এই হার

প্রায় ৩.০%। করযে হাসানা মঞ্জুরের সময়েই ঋণ গ্রহীতার সুবিধা অনুসারে ঋণ পরিশোধের সময় ও পদ্ধতিও নির্ধারিত হয়।

বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যালান্সশীটসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উপরে উল্লেখিত কর্মকৌশলসমূহ ব্যবহার করে তারা শুধু বিপুল মুনাফাই অর্জন করেনি, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় আমানতকারীদের বেশী হারে মুনাফা প্রদান করছে। স্মরণ রাখা দরকার, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বয়স যেখানে দুইশ বছরের বেশী ইসলামী ব্যাংকের বয়স সেখানে তিন দশকের কিছু বেশী। এখনও তার শৈশবকাল কাটিয়ে ওঠেনি ইসলামী ব্যাংক। আশার কথা, ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনগুলো বিনিয়োগের জন্যে শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সম্মিলিতভাবে একে অন্যের অভিজ্ঞতা হতে শেখার চেষ্টা করছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য একদিকে যেমন তার কর্মীবাহিনীর ঐকান্তিকতা, পেশাগত কর্মকুশলতা এবং দক্ষতার উপর নির্ভরশীল তেমনি নির্ভরশীল তার অংশীদারী বিনিয়োগকারীদের সততা, যোগ্যতা এবং ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার উপর। বিশেষতঃ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সততাসম্পন্ন ব্যবসায়ী পাওয়া খুবই দুরূহ। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নিজ উদ্যোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে এ কথা বলতেই হবে বর্তমান অনৈসলামী পরিবেশ, বিশেষতঃ প্রচলিত বাণিজ্যিক, রাজস্ব ও দেওয়ানী আইনের অনেকগুলোই ইসলামী ব্যাংকের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার পথে বিষম বাধা। এসব আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন। যেহেতু সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমতিক্রমে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনেই ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হচ্ছে সেহেতু এসব আইন সংশোধন বা পরিবর্তনের দায়-দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তায়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রতিকূলতার মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্রমাগত সাফল্যের সোপানে উত্তরণ লাভ করছে। বস্তুতঃ সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক এক সাহসী ও ভিন্নধর্মী চ্যালেঞ্জ। সনাতন ব্যাংকগুলো যেখানে শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যাংকগুলো সেখানে একই সাথে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যোগফল। এই ব্যাংক শরীয়াহ্‌সম্মত উপায়ে মুসলমানের রুটি-রুজীর ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যেও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক তাই মুমিন মুসলমানের জন্যে প্রয়োজনীয় এক প্রতিষ্ঠানই নয়, মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যেও অপরিহার্য এক ইন্সটিটিউশন।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

১. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

সমগ্র বিশ্বে আজ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশন সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার জন্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ধনী-গরীব ও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে নানা দেশে এই ইনস্টিটিউশনটি ক্রমাগত তার বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলেছে। সুদনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এই প্রতিষ্ঠান। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জনগণ অবাক বিস্ময়ে (খানিকটা সংশয় জড়িতও) তাকিয়ে দেখছে বহুল আলোচিত প্রতিষ্ঠানটি তাদের একেবারে দোরগোড়ায় হাজির। প্রতিষ্ঠানটির নাম ইসলামী ব্যাংক।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা এবং এক্ষেত্রে বিরাজমান হারাম পদ্ধতি থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের দীর্ঘদিনের আকাংখা ইসলামী প্রক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা সমস্যার সমাধান হবে। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। আজকের সমাজ যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় ভুগছে সেসব সমস্যার সমাধানে ইসলামী অর্থনীতির কৃতিত্ব ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আবারো প্রমাণিত হবে। বস্তুতঃ সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ এবং সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য।

মিশরেই সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে পুরোপুরি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধি-বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এবছরেই মিশরের মিটঘামার নামক স্থানে ইসলামী সেভিংস ব্যাংক নামে আধুনিক কালের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাংকটি বিপুল সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু ব্যাংকটি সে দেশের সুদনির্ভর ব্যাংকগুলোর চক্ষুশূল হওয়ায় ইসলামের দুশমন ও নিজেকে ফেরাউনের বংশধর বলে দাবীদার প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসেরের সরকার এটি বন্ধ করে দেয়। সাফল্যই ছিল ব্যাংকটির বড় শত্রু।

প্রায় এক দশক পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে সে দেশে ১৯৭১ সালে নাসের সোশ্যাল ব্যাংক নামে আরেকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছর হতেই ব্যাংকটি সাফল্যের মুখ দেখে। এর পর ক্রমান্বয়ে ১৯৭৫ সালে সউদী আরবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং ঐ একই বছরে সংযুক্ত আরব

আমীরাতে দুবাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে সুদানে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক, কুয়েতে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, মিশরে ফয়সল ইসলামী ব্যাংক এবং ১৯৭৮ সালে জর্দানে জর্দান ইসলামী ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর হতে প্রায় প্রতি বছর বিশ্বের কোন-না-কোন দেশে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই সংখ্যা প্রায় তিন শতে পৌঁচেছে।

উল্লেখ্য, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করতে সময় লেগেছে কয়েক শতাব্দী। কিন্তু আনন্দের বিষয়, পদ্ধতি হিসাবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে। শুধু তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতেই নয়, কৃষিপ্রধান ও দরিদ্র দেশেও ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে অন্যান্য দেশে। উদাহরণস্বরূপ সুদান মিশর পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার নাম করা যেতে পারে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের ইসলামী মডেল বিশ্বজনীনতা তথা ব্যাপক ও স্বীকৃত আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসমষ্টির ৮৬% ইসলামের অনুসারী। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ একথা সকলেরই জানা। তাই সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কখনও আত্মিক সংযোগ ঘটেনি। অথচ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে তাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছে স্বাধীনতা লাভের পর হতেই। এ জন্যে এযাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নীচে উল্লেখ করা গেল।

প্রথমেই সরকারের ভূমিকার কথা বলতে হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে সরকার যেসব উদ্যোগে অংশগ্রহণ ও সম্মতি প্রদান করেছেন তা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষারই প্রচেষ্টা। এসবের মধ্যে রয়েছে:

ক) আগষ্ট, ১৯৯৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদে স্বাক্ষরকারী ২২টি সদস্য দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। এই সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার নীতিগতভাবেই দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং তৎপরতাকে ইসলামী শরীয়াহ্‌র আলোকে পুনর্গঠিত করতে সম্মত হয়েছে।

খ) ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করে। এই সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা গৃহীত হয় এবং

পর্যায়ক্রমে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করার জন্যে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গ) ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমীরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ দেশে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের মতো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লেখেন। এরপর ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ বিভাগ এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মতামত চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দেয়।

ঘ) মে, ১৯৮০ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল-হক সকল ইসলামী দেশে শাখাসহ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক চালুর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

ঙ) এই প্রেক্ষিতে নভেম্বর, ১৯৮০ বাংলাদেশ ব্যাংক মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ইসলামী ব্যাংকের কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেয় এবং সে আলোকে জানুয়ারী, ১৯৮১ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে।

চ) ১৯৮১ সালে ঐতিহাসিক মক্কা সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম দেশসমূহে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুপারিশ অনুমোদিত হয়। এজন্যে বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এর মাধ্যমে ইসলামী দেশসমূহে বিনিয়োগকে ফলপ্রসূ করে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ছ) ১৯৮১ সালের মার্চে খার্তুমে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণসংস্থা প্রধানদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জ) ১৯৮১ সালের ১৩ই এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত দেশের সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানমূহের কর্মকর্তাদের এক সভায় অবিলম্বে দেশের সকল জেলা সদরে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের একাধিক ইসলামী শাখা খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঝ) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংএর বাস্তব কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত অনুশীলন ও সমীক্ষার জন্যে ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে নভেম্বর, ১৯৮১তে এটি বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এ্যাসোসিয়েশন (BIBA) নামে পুনর্গঠিত হয়। এর মূল শ্লোগান ছিল 'BIBA to fight against RIBA'। এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের উপর বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়।

ঞ) বেসরকারী পর্যায়ে এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গণসচেতনতা ও প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় ১৯৭৯ সালের শুরু থেকে। এ বছরের জুলাই মাসে ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ইসলামী অর্থনীতির উপর তিনদিনব্যাপী এক সফল আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সেমিনারে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর পরবর্তী বছর এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর আইইআরবি-এর উদ্যোগে দুদিনব্যাপী এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশী-বিদেশী গবেষক-অধ্যাপক ও চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকার মুসলিম বিজিনেসমেনস্ সোসাইটির সদস্যগণও সেমিনারের সুপারিশমালার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখান। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সোসাইটির সদস্যগণ এদেশে বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত চেষ্টা চালানোর জন্যে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তারা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ নামে একটি কোম্পানীও গঠন করেন।

ট) ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর দুদিন ব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ একই বছর এপ্রিল মাসে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা ট্রাষ্টের উদ্যোগে চট্টগ্রামেও ইসলামী ব্যাংকের উপর এক সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সেমিনারেই সর্বস্তরের জনগণ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশ গ্রহণ করে।

ঠ) ১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর-২৪ নভেম্বর সোনালী ব্যাংক ষ্টাফ কলেজ ইসলামী ব্যাংকের উপর এক মাস মেয়াদী আন্তঃব্যাংক আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। পরবর্তী সময়ে ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। বিআইবিএম-ও ১৯৮২ সালের ১৮-৩০ জানুয়ারী ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এসব প্রশিক্ষণ কোর্সে দেশের সিনিয়র ব্যাংকাররাসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করেন।

ড) ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের জন্যে সরকারের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন পেশ করা হয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি সমীক্ষা মিশন বাংলাদেশ সফর করে এবং এদেশে বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করে। এই মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর পরিশোধিত মূলধনে অংশগ্রহণ করে অন্যতম উদ্যোক্তা-

শেয়ারহোল্ডার হিসাবে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শেষ পর্যন্ত সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি লাভ করে বেসরকারী খাতে দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক-ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ। ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ।

ঢ) এদেশে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়ে যারা নানাভাবে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন প্রসঙ্গতঃ তাদের কথাও উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁদের অকুণ্ঠ ত্যাগ স্বীকার ও নিরলস প্রয়াস ছাড়া দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকটির অগ্রযাত্রা দুরূহ ছিল। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের সাবেক প্রিন্সিপ্যাল জনাব এম. আযীযুল হক। নতুন এই ব্যাংকের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় কান্ডারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে তিনি স্বেচ্ছায় ঐ পদ ছেড়ে চলে আসেন। ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রথম সদস্য-সচিব হিসাবে দারুল ইফতার চেয়ারম্যান সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ব্যাংকের প্রথম চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক লস্কর, চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল জব্বার শাহ্, বগুড়ার প্রখ্যাত শিল্পপতি আলহাজ্ব মফিজুর রহমান এবং বাংলাদেশে সৌদী আরবের তদানীন্তন মাননীয় রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামীদ আল-খতীব প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয়।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আকাংখা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ও এদেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আকাঙ্খিত ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের বাস্তব সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। আশার কথা, এদেশের প্রথম এই ইসলামী ব্যাংকটি ইতিমধ্যেই আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। পরবর্তী আলোচনা হতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ক্ষান্ত হয় নি। দেশের আপামর জনগণের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল, উপার্জন পদ্ধতি, বিনিয়োগের প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রচার ও প্রসারের জন্যে ব্যাংকটি ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্যে নিজ উদ্যোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১১-১২ মার্চ, ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই সেমিনারের পরেই ১৯৮৭ সালের মে মাসে সউদী আরবের দাল্লাহ্ আল-বারাকা গ্রুপের সহযোগিতায় ঢাকাতে আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ (বর্তমানে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক।

দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের চাহিদা পূরণের জন্যে একটি বা দুটি ইসলামী ব্যাংক কোনক্রমেই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া ইতিমধ্যেই ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ আয়োজিত দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে সেমিনার ও ইফতার মাহফিলের আলোচনা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি জনমানসে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। এই প্রেক্ষিতেই ১৮ জুন, ১৯৯৫ প্রতিষ্ঠিত হয় আল-আরফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং ছয় মাসের কম সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক- সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (২২ নভেম্বর, ১৯৯৫)।

এছাড়া ফয়সল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায় ১১ আগষ্ট, ১৯৯৭। প্রাইম ব্যাংক ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ঢাকাতে তার প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং শাখা প্রতিষ্ঠা করে। এর ঠিক দুবছর পরে (১৭.১২.৯৯) সিলেটে অনুরূপ আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক। উপরন্তু দেশের প্রথম ইসলামী বিনিয়োগ কোম্পানী — ইসলামিক ফাইন্যান্স এ্যণ্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কাজ শুরু করেছে ২০০০ সাল হতে।

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ক. প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক তথা ইসলামী শরীয়াহ্ অনুসারী ব্যাংক হিসাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) তার অগ্রযাত্রা শুরু করে ৩০শে মার্চ, ১৯৮৩ সালে। জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং দেশী উদ্যোক্তাদের মূলধন নিয়ে ব্যাংকটির কার্যক্রম শুরু হয়। তখন এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬.৭৫ কোটি টাকা যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালের শেষ নাগাদ দাঁড়িয়েছে ১৯২.০০ কোটি টাকায়।

খ. পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে চব্বিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস রয়েছে। এর মধ্যে দেশী উদ্যোক্তা ও শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধি রয়েছেন ষোলজন এবং বিদেশী উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে আটজন। ব্যাংকটি ইসলামী শরীয়াহর আলোকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠার বছরই দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শরীয়াহ কাউন্সিল গঠিত হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন দেশের সাতজন প্রখ্যাত ফকীহ্/আলিম এবং একজন করে প্রথিতযশা ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ ও আইনজীবি। বর্তমানে এই সংখ্যা

তেরো জনে উন্নীত করা হয়েছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের স্থানীয় সদস্যদের মধ্যে থেকে আটজনের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্য-সচিব ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্যে নির্বাহী প্রেসিডেন্টকে সহযোগিতা করে থাকেন।

আইবিবিএল যেসব পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ করে থাকে সেগুলো হলো:

১. আল-ওয়াদিয়াহ চলতি আমানত
২. মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত
৩. মুদারাবা মেয়াদী আমানত
৪. মুদারাবা স্বল্পমেয়াদী আমানত
৫. মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় আমানত
৬. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) আমানত

এছাড়াও অতি সম্প্রতি চালু হয়েছে:

১. মুদারাবা মোহর সঞ্চয় আমানত
২. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা আমানত
৩. মুদারাবা মাসিক মুনাফা আমানত
৪. মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ সঞ্চয় আমানত

আইবিবিএল তার মূলধন ও আমানত বিনিয়োগের সময়ে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেয় তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এসবের মধ্যে রয়েছে:

ক) শরীয়াহর অনুমোদন;
খ) সামাজিক কাম্যতা;
গ) দ্রুত তারল্য;
ঘ) অধিক সংখ্যক গ্রাহক;
ঙ) নিরাপত্তার নিশ্চয়তা; এবং
চ) মুনাফার সম্ভাব্যতা

গ. কর্মপদ্ধতি

আইবিবিএল যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে তার তহবিল বিনিয়োগ করে থাকে সেসবের উল্লেখ করা জরুরী। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে সুদী ব্যাংকগুলো যেমন নানা ধরনের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে তার মোট আয়ের ৩০%-৩৫% উপার্জন করে থাকে (ইসলামের দৃষ্টিতে যা সম্পূর্ণতঃ হালাল বা বৈধ) ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকও সেই সমুদয় সেবামূলক কাজ করে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ আয় করতে সমর্থ। বাকী ৬৫%-৭০% আয়ের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে আলোচিত ইসলামী ব্যাংকের উপার্জন কৌশলের মধ্যে নীচের কর্মপদ্ধতিসমূহ অনুসৃত হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে:

ক) মুরাবাহা
খ) মুশারাকা
গ) বায়-ই-মুয়াজ্জাল
ঘ) হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক
ঙ) ক্রয় ও নেগোশিয়েশন
চ) করযে হাসানা

আইবিবিএল এদেশের জনসাধারণের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রতি নজর রেখে এবং প্রকৃত সামাজিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে নতুন কতকগুলো বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এতগুলো কর্মসূচী বাংলাদেশে অন্য কোনও ব্যাংক আজ অবধি একসংগে গ্রহণ করেনি। ব্যাংকের গৃহীত প্রকল্পসমূহ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে:

১. গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ
২. গৃহনির্মাণ বিনিয়োগ
৩. পরিবহন বিনিয়োগ
৪. মোটরকার বিনিয়োগ
৫. ডাক্তার বিনিয়োগ
৬. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ
৭. কৃষি-সরঞ্জাম বিনিয়োগ
৮. পল্লী উন্নয়ন
৯. মিরপুর রেশম বয়ন বিনিয়োগ
১০. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিনিয়োগ

এসব বিনিয়োগ কার্যক্রম ছাড়াও আইবিবিএল সার্ভিস চার্জের (ফি ও কমিশন) বিনিময়ে যেসব সেবামূলক কাজ করে হালালভাবেই উপার্জন করে থাকে সেগুলো হলো:

১. স্পষ্ট রেটে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়;
২. ঋণপত্র খোলা;
৩. নিশ্চয়তাপত্র প্রদান;
৪. বাণিজ্যিক দলিলপত্র জামানতের বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী অর্থ সরবরাহ;
৫. ড্রাফট, চেক, প্রমিসারী নোট, বিল অব লেডিং ইত্যাদি সংগ্রহ ও অর্থ প্রদান;
৬. শেয়ার বিনিয়োগ সার্টিফিকেট, বন্ড প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়;
৭. নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কৃষি, রিয়েল এষ্টেট ও সেবামূলক প্রকল্পে সহায়তা প্রদান;
৮. এজেন্ট নিয়োগ করে ও এজেন্ট হিসেবে কাজ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালানো;

৯. সম্ভাব্য ঘটতি পূরণের জন্যে সলিডারিটি ও সিকিউরিটি তহবিল গঠন; এবং

১০. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইপত্র (feasibility study) তৈরী এবং ফাইন্যান্সিয়াল, টেকনিক্যাল, অর্থনৈতিক, বিপণন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান।

ঘ. সাফল্য

আইবিবিএল তার মূলধন ও আমানতকারীদের অর্থ ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে বিগত কুড়ি বছরে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ প্রচলিত সুদনির্ভর ব্যাংকিং পদ্ধতির বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ কর্মকৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় এই বিবেচনা আরও গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায়। নীচে পর্যায়ক্রমে শাখাবৃদ্ধি ও আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ, আয় ও মুনাফা, পদ্ধতি ও খাতওয়ারী বিনিয়োগ, শাখাপিছু আয়, ব্যয় ও মুনাফা অর্জন, বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ ও গৃহীত প্রকল্পসমূহের সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের র‍্যাংকিং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইংল্যান্ডের Reed Information Services-এর ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসের র‍্যাংকিং অনুসারে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর চার হাজার ব্যাংকের মধ্যে আইবিবিএল-এর স্থান ছিল ২৩১৪ তম।[1] উপরন্তু, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত CAMEL rating (অর্থাৎ, C=Capital বা মূলধন, A=Asset বা সম্পদ, M=Management বা ব্যবস্থাপনা, E=Efficiency বা দক্ষতা, L=Liquidity বা তারল্য) অনুসারেও এই ব্যাংকের মান A+। এই সম্মান শুধু ব্যাংকটির জন্যেই নয় দেশের জন্যেও গৌরবের। উপরন্তু সম্প্রতি লন্ডন হতে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত অর্থনৈতিক ম্যাগাজিন The Global Finance তাদের প্রকাশিত সমীক্ষায় ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের জন্যে আইবিবিএলকেই উপর্যুপরি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

(i) শাখা বৃদ্ধি ও আমানত সংগ্রহ

সারণী-১ হতে দেখা যাবে প্রতিষ্ঠার বছরে ব্যাংকটি মাত্র তিনটি শাখা স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। ক্রমে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ছয় বছরের ব্যবধানে ১৯৮৯ সালে ৪০ এবং পরবর্তী ছয় বছরের ব্যবধানে ১৯৯৫ সালে ৯০টিতে উন্নীত হয়েছে। এই সংখ্যা ২০০৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪১এ পৌঁচেছে। একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ব্যাংকের পক্ষে ভিন্ন

---

[1] The Banker's Almanac January 1995, vol. 1-4, (Reed Information Services 1995, Windsor Court, East Grinstead House, West Sussex, England.

অর্থনৈতিক ও আইন কাঠামোর মধ্যে এভাবে শাখা বিস্তারে সফলতা লাভ নিঃসন্দেহে গৌরবময় ও তাৎপর্যবহ।

এই সারণী হতেই দেখা যাবে আইবিবিএলের আমানতের পরিমাণ ১৯৮৩ সালে ছিল ১৪.৪০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ ২০০৩ সালের শেষ নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯৯৪.১৭ কোটি টাকায়। অনুরূপভাবে শাখাপিছু আমানতের পরিমাণ ১৯৮৩-তে ছিল ৪.৮০ কোটি টাকা। ১৯৮৬ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১২.২০ কোটি টাকায় (প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি)। এরপর তা কমতে থাকে এবং ১৯৮৯ সালে ৮.৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০ সাল হতে ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং ২০০৩ সালে শাখাপিছু আমানত ৪৯.৬০ কোটি টাকায় পৌঁছায়। তুলনামূলক বিচারে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ও হার অবশ্যই সন্তোষজনক।

(ii) বিনিয়োগ

আইবিবিএলের ১৯৮৩ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫.৬০ কোটি টাকা। এক দশকের মাথায় এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯২-এ দাঁড়িয়েছে ৫১৬.৪০ কোটি টাকা। (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৯২ গুণেরও বেশী। শাখাপিছু গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯৮৩-তে ১.৮৭ কোটি টাকা। এই হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৭ সালে সর্বোচ্চ ৮.৬১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। কিন্তু এরপর ১৯৮৮ সালে এই পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭.৮৯ কোটি টাকায় এবং ১৯৮৯ সালে ৫.৮৯ কোটি টাকায়। এই অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে ২০০৩ সাল হতে এবং ২০০৩ সালে শাখাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণ ৪১.৮৭ কোটি টাকায় পৌঁছায়। (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)।

সারণী-১

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর আমানত ও বিনিয়োগের চিত্র : ১৯৮৩-২০০৩

(কোটি টাকায়)

বছর	শাখার সংখ্যা	আমানতের পরিমাণ	শাখাপিছু আমানত	বিনিয়োগের পরিমাণ	শাখাপিছু বিনিয়োগ	মোট আয়	শাখাপিছু আয়	মোট ব্যয়	শাখাপিছু ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৮৩	৩	১৪.৪	৪.৮০	৫.৬	১.৮৭	০.৩৪	০.১১	০.৫৯	০.১৯
১৯৮৪	৭	৬৩.৬	৯.০৮	৪৫.৮	৬.৫৪	৪.৫০	০.৬৪	৩.৭২	০.৫৩
১৯৮৫	১৩	১৫৬.৪	১২.০৩	৯৪.৮	৭.২৩	১০.০২	০.৭৭	৯.১৩	০.৭০
১৯৮৬	১৮	২২৩.০	১২.৩৮	১৪১.২	৭.৮৪	১৩.৬৭	০.৭৫	১৩.৬৬	০.৭৫
১৯৮৭	২১	২৪২.০	১১.৫২	১৮০.৯	৮.৬১	১৮.০৭	০.৮৬	১৭.৩৪	০.৮২
১৯৮৮	২৭	২৮৩.৭	১০.৪৬	২১৩.২	৭.৮৯	২৩.২৯	০.৮৬	২০.২২	০.৭৪
১৯৮৯	৪০	৩৪৫.৬	৮.৬৪	২৩৫.৮	৫.৮৯	২৮.৫৪	০.৭১	২৬.৩২	০.৬৫
১৯৯০	৪৯	৪৪৬.৬	৯.১০	৩২৫.৩	৬.৬৪	৪৫.২২	০.৯২	৩১.১৭	০.৬৩
১৯৯১	৬১	৫৬৭.২	৯.৩০	৪২৮.৩	৭.০২	৫৪.১৮	০.৮৮	৪৩.৬০	০.৭১
১৯৯২	৭১	৬৭০.৪	৯.৪৪	৫১৬.৪	৭.২৭	৫২.৭০	০.৭৪	৫২.৭০	০.৭৪
১৯৯৩	৭৬	৮২৬.১	১০.৮৬	৫৫৪.২	৭.৮০	৬২.২৮	০.৮২	৫৪.২৮	০.৭১
১৯৯৪	৮৩	১০২২.৬	১২.৩২	৮০৭.৬	৯.৭৩	৮২.৬৫	০.৯৯	৬০.৩৯	০.৭২
১৯৯৫	৯০	১২৬৬.৯	১৪.০৭	১১৫১.২	১২.৭৯	১০৯.৭৬	১.২২	৭৮.৬২	০.৮৭
১৯৯৬	৯৫	১৪৩২.৯	১৬.০৮	১৩৫৩.৯	১৪.২৫	১২৩.২৩	১.২৯	৯৪.৮৩	০.৯৯
১৯৯৭	১০০	১৬৮৭.৪	১৬.৮৭	১৩০৯.৫	১৩.০৯	১৩৬.৮৭	১.৩৬	১১৯.৮০	১.১৯
১৯৯৮	১০৫	২০০২.২	১৯.০৭	১৩৪৫.৫	১২.৮১	১৬২.৯৩	১.৫৫	১৪৮.০৯	১.৪১
১৯৯৯	১১০	২৫১৯.০	২২.৯০	১৮২৮.৩	১৬.৬২	১৯৬.৬২	১.৭৮	১৭৮.৭৯	১.৬৩
২০০০	১১৬	৩২১১.৩	২৭.৬৮	২৭৪৭.১	২৩.৬৮	৩২০.৭৮	২.৭৬	২৮৭.৭৬	২.৪৮
২০০১	১২১	৪১৫৪.৭	৩৪.৩৪	৩৫২৭.২	২৯.১৫	৪২৫.৯৫	৩.৫২	৩৬৮.৩৪	৩.০৪
২০০২	১২৮	৫৪৪৬.১	৪৩.৩৩	৪৬৩১.৫	৩৬.১৮	৫২৩.৪০	৪.০৯	৪২৪.০০	৩.৩১
২০০৩	১৪১	৬৯৯৪.২	৪৯.৬০	৫৯০৪.২	৪১.৮৭	৬৮৪.১৩	৪.৮৫	৬০৩.৯৩	৪.২৮

উৎস : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:-এর বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ

(iii) আয় ও মুনাফা

আয়ের বিবেচনার আইবিবিএলের এ যাবৎ মোট ফলাফল সন্তোষজনকই বলা যায়। শুরুর বছরে ব্যাংকটির মোট আয় ছিল ০.৩৪ কোটি টাকা যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩ সালে ৬৮৪.১৩ কোটি টাকায় পৌঁছায়। পক্ষান্তরে একই সময়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬০৩.৯২ কোটি টাকা। (সারণী-২ দ্রষ্টব্য)। শুরুর বছরে মোট আয়ের তুলনায় মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি ছিল ১৭৩%। পরবর্তী বছরে ঐ হার কমে ৮৩%-এ দাঁড়ায়।

কোন ব্যাংকের সার্বিক সাফল্য বা কৃতকার্যতা বিচারের ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনে সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আইবিবিএলকে অনেক চড়াই উৎরাই পার হতে হয়েছে। সারণী-২ হতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

সারণী-২ হতে দেখা যাচ্ছে শুরুর বছরটিতে ব্যাংক লোকসান দিয়েছে টাকা ২৫.০ লক্ষ। অবশ্য তার পরের বছর হতেই ব্যাংক মুনাফার মুখ দেখেছে এবং পরবর্তী বছরে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৯৮৬ সালে এই মুনাফা হ্রাস পেয়ে মাত্র ১.০ লক্ষ টাকায় নেমে এসেছে। পরবর্তী বছরে তা আবার টাকা ৭৩.০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। মুনাফার অংক কোটি টাকা অতিক্রম করেছে ১৯৮৮ সালে। এই বছর আয়কর ও রিজার্ভপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.০৭ কোটি টাকা। পরবর্তী বছরেই আবার মুনাফা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯২ সালে ব্যাংক কোন মুনাফাই অর্জন করেনি। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যে পরবর্তী বছরেই অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে ব্যাংকের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল ৮.০ কোটি টাকা। ২০০২ সালে ব্যাংক রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা করেছে- আয়কর ও রিজার্ভ-পূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ৯৯.৪০ কোটি টাকা। বারবার এই মুনাফা হ্রাসের কারণ হিসাবে কু-বিনিয়োগ অবলোপন, মুশারাকা খাতে লোকসান ও মেয়াদ উত্তীর্ণ বিনিয়োগ ও তার বিপরীতে মুনাফা না পাওয়া প্রভৃতি সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারণী-২

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর মুনাফা : ১৯৮৩-২০০৩

(কোটি টাকায়)

বছর	মুনাফা/লোকসান	বছর	মুনাফা/লোকসান
১৯৮৩	(০.২৫)	১৯৯৪	২২.২৬
১৯৮৪	০.৭৮	১৯৯৫	৩১.১৪
১৯৮৫	০.৮৯	১৯৯৬	২৮.৩৫
১৯৮৬	০.০১	১৯৯৭	১৭.০৭
১৯৮৭	০.৭৩	১৯৯৮	১৪.৮৪
১৯৮৮	৩.০৭	১৯৯৯	১৭.৮৩
১৯৮৯	২.২৬	২০০০	৩৩.০২
১৯৯০	১৪.০৫	২০০১	৫৭.৬১
১৯৯১	১০.৫৮	২০০২	৯৯.৪০
১৯৯২	০.০০	২০০৩	৮০.২০
১৯৯৩	৮.০০		

উৎস : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ

সারণী-৩

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর খাতওয়ারী ও পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ : ১৯৯৬-২০০৩

(কোটি টাকা)

বিনিয়োগ/বছর	১৯৯৬		১৯৯৭		১৯৯৮		১৯৯৯		২০০০		২০০১		২০০২		২০০৩	
খাত	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%	পরিমাণ	%
বাণিজ্য	৬১৩.২৩	৪৫.৩৬	৪৮৫.৭২	৩৭.১৫	৪০৬.৩৯	৩০.২৫	১১৪০.২০	৫৫.৩৯	১১৬৬.২৮	৪২.৫১	১১৫২.৬১	৩২.৭১	১৭৫৩.৪০	৩৭.৮৯	২০৪৬.৭৭	৩৪.৬৯
শিল্প	৪৫১.৮১	৩৩.৪২	৫৭০.৭০	৪৩.৬৫	৫৪১.৭৩	৪০.৩২	৪১৫.৩৪	২০.১৮	৯৮৪.৯৮	৩৫.৯০	১৫৭২.২০	৪৪.৬১	১৯৬৯.২৬	৪২.৫৫	২৪৪৮.০২	৪১.৪৯
কৃষি	৭.৭১	০.৫৭	৫.৫৭	০.৪৩	১০.৪১	০.৭৮	১৩.২৪	০.৬৪	১৩.৪০	০.৪৯	২৩৪.৪৮	৬.৬৫	২৩৫.০৫	৫.০৮	২২৩.৫২	৩.৭৯
রিয়াল এস্টেট	৪৮.২৬	৩.৫৭	২৬.৩০	২.০১	৫৫.৭৮	৪.১৫	১৩৮.৬৮	৬.৭৪	২৪০.৬২	৮.৭৭	২৫৭.৬০	৭.৩১	৩৫৮.১৭	৭.৭৪	৫২০.৪১	৮.৮২
পরিবহন	৬৭.০৫	৪.৯৬	৪৬.৯৮	৩.৫৯	৫৪.৫০	৪.০৬	৮৫.২৭	৪.১৪	১১২.০৯	৪.০৮	১৩৯.৭০	৩.৯৬	১৮৫.১৩	৪.০০	২৪৭.৫১	৪.১৯
অন্যান্য	১৬৩.৭৭	১২.১২	১৭২.২৬	১৩.১৭	২৭৪.৬৪	২০.৪৪	২৬৫.৭২	১২.৯১	২২৬.৩৫	৮.২৫	১৬৭.১৭	৪.৭৫	১২৭.০৩	২.৭৪	৪১৪.৪৯	৭.০২
মোট	১৩৫১.৮৩	১০০.০০	১৩০৭.৫৩	১০০.০০	১৩৪৩.৪৫	১০০.০০	২০৫৮.৪৬	১০০.০০	২৭৪৩.৭৩	১০০.০০	৩৫২৩.৭৭	১০০.০০	৪৬২৮.০৬	১০০.০০	৫৯০০.৭৫	১০০.০০
পদ্ধতি																
মুরাবাহা	৬৭৯.৭৫	৫০.২৮	৫৫৫.৯১	৪২.৫১	৫৩৯.৭৭	৪০.১৮	৮৩২.১০	৪০.৪২	১২০০.৩৯	৪৩.৭৫	১৭১১.২৫	৪৮.৫৬	২৩৫২.২৯	৫০.৮৩	৩১১৩.৮৮	৫২.৭৭
মুদারাবা	-	-	-	-	-		৫.২০	০.২৫	৫.২০	০.১৯	৫.২০	০.১৫	৫.২০	০.১১	১০.২০	০.১৭
মুশারাকা	৪২.৯৭	৩.১৮	৩৪.২১	২.৬২	২৮.৯৮	২.১৬	৪৮.৯২	২.৩৮	৪২.৮৯	১.৫৬	৩৪.৬২	০.৯৮	৩.৭০	০.০৮	১.২১	০.০২
বায়-ই-মুয়াজ্জাল	১৪৭.৯৪	১৮.৩৪	২৬০.২০	১৯.৯০	২৮২.৫৯	২১.০৩	৪০৬.১৭	১৯.৭৩	৪৪৭.৮৩	১৬.৩২	৪৭৫.৩৫	১৩.৪৯	৪৯৬.৫৭	১০.৭৩	৫৫১.২১	৯.৩৪
হায়ার পারচেজ	২২৫.১৭,	১৬.৬৬	২৬৮.১৩	২০.৫১	২৯০.৮৬	২১.৬৫	৫৩৮.৮০	২৬.১৮	৮৪৯.৬৮	৩০.৯৭	১০৬৬.৪০	৩০.২৭	১৪১৩.১৪	৩০.৫৩	১৮০৬.৫১	৩০.৬২
পারচেজ ও নেগোশিয়েশন	৯৭.৬৫	৭.২২	১২৬.১৮	৯.৬৫	১৩৮.৯০	১০.৩৪	১৬২.৩৯	৭.৮৯	১৩৩.৭০	৪.৮৭	১৩৮.৬১	৩.৯৩	১৮৬.৫২	৪.০৩	১৮০.১৩	৩.০৫
অন্যান্য	১৮.৩৫	৪.৩২	৬২.৯০	৪.৮১	৬২.৩৫	৪.৬৪	৭০.০৭	৩.৪০	৬৯.২২	২.৫৩	৯২.৩১	২.৬২	১৭০.৬২	৩.৬৯	২৩৭.৫৯	৪.০৩
মোট	৬৭৯.৭৫	১০০.০০	১৩০৭.৫৩	১০০.০০	১৩৪৩.৪৫	১০০.০০	২০৫৮.৪৬	১০০.০০	২৭৪৩.৭৩	১০০.০০	৩৫২৩.৭৭	১০০.০০	৪৬২৮.০৬	১০০.০০	৫৯০০.৭৫	১০০.০০

উৎস : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

(iv) পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ

আইবিবিএল যে সমস্ত পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে মুরাবাহা। বিগত পাঁচ বছর ধরে মোট বিনিয়োগের অর্ধেকেরও বেশী এই পদ্ধতিতেই করা হয়েছে। (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)। এর পরই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে হায়ার পারচেজ বা ইজারা বিল-বায়ই পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে গত চার বছরে ৩০% এর উর্দ্ধে রয়েছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে রায়-ই মুয়াজ্জাল পদ্ধতি। লক্ষ্যণীয়, মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই নগণ্য, ২০০৩ সালে মাত্র ০.০২%। অথচ পদ্ধতি হিসাবে এর গুরুত্ব আরও বেশী হওয়া উচিৎ ছিল। মুদারাবার অবস্থাও তাই। ১৯৯৯ হতে শুরু করে ২০০৩ পর্যন্ত কোন বছরেই এর পরিমাণ ০.২৫% এর উর্দ্ধে ওঠেনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিশ্বের অন্যত্র ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করছে আইবিবিএল এখনও সেসব পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্যে পদক্ষেপ নিতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ মুদারাবা, বায়-ই-সালাম, ইজারা ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(v) খাতভিত্তিক বিনিয়োগ

সারণী-৩এ প্রদত্ত আইবিবিএল-এর খাতওয়ারী বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিগত পাঁচ বছর ধরে শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছে আমানতের সিংহভাগ-গড়ে ৪০%। পক্ষান্তরে বাণিজ্যে বিনিয়োগ হয়েছে মোট বিনিয়োগের এক-তৃতীয়াংশ। সেই তুলনায় কৃষি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় সর্ব নিম্নে, গড়ে ৪%। এই অবস্থা মোটেই কাংখিত হতে পারে না। দেশের জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ এখনও আসে কৃষিখাত হতেই। মোট কর্মসংস্থানের বৃহৎ অংশ কৃষি খাতেই। অথচ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় সেই খাতটি তেমন গুরুত্ব পায়নি।

(vi) বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করে তুলতে সহায়তা করে থাকে। একই সঙ্গে নিজেদের উপার্জন বৃদ্ধিরও সুযোগ করে নেয়। আইবিবিএল এক্ষেত্রেও স্বীয় যোগ্যতা ও সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে। সারণী-৪ হতে বিগত আঠারো বছরের বৈদেশিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে ব্যাংকের সাফল্যের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। চিত্রটি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল। আমদানী ও রফতানী খাতে ব্যাংকের অংশ গ্রহণের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রেমিট্যান্সও ১৯৯০ এর পর হতে বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সারণীটি হতে আরও দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালে মোট বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে ব্যাংকের অগ্রগতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় + ৫২.৬৭% বেশী। অনুরূপভাবে ১৯৯৪ সালেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অগ্রগতির পরিমাণ ছিল +৫০.৪২%। রফতানীর ক্ষেত্রে ব্যাংক ১০০০ কোটি টাকার মাত্রা অতিক্রম করেছে ১৯৯৫ সালে। এরপর প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৬ সালে হ্রাস পায়। অবশ্য পরবর্তী বছরেই ব্যাংক তা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়।

সারণী-৪

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর বৈদেশিক বাণিজ্যে অগ্রগতি : ১৯৮৬-২০০৩

(কোটি টাকায়)

বছর	আমদানী	রফতানী	রেমিট্যান্স	মোট	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৮৬	১৮০.০৬	৬২.২৪	১১৭.২৭	৩৫৯.৫৭	-
১৯৮৭	১৫৭.৮৫	৯৭.১১	১৪২.৪৬	৩৯৭.৪২	+১০.৫৩
১৯৮৮	২০১.৫৩	১৩৪.৯৭	১১২.৫৪	৪৪৯.০৪	+১২.৯৯
১৯৮৯	৩৩৯.৪৯	১৫৪.৩৮	৯০.১৬	৫৮৪.০৩	+৩০.০৬
১৯৯০	৩৯১.৭৭	২৫৮.৮৩	১৩৩.৯৯	৭৮৪.৯৯	+৩৪.৪১
১৯৯১	৬২০.৪২	৩৯৬.৬৬	১৮১.৪১	১১৯৮.৪৮	+৫২.৬৭
১৯৯২	৮৭৭.৮৫	৪৯৪.৮৮	২০২.৮৬	১৫৭৫.৫৯	+৩১.৪৭
১৯৯৩	৮৬১.২৭	৫৮৪.১৬	২৪০.২৫	১৬৮৫.৬৮	+৬.৯৯
১৯৯৪	১৪৬২.৩৪	৭৭৯.০৪	২৯৪.৩০	২৫৩৫.৮৬	+৫০.৪২
১৯৯৫	২১২১.৮৩	১১০১.৫৭	২৪৪.৭২	৩৪৬৮.১২	+৩৬.৭৭
১৯৯৬	১৭৮৭.৪৮	১১৭৬.৬৪	৩৩২.৮৩	৩২৯৬.৯৫	-৪.৯৪
১৯৯৭	১৭৩৭.০০	১৪৪৬.৯৪	৪৮০.৬০	৩৬৬৪.৫৪	+১১.১৫
১৯৯৮	২০২৩.৮৩	১৪৮৯.৪৩	৬৩৬.০৬	৪১৪৯.৩২	+১৩.২২
১৯৯৯	২০৩৯.৬০	১৪৭৯.৮০	৮৪১.৫০	৪৩৬০.৯০	+৫.০৯
২০০০	২৫৩২.৭০	১৬৮৮.৯০	৭৬৪.৪০	৪৯৮৬.০০	+১৪.৩৩
২০০১	২৫৯০.৭০	১৬০৮.২০	৯৮৭.৯০	৫১৮৬.৮০	+৪.০২
২০০২	৩৩৭৮.৮০	১৬৬৭.৩০	১৪৬৭.০০	৬৫১৩.১০	+২৫.৫৮
২০০৩	৪৬২৩.৭০	২১৭৩.৮০	১৬৬৬.৮০	৮৪৬৪.৩০	+২৯.৯৫

উৎস : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:-এর বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

(vii) প্রকল্প সাফল্য

পূর্বেই বলা হয়েছে, আইবিবিএল স্বল্প পুঁজির লোকদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছে। এসব প্রকল্প গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের মুদারাবা আমানতের অর্থ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জনের সুযোগ হয়েছে, অন্যদিকে দেশে বিদ্যমান ব্যাপক বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র পরিবহন প্রকল্প, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প এসবের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প ও গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প ইতিমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

(viii) পল্লী উন্নয়ন স্কীম

পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, উদ্যোগী ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান ও গরীব কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আইবিবিএল ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ হতে পল্লী উন্নয়ন স্কীম চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি, রিকসা ভ্যানসহ বিভিন্ন গ্রামীণ পরিবহন, হস্তচালিত অগভীর নলকূপ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও পশুপালনসহ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক খাতে সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দেশের ১৮টি জেলায় ব্যাংকের ২০টি শাখার প্রতিটির দশ কিলোমিটার পরিসীমার মধ্যে এক বা একাধিক গ্রামকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরের পরিকল্পনা নিয়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই পরিসীমা ষোল কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। গ্রাম বাছাইয়ের সময় সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিম্ন আয়ের লোকের সংখ্যাধিক্য ও কৃষি/অকৃষিখাতের বিদ্যমানতাকে বিবেচনা করা হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বায়ই মুয়াজ্জাল ও হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতিই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

ডিসেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত দেশের ৫০টি জেলার ১২৬টি থানার ৩,৭০০টি গ্রামে কর্মসূচীটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। ক্রমান্বয়ে দেশের সকল এলাকাতেই স্কীমটি পরিব্যাপ্তি লাভ করবে বলে ব্যাংকের পরিকল্পনা রয়েছে। এই স্কীমের আওতায় ডিসেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত ৫,৫১৪টি কেন্দ্রে ২৬,০৯৩টি গ্রুপ তৈরী হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজারেরও বেশি। দেশের পল্লী এলাকায় কর্মরত অন্যান্য এনজিওর মতো আইবিবিএলও মহিলাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের মাধ্যমে পারিবারিক ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। তাই সদস্যদের মধ্যে মহিলারাই ৯৪%। এ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ২৯২.৩৬ কোটি টাকার বেশী। গৃহীত অর্থ পরিশোধের হারও খুবই সন্তোষজনক। অপরদিকে খেলাপী ঋণের পরিমাণ খুব নগণ্য-মাত্র ২%। অপরদিকে গ্রুপের সদস্যদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯.৮২ কোটি টাকা। অন্যান্য এনজিওর সাথে আইবিবিএল এর এই স্কীমের দুটি বড় পার্থক্য রয়েছেঃ (i) সদস্য/সদস্যাদের ইসলামী জীবনাদর্শ আচরণের জন্যে তাগিদ দেয় এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেয় এবং (ii) মঞ্জুরীকৃত অর্থের পুরোটাই সামগ্রী আকারে গ্রহীতা হাতে পেয়ে থাকে, তা থেকে নানা তহবিলের নামে অংশবিশেষ আগেই কেটে রাখা হয় না।

(ix) সামাজিক কল্যাণ

প্রতিষ্ঠার পরপরই আইবিবিএল তার প্রদেয় যাকাতের অর্থ এবং যেসব আয় সন্দেহজনক সেসবের সমন্বয়ে 'সাদাকাহ তহবিল' নামে একটি দাতব্য তহবিল গঠন করে। এই তহবিল হতে আর্ত-মানবতার সেবা এবং বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের

কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রমের পরিধির বিস্তৃতি ঘটলে ১৯৯১ সালের মে মাসে একে একটি ফাউণ্ডেশনে রূপান্তরিত করে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের' সৃষ্টি হয়। সেই থেকে এটি স্বতন্ত্র হিসাব ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে আসছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আর্তমানবতার সেবা, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা সম্প্রসারণ, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ক্রীড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের উৎসাহ দান এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন।

ফাউণ্ডেশনের আয়ের উৎস নিম্নরূপঃ

১. আইবিবিএল এর নিজস্ব যাকাত;
২. ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত যাকাত;
৩. ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত অনুদান;
৪. শরীয়াতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত নয় এমন আয়; এবং
৫. ফাউণ্ডেশনের নিজস্ব প্রকল্প থেকে আয়।

ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের কার্যক্রম বহুমুখী। সেগুলোকে কয়েকটি বড় গ্রুপে ভাগ করা যায়। যেমনঃ-

(ক) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমঃ এর মধ্যে রয়েছে ভিখারীর হাতকে কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত করার উদ্দেশ্যে রিক্সা, সেলাই মেশিন, হাঁস-মুরগী বিতরণ, গাভী পালন, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।

(খ) শিক্ষামূলক কার্যক্রমঃ অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আমাদের জনগোষ্ঠীকে বিশেষতঃ দরিদ্র জনসাধারণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ফাউণ্ডেশন তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা দান, ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন সাহায্য দান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

(গ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রমঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে ফাউণ্ডেশন দাতব্য চিকিৎসালয়ে সহায়তাদান কর্মসূচী, চিকিৎসার জন্যে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান, নলকূপ স্থাপন এবং স্যানিটারী পায়খানা নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে।

(ঘ) মানবিক সাহায্য দান কার্যক্রমঃ দুঃস্থ ব্যক্তি যারা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের মতো অপরিহার্য মৌলিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ তাদের তাৎক্ষণিক সম্ভাব্য সাহায্য করার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। ঋণগ্রস্তদের ঋণপরিশোধ, কন্যাদায়গ্রস্তদের

এককালীন সহায়তা প্রদান এবং ইয়াতীমখানা নির্মাণ ও পরিচালনাও এই কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

(ঙ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফাউণ্ডেশন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণকাজ পরিচালনা করে থাকে। নদী ভাঙ্গন ও অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য দুর্যোগেও ফাউণ্ডেশন ত্রাণ তৎপরতা গ্রহণ করে। অধিকন্তু ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলসহ বিভিন্ন সংস্থাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে ফাউণ্ডেশন।

(চ) দাওয়াহ কার্যক্রম: এই কর্মসূচীর আওতায় দেশের বুদ্ধিজীবী মহলসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গবেষণাধর্মী ইসলামী পত্র-পত্রিকা ও বই বিতরণ করা হয়। মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারে সহায়তাদান, জাতীয় পুনর্গঠন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার অনুদান প্রদান এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে দাওয়াহ কার্যক্রমের সম্প্রসারণে সাহায্য করাও এই কর্মসূচীর আওতাভূক্ত।

(ছ) বিশেষ প্রকল্প: ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কয়েকটি বিশেষ প্রকল্পও পরিচালিত হচ্ছে। যথা:

১. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ: মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত রোগীদের স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ঢাকাতে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকাতে আরও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে দিবা-রাত্রি জরুরী সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের সুযোগও ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া রাজশাহীতে ১৯৯৬ সালে এবং খুলনায় ১৯৯৯ সালে এবং ২০০১ সালে বরিশালে একই মানের আরও তিনটি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাতক্ষীরা, মানিকগঞ্জ ও রংপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কম্যুনিটি হাসপাতাল। পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরসমূহে এই সেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এরই পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যে রাজশাহীতে একটি পূর্ণাংগ মেডিক্যাল কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগেই এবং ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষে পাঠদান কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

২. ইসলামী ব্যাংক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট: বেকার সমস্যা সমাধান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঢাকায় দুটি, বগুড়া চট্টগ্রাম ও সিলেটে একটি করে বৃত্তিমূলক কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন। বাংলাদেশ সরকারের কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদনক্রমে এগুলো পরিচালিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে কম্পিউটার ট্রেনিং, সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স, ইলেকট্রোনিক্স, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল স্যুয়িং মেশিন অপারেশন, এয়ারকণ্ডিশনিং ও রেফ্রিজারেশান, মোটর ড্রাইভিং, রেডিও ও টেলিভিশন রিপেয়ারিং, পেইন্টিং প্রভৃতি ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এই ইনস্টিটিউটকে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত করার কর্মসূচী রয়েছে।

৩. মনোরমঃ মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্যে তাদের ঘরে তৈরি এমব্রয়ডারী করা ও নানা ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর আওতায় ইতিমধ্যে ঢাকায় একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিপণী কেন্দ্র চালু হয়েছে।

৪. বিবিধঃ এছাড়া ইসলামী আদর্শে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালে ঢাকায় 'ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল ও কলেজ' নামে একটি ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। একই মানের একটি বাংলা মাধ্যম প্রতিষ্ঠান ২০০০ সালের মধ্যে স্থাপনেরও উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া বিকলাঙ্গদের জন্যে ঢাকার কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক ফিজিওথেরাপী ও বিকলাঙ্গ পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জাতীয় ঐতিহ্য এবং ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত উন্নয়নকর্মীদের জন্যে 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। অধিকন্তু (১) ঢাকা ও রাজশাহীতে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, (২) কুরআন শরীফ শুদ্ধ পাঠ প্রশিক্ষণের জন্যে 'তালীমুল কুরআন প্রজেক্ট', (৩) ঢাকার মীরপুরে দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং (৪) মামলার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের আইনের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট'-এর মতো কর্মসূচীও ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়ে আসছে।

ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন ১৯৯২ সালে উপরোক্ত খাতসমূহে তার তহবিল হতে ব্যয় করেছে ১.০২ কোটি টাকা, ১৯৯৩ সালে ১.৯৪ কোটি টাকা, ১৯৯৪ সালে ২.৩৯ কোটি টাকা, ১৯৯৫ সালে ২.৫০ কোটি টাকা, ১৯৯৬ সালে ২.৬৮ কোটি টাকা, ১৯৯৭ সালে ৪.২৯ কোটি টাকা এবং ১৯৯৮ সালে ৫.৭৯ কোটি টাকা, ২০০০ সালে ২৯.৬০ কোটি টাকা, ২০০১ সালে ১০.০৫ কোটি টাকা, ২০০২ সালে ৭.৯২ কোটি টাকা এবং ২০০৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ১০.৬২ কোটি টাকা। এসব উদ্যোগ গ্রহণের ফলে গ্রাম পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিনামূল্যে চিকিৎসালাভের পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সমাজের দরিদ্র ও মন্দভাগ্য লোকদের জীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে দেশের সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আজও এ ধরনের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি।

(x) তথ্য ও সেবার আধুনিকায়ন

আইবিবিএল তথ্য ও সেবার সর্বোচ্চ মান বজায় ও উন্নয়নকল্পে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে পৃথক ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগ স্থাপন করেছে। সকল শাখাকে কম্পিউটার সজ্জিত করে Local Area Network (LAN) এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া প্রবর্তিত হয়েছে Integrated Messaging System (IMS)। বাংলাদেশে E-cash ও ATM Network এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও আইবিবিএল। ব্যাংক তার নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরী করেছে এবং ১৯৯৯ সাল থেকে সুইফটেরও (Society for Worldwide Inter-Bank Financial Telecommunication) সদস্য রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রধান অফিসে স্থাপিত হয়েছে Automated Time Attendance System (ATAS)। ব্যাংকের নানা ধরনের হিসাব ও প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকির জন্যে নিজস্ব সফটওয়ার তৈরীর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

(xi) ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এ্যান্ড রিসার্চ একাডেমী

আইবিবিএল একদল সুদক্ষ ও সুযোগ্য কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম শুরুর বছরেই প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এ্যান্ড রিসার্চ একাডেমী (IBTRA)। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। উপরন্তু প্রচলিত সুদী ব্যাংক হতে আগ্রহী ও দক্ষ ও সিনিয়র অফিসারদের রিক্রুট করতে হয় সঙ্গত কারণেই। একই সঙ্গে মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণরাও শিক্ষানবীশ অফিসার হিসাবে ব্যাংকে যোগ দিচ্ছে। রিক্রুটকৃত অফিসার ও কর্মীদের ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং বাণিজ্যনীতি ও কর্মকৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান একাডেমীর মূখ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিন্নধর্মী এই ব্যাংকের জন্যে যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ট্রেনিং কর্মসূচী, ওয়ার্কশপ, এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট কোর্স পরিচালনা ছাড়াও ঢাকাস্থ বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, মার্কেটিং এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামও একাডেমী পরিচালনা করে আসছে। সেই সাথে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী তৈরী ও গবেষণার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্যেও সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। একাডেমীটির নিজস্ব গবেষণা-প্রকাশনাও রয়েছে।

(xii) জনসংযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ

বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের কাছে আইবিবিএল-এর গৃহীত কর্মসূচী পৌঁছে দেওয়ার পাশপাশি সুদের কুফল ও এর মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠার পর হতেই ব্যাংকটি ব্যাপক জনসংযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। এই সব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বই-পুস্তিকা প্রকাশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন, ইফতার মাহফিল, সুধী সমাবেশ ও জার্নাল প্রকাশ।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর প্রথম প্রকাশিত বই *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?* দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এ পর্যন্ত বইটির দুইটি সংস্করণ (১৯৮৩ ও ১৯৮৪) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া জনগণকে যাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে প্রকাশিত হয়েছে *যাকাত কি ও কেন ?* পুস্তিকা (১৯৯২, ৬ষ্ঠ সং ২০০২) । ব্যাংক তার কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক ও সাফল্যের বিবরণ জানাবার জন্যে প্রকাশ করেছে *অগ্রগতির দুই বছর* (১৯৮৫), *ইসলামী ব্যাংকিং : সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত* (১৯৮৬), *ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প* (১৯৯৭), *অগ্রগতির আট বছর* (১৯৯১), *ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনঃ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম* (১৯৯২), এবং হাজীদের সুবিধার্থে *জিয়ারতে*

বায়তুল্লা (১৯৮৪, ৭ম সং ১৯৯৯), *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (১৯৯৬), *আদর্শ জীবন গড়ার প্রথম পাঠ* (১৯৯৮) এবং *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি* (২০০১) এবং *ইসলামী ব্যাংকিং : মাসায়েল ও ফতওয়া ১৯৮৩-২০০১* (২য় সং ২০০৩)। ইংরেজীতে প্রকাশ করেছে *Garments* (n.d.), *Investment and Trade Opportunities in Bangladesh* (1988), *Islamic Bank : On Road to Progress* (1992), *A Decade of Progress (1994), An Era of Progress* (1995), *Islami Bank Foundation : Welfare Programmes* (1992, 1994, 1999), *Rural Development Scheme* (1999), *Islami Bank: 16 Years of Progress* (1999), *Islami Bank : 18 Years of Progress* (2001) প্রভৃতি তথ্য ও চিত্রসমৃদ্ধ পুস্তিকা। এছাড়া ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার জন্যে প্রকাশ করে চলেছে সুদৃশ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ চাররঙা পরিচিতিপত্র। উপরন্তু *ইসলামী ব্যাংকিং* শীর্ষক একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও গবেষণাধর্মী জার্নাল, *Islami Bank Newsletter* এবং *ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা* নামে একটি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ হতে।

আইবিবিএল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্ন্তজাতিক সেমিনারেরও আয়োজন করেছে। এর মধ্যে 'ইসলামী ব্যাংক ও বীমা' (১৯৮৯), 'ইসলামী কমন মার্কেট' (১৯৯৩) এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামিক ইকোনমিকস্ রিসার্চ ব্যুরোর সাথে যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত Financial Management in an Islamic Perspective, 2004 খুবই সফল ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর সহযোগিতায় রাজধানী ছাড়াও দেশের বিভাগীয় ও প্রধান প্রধান জেলা শহরে কুড়িটিরও বেশী আঞ্চলিক সেমিনারের আয়োজন করেছে ১৯৯৩-১৯৯৫ সালে। জনাকীর্ণ এই সব সেমিনারে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ ওলামায়ে কেরাম ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সামাজিক কল্যাণমুখী দিকগুলো বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

প্রতি বছর বিশেষ গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন ছাড়াও পবিত্র মাহে রমজানে আইবিবিএল এর সকল শাখায় আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকর দিকগুলো তুলে ধরার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে জনমনে যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তারই ফলে ব্যাংকের শাখা বিস্তারের জন্যে গণদাবী উঠে। এজন্যেই ১৯৮৮ সালের ২৭টি শাখা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে পনের বছরের মধ্যে ২০০৩ সালে ১৪১-এ পৌঁচেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের এই জনসংযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর ফলেই দেশে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে সহজ হয়ে যায়। খুব অল্প দিনের ব্যবধানে দু-দুটি ইসলামী ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ এবং একটি পুরোপুরি সুদী ব্যাংকের রাতারাতি ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর (এক্সিম ব্যাংক) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

প্রতিষ্ঠা

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এআইবিএল) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮ই জুন, ১৯৯৫। তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫। প্রতিষ্ঠার পর পরই ব্যাংকটি দেশের জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। ব্যাংকটি যাত্রা শুরু করে ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে। ২০০৩ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ কোটি ৬০ লাখ টাকার পৌঁচেছে।

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৬। এরা সকলেই বাংলাদেশী। ইসলামী শরীয়াহ পালনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠার সময় হতেই সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি শরীয়াহ কাউন্সিলও গঠিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন দেশের পাঁচজন প্রখ্যাত ফকীহ /আলিম এবং একজন করে ব্যাংকার ও আইনজ্ঞ।

কার্যপদ্ধতি

আইবিবিএল যেসব পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে থাকে এই ব্যাংকটিও সেসব পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এছাড়াও মাসিক মুনাফা প্রদানভিত্তিক পাঁচ বছর মেয়াদী মুদারাবা আমানত, এককালীন হজ্জ আমানত, মাসিক জমাভিত্তিক মেয়াদী সঞ্চয় আমানত ও বিবাহ সঞ্চয় আমানত নামে আরও কয়েক ধরনের আমানত গ্রহণ করে থাকে।

এআইবিএল তার মূলধন ও আমানতের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে তার পূর্বসূরী আইবিবিএল অনুসৃত ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে থাকে। উপরন্তু আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডসহ অর্থনীতির সকল দিককে আওতায় আনার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন স্কীম গ্রহণ করে চলেছে। সীমিত আয়ের লোক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অগ্রগতির উদ্দেশ্যে ব্যাংক নীচের প্রকল্পসমূহ চালু করেছে :

১) কাংখিত সামগ্রী বিনিয়োগ
২) ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ
৩) পরিবহণ বিনিয়োগ
৪) বিশেষ পল্লী বিনিয়োগ

এসব বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যাংকটি এদেশের মাদরাসা শিক্ষিতদের, মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের, দ্বীনদার এবং আলেমদের জন্যে বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এরা অবহেলিত ও অনাদৃত। এদেশে কর্মরত এনজিও গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থাগুলো মাদরাসাশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর

প্রতি কোন দিন নজর দেয়নি। এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে এআইবিএল মাদরাসা শিক্ষিত লোকদের জন্যে সুবিধাজনক শর্তে বিশেষ বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

সাফল্য

এআইবিএলের কার্যকাল আট বছরের কিছু বেশী। এত স্বল্প সময় কোন ব্যাংকেরই কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই এখানে শুধু মাত্র তার কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক. শাখা বৃদ্ধি ও আমানত সংগ্রহ

সারণী-৫ হতে দেখা যাবে প্রতিষ্ঠার বছরেই ব্যাংক পাঁচটি শাখা খুলতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তী বছরে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১০০%। তার পরবর্তী বছরেও অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের প্রবৃদ্ধির হার একই ছিল- শাখার সংখ্যা ১০ হতে ২০-এ উন্নীত হয়েছে। এই সংখ্যা ১৯৯৮ সালে ৩০-এ পৌঁচেছে। প্রতিকূল পরিবেশে ভিন্নধর্মী আদর্শের একটা ব্যাংকের এই দ্রুতগতি শাখা বিস্তার নিঃসন্দেহে তার শক্তিমত্তা ও সাফল্যের পরিচায়ক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম চার বছরে আইবিবিএল-এর শাখার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮। অবশ্য দীর্ঘ পনের বছর ধরে আইবিবিএলের ব্যাপক জনসংযোগ, সাফল্য ও প্রেষণাই যে এআইবিএল-এর এই সম্প্রসারণের ভিত রচনা করে রেখেছিল তা স্বীকার করতেই হবে। ১৯৯৫ সালে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ছিল ২০.১৪ কোটি টাকা। ২০০৩ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬৪.৩২ কোটি টাকায় পৌঁচেছে।

সারণী-৫

আল্-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর আমানত ও বিনিয়োগের চিত্র : ১৯৯৫-২০০৩

(কোটি টাকায়)

বছর	শাখার সংখ্যা	আমানতের পরিমাণ	শাখাপিছু আমানত	বিনিয়োগের পরিমাণ	শাখাপিছু বিনিয়োগ	মোট আয়	শাখাপিছু আয়	মোট ব্যয়	শাখাপিছু ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯৫	৫	২০.১৪	৪.০২	১.২৪	০.২৪	০.১৩	০.০২	০.৩৩	০.০৬
১৯৯৬	১০	১০৩.৫৬	১০.৩৫	৭৭.৯২	৭.৭৯	৫.০৯	০.৫০	৪.৬২	০.৪৬
১৯৯৭	২০	২২৫.৬৬	১১.২৮	১৭৪.৫৫	৮.৭৩	১৯.৬২	০.৯৮	১২.৮৯	০.৬৪
১৯৯৮	৩০	৪৫৩.৪৭	১৫.১২	২২৫.৯৮	৭.৫৩	৩২.২৯	১.০৭	২৪.০৯	০.৮০
১৯৯৯	৩৫	৬৪১.৫৮	১৮.৩৩	৩৩০.৬৪	৯.৪৭	৫৩.৪৭	১.৫৩	৪৬.৪৩	১.৩৩
২০০০	৩৭	৭৩০.৭৫	১৯.৭৫	৩৭২.৮৪	১০.০৭	৭৫.২২	২.০৩	৫৯.৮৪	১.৬১
২০০১	৪০	৭৮৭.৯১	১৯.৬৯	৫০৭.৯২	১২.৬৯	৮০.০৩	২.০০	৬৭.৮৮	১.৬৯
২০০২	৪০	৭১৬.৩০	১৭.৯০	৬৪০.৩৬	১৬.০০	৮৩.৫৪	২.০৮	৬৭.১৪	১.৬৭
২০০৩	৪০	৮৬৪.৩২	২১.৬০	৭৫৭.১৫	১৮.৯২	৯৮.৭৭	২.৪৬	৬৮.১৩	১.৭০

উৎস : আল্-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

খ. বিনিয়োগ

শুরুর বছরে ছয় মাসেরও কম সময়ে এআইবিএল ১.২৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তী বছরে এই পরিমাণ লাফিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭.৯২ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ১৯৯৭ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৪.৫৫ কোটি টাকায় (বৃদ্ধির হার ছিল +১২৪%) এবং ১৯৯৮-এ ২২৫.৯৮ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার ছিল + ২৯.৪৬%। ২০০৩ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭৫৭.১৫ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে শাখাপিছু গড় বিনিয়োগ ছিল ১৮.৯২ কোটি টাকা। (সারণী-৫ দ্রষ্টব্য)।

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য

বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়নের ক্ষেত্রে এআইবিএলের অগ্রগতি প্রশংসনীয়। তবে আমদানী বাণিজ্যে অর্থায়নের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকটির আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১০৩.০২ কোটি টাকা, ১৯৯৭ সালে ৩২২.২৪ কোটি টাকা এবং ১৯৯৮ সালে ৫২৭.৯৫ কোটি টাকা (বৃদ্ধির হার যথাক্রমে +২১২.৭৯% ও +৬৩.৮৩%)। সেই তুলনায় রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ এই একই বছরগুলোয় ছিল যথাক্রমে ৮.৩৬ কোটি টাকা, ৫৯.২১ কোটি টাকা এবং ১১০.৩০ কোটি টাকা (বৃদ্ধির হার যথাক্রমে +৬০৮.২৫% ও +৮৬.২৮%) ২০০৩ সালে ব্যাংকটির আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭৬৯.৮২ কোটি টাকা এবং রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩০৭.৫৫ কোটি টাকা।

ঘ. আয় ও মুনাফা

ব্যাংকটির আয় বৃদ্ধি পেয়েছে অবিশ্বাস্য দ্রুত হারে। ১৯৯৬ সালে যেখানে ব্যাংকের আয় ছিল মাত্র ৫.০৯ কোটি টাকা, ১৯৯৭ সালেই তা বেড়ে ১৯.৬২ কোটি টাকায় পৌছায়। ১৯৯৮ সালে তা পূর্ববর্তী বছরের প্রায় দ্বিগুণ হয়, ৩২.২৯ কোটি টাকায় পৌছায়। এক্ষেত্রে শাখাপিছু আয় ছিল ১৯৯৬ সালে ৫০ লক্ষ টাকা। এই আয়ই ২০০৩ সালে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকায় পৌছায়। লক্ষ্যণীয়, প্রথম দিকে শাখা পিছু ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সমান দ্রুত তালে। ১৯৯৬ সালে শাখাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ টাকা। এই অংকই ২০০৩ এ এসে দাঁড়িয়েছে শাখাপিছু ১.৭০ কোটি টাকা (সারণী-৫ দ্রষ্টব্য)।

ব্যাংকটি ১৯৯৫ সালে ৬ মাসের কার্যকালে ২০ লক্ষ টাকা লোকসান দিলেও পরবর্তী বছর হতেই মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। এর পরিমাণ অবশ্য স্বল্প ছিল, মাত্র ৪৭ লক্ষ টাকা। ১৯৯৭ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.৭৩ কোটি টাকা এবং ২০০৩ সালে করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০.৬৩ কোটি টাকা। ২০০১ ও ২০০২ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩.৯৪ কোটি টাকা ও ১৬.৩৯ কোটি টাকা।

ঙ. প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা

জনশক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা অপরিহার্য। যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি তার প্রাণশক্তি রূপে কাজ করে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকটি নিজস্ব ট্রেনিং একাডেমীতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু ১৯৯৮-সাল হতে শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠের উদ্দেশ্যে কুরআন শিক্ষা অধিবেশন শুরু করেছে। এসব প্রশিক্ষণ ও প্রেষণামূলক কার্যক্রমের ফলে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের আচার-আচরণে পরিবর্তন এসেছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে বলে দাবী করেছেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ (বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৮, পৃ. ২২)।

প্রসঙ্গতঃ জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঘোষিত নীতি উল্লেখের দাবী রাখে। এই ব্যাংকে অফিসার হতে শুরু করে সকল পর্যায়ে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষিতদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান এক অনুষ্ঠানে বলেছেন-"মাদরাসা শিক্ষিতদের দ্বারা ব্যাংক চালনাকে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি" (*দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ অক্টোবর ১৯৯৯)। নিঃসন্দেহে এদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ এক নতুন মাত্রা।

চ. অন্যান্য কার্যক্রম

সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্যে এআইবিএল একটি ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। যাকাত এবং যে সন্দেহজনক আয় ব্যাংক মুনাফায় গ্রহণ করতে পারে না সেই অর্থ দিয়ে এটি পরিচালিত হয়। এর আওতায় ১৯৯৯ সালে ঢাকায় একটি সমৃদ্ধ আধুনিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ১৯৯৯ সালেই 'আল-আরাফাহ ইংলিশ্ মিডিয়াম মাদরাসা' স্থাপন করে আধুনিক শিক্ষার সাথে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উপরন্তু ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধ তৈরীর প্রতি জোর দেওয়ার কর্মসূচীর আওতায় ১০৮৪ কপি *তরজমানুল কুরআন* বিনামূল্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় বিতরণ করেছে।

৪. সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড

প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশে ইসলামী পদ্ধতির চতুর্থ ব্যাংক হলো সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল)। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২২ নভেম্বর, ১৯৯৫। ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ২৬.০০ কোটি টাকা। ব্যাংকটির ৩৮ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৭ জন বিদেশী রয়েছে।

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

এর বোর্ড অব ডিরেক্টরসের সদস্য সংখ্যা ২৭। এদের মধ্যে ৩ জন বিদেশী। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের মতো এই ব্যাংকেরও একটা শরীয়াহ বোর্ডে রয়েছে। এগারো সদস্যবিশিষ্ট এই শরীয়াহবোর্ডে রয়েছেন ছয়জন ফকীহ/আলিম, একজন ব্যাংকার, একজন আইনজ্ঞ ও দুজন অর্থনীতিবিদ।

কার্যপদ্ধতি

আইবিবিএল যেসব পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ করে থাকে এই ব্যাংকও সেসব পদ্ধতি অনসরণ করার পাশাপাশি দু-একটি অপ্রচলিত নতুন পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছে। সেসবের মধ্যে ক্যাশ ওয়াফক্ ফান্ড উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য ব্যাংক হতে এসআইবিএল নিজেকে ভিন্নধর্মী বলে দাবী করে। এজন্যে এর কর্মপদ্ধতি ও কর্মপরিধিও অধিকতর বিস্তৃত হওয়ার কথা। তবে সময়ই বলে দেবে এর প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি কতখানি সফলতা অর্জনে সক্ষম হবে। ব্যাংকটি ত্রিখাত মডেলের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলো হলো: (ক) আনুষ্ঠানিক (Formal) (খ) অনানুষ্ঠানিক (Non-formal) এবং (গ) স্বেচ্ছামূলক (Voluntary)।

আনুষ্ঠানিক খাত: এ খাতের আওতায় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের অনুরূপ সকল সাধারণ সেবা প্রদান করা হয়। এ খাতে সৃষ্ট 'সামাজিক উদ্বৃত্ত' দুঃস্থ মানুষের কল্যাণের জন্যে ব্যয়িত হবে। ফলে খাতটির 'মানবিকীকরণ' ঘটবে বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করেন।

অনানুষ্ঠানিক খাত: এ খাতে ব্যাংক কর্পোরেট বহির্ভূত কার্যক্রমে অর্থায়ন করবে। তবে এক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে হবে সেগুলো হলো: (১) সহজেই প্রবেশে সক্ষম, (২) স্থানীয় সম্পদের উপর নির্ভরশীল কর্মকান্ড, (৩) ক্ষুদ্রায়তন কর্মপরিধি, (৪) শ্রমনিবিড় উৎপাদন কৌশল, (৫) অনানুষ্ঠানিক স্কুলের বাইরে অর্জিত দক্ষতা এবং (৬) অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতামূলক বাজার। বিশেষ করে শহর ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র পরিবারসমূহের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচীর ফলে এখাতের প্রকৃতই 'সামাজিকীকরণ' ঘটবে বলে প্রত্যাশা করেন এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

স্বেচ্ছামূলক খাত : এ খাতের আওতায় রয়েছে ওয়াফক ও মসজিদসমূহের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, উত্তরাধিকার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন দাতব্য ট্রাষ্ট ও সংস্থা এবং অলাভজনক ফাউণ্ডেশনসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, অমুসলিমদের কল্যাণের জন্যে তহবিল গঠন প্রভৃতি কার্যক্রম। এসব উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংক গোটা খাতটির 'আর্থিকীকরণ' করতে চায়।

উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিক খাতকে মানবিকীকরণের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী এ্যালাউন্স স্কীম ও যৌতুকমুক্ত নববিবাহিত দম্পতিকে বিশেষ সুবিধাজনক হারে স্থায়ী ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে অর্থায়ন, অনানুষ্ঠানিক খাতের সামাজিকীকরণের উদ্দেশ্যে আইএলও-র সহযোগিতায় টোকাইদের মধ্যে থেকে এগিয়ে আসা কিশোরদের জন্যে 'পরিবেশ বন্ধুসুলভ ব্যবসায় কর্মসূচী' গ্রহণ এবং স্বেচ্ছামূলক খাতের আর্থিকীকরণ তথা সমাজে কল্যাণমুখী কর্মধারা জোরদার করার উদ্দেশ্যে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট (যা ব্যবহারের ৩২টি খাত রয়েছে) প্রবর্তন সন্দেহাতীতভাবে ব্যাংকটির ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। সত্যিকার ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশের অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে এগিয়ে আসতে পারে।

ক্যাশ ওয়াকফের অর্থ হলো সমাজের বিত্তশালী তথা সচ্ছল জনগোষ্ঠী তাদের সঞ্চয়ের একটা অংশ দিয়ে এই নামেই একটা সার্টিফিকেট কিনবে যার আয় ওয়াকফ সম্পত্তির আয়ের মতোই ধর্মীয়, শিক্ষামূলক ও সামাজিক সেবামূলক নানা ধরনের মহৎ কাজে ব্যবহৃত হবে। এ উদ্যোগ গ্রহণের পিছনে ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সঞ্চয় আহরণ করে তা মূলধনে রূপান্তরের মাধ্যমে তা থেকে অর্জিত আয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে ব্যয় করতে বিত্তশালীদের উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করা। এজন্যেই ব্যাংকের প্রধান শ্লোগান হলো-'দরদী সমাজ গঠনে সমবেত অংশ গ্রহণ'।

সাফল্য

এসআইবিএলের কার্যকাল আট বছর পূর্ণ হয়েছে। এত স্বল্প সময়ের কার্যক্রমের ভিত্তিতে এর বিশদ মূল্যায়ন অর্থাৎ সাফল্য ও ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই শুধু মাত্র কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক. শাখা বৃদ্ধি ও আমানত সংগ্রহ: সারণী-৬ হতে দেখা যাবে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটির শাখা পাঁচটিতেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য ১৯৯৮ সালে ব্যাংক নতুন পাঁচটি শাখা খুলতে সমর্থ হয়েছে। ফলে শাখা সংখ্যা ১০ এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪-এ। ১৯৯৬ সালের ৪১.৭৮ কোটি টাকার আমানত ১৯৯৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪.৫৫ কোটি টাকায় পৌঁচেছে (বৃদ্ধির হার + ৬৪.৪৯%)। পরবর্তী বছরে বৃদ্ধির পরিমান ছিল আরও সন্তোষজনক, ২০২.৯০ কোটি টাকা (বৃদ্ধির হার + ২১৪.৩২%)। এর পর ক্রমাগত আমানত বেড়েছে এবং ২০০৩ সালে আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৯৭০.৯৩ কোটি টাকা।

খ. বিনিয়োগ: এসআইবিএল ১৯৯৬ সালে ২০.৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগে সমর্থ হয়। পরবর্তী বছরে এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ছিল +৭৮.৫২%। বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৯৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৭.১৪ কোটি টাকায়। ২০০৩ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রথমবারের মতো এক হাজার কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করে। এ বছর শাখাপিছু বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪১.৯১ কোটি টাকা (সারণী-৬ দ্রষ্টব্য)।

সারণী-৬

সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ-এর আমানত ও বিনিয়োগের চিত্র : ১৯৯৫-২০০৩

(কোটি টাকায়)

বছর	শাখার সংখ্যা	আমানতের পরিমাণ	শাখাপিছু আমানত	বিনিয়োগের পরিমাণ	শাখাপিছু বিনিয়োগ	মোট আয়	শাখাপিছু আয়	মোট ব্যয়	শাখাপিছু ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৯৫	১	১২.৪২	১২.৪২	০.০২	০.০২	০.১৭	০.১৭	০.৬২	০.৬১
১৯৯৬	৫	৪১.৭৮	৮.৩৫	২০.৬৩	৪.১২	১.৯২	০.৩৮	৩.৮২	০.৭৬
১৯৯৭	৫	৬৪.৫৫	১২.৯১	৩৬.৮৩	৭.৩৬	৫.১৩	১.০২	৫.৬৮	১.১৩
১৯৯৮	১০	২০২.৯০	২০.২৯	১১৭.১৪	১১.৭১	১৭.৩৯	১.৭৩	১৩.৪৭	১.৩৪
১৯৯৯	১২	৩৮২.৬৬	৩১.৮৮	২১৬.৪৬	১৮.০৪	১৩.২২	১.১০	৫.৮২	০.৪৮
২০০০	১৪	৪৮৬.৩২	৩৪.৭৩	৩৫২.২২	২৫.১৫	১৮.২৪	১.৩০	৭.৬৭	০.৫৪
২০০১	১৫	১০৫৬.৯৭	৭০.৪৬	৫৪৯.৯২	৩৬.৬৬	৩৯.৮৭	২.৬৫	৯.৬৭	০.৬৪
২০০২	১৯	১৫১৪.১৩	৭৯.৬৯	৭৫০.৪০	৩৯.৪৯	৫৪.১৯	২.৮৫	১২.৯১	০.৬৭
২০০৩	২৪	১৯৭০.৯৩	৮২.১২	১০০৫.৯১	৪১.৯১	৬৯.৪৮	২.৮৯	১৯.৪৩	০.৮১

উৎস : সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ এর বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ।

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য: বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকটির সাফল্য দেশে ইসলামী পদ্ধতির অন্যান্য ব্যাংকের মতোই। এই ব্যাংকও আমদানী বাণিজ্যের চেয়ে রপ্তানী বাণিজ্যে অনেক পিছিয়ে রয়েছে । ১৯৯৭ সালে ব্যাংকের আমদানী বাণিজ্যে অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ৫৩.৪৪ কোটি টাকা, ১৯৯৮ সালে ১৩৬.৪৩ কোটি টাকা এবং ১৯৯৯ সালে ১৭১.৮৬ কোটি টাকা সেই তুলনায় রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়নের পরিমাণ ঐ একই বছরগুলোতে ছিল যথাক্রমে ৩.৮৬ কোটি, ৪.২৯ কোটি টাকা এবং ১৩.৯৮ কোটি টাকা। ২০০২ ও ২০০৩ সালে এই পরিমাণ ছিল আমদানীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১১১২.১৮ কোটি ও ১৪৯০.৮৯ কোটি টাকা এবং রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ২২৮.৭৬ কোটি টাকা ও ৪০৩.৫৯ কোটি টাকা।

ঘ. আয় ও মুনাফা: ব্যাংকটির আয়ের সাথে ব্যয় যেন পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬ সালে ব্যাংকের আয় যেখানে ছিল ১.৯২ কোটি টাকা সেখানে ব্যয় ৩.৮২ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। পরবর্তী বছরেও ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের মাত্রাকে অতিক্রম করে গেছে। ব্যাংকটি প্রথম মুনাফার মুখ দেখে ১৯৯৮ সালে। এ বছরে করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ৩.৯২ কোটি টাকা। কিন্তু পূর্ববর্তী বছরসমূহের লোকসান পূরণ, কর প্রদান, স্ট্যাটুটরী সঞ্চিতি ইত্যাদির জন্যে বরাদ্দ রাখার ফলে শেয়ার হোল্ডারদের কোন ডিভিডেন্ড দেওয়া সম্ভব হয়নি। ২০০৩ সালে ব্যাংকের আয় দাঁড়ায় ৬৯.৪৮ কোটি টাকা এবং ব্যয় দাঁড়ায় ১৯.৪৩ কোটি টাকা। এ বছরে করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ৫০.০৫ কোটি টাকা।

ঙ. প্রশিক্ষণ: অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের মতো এসআইবিএলও তার জনশক্তির মান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। শাখার সংখ্যা কম হেতু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা কম হওয়ায় ব্যাংকের প্রধান অফিসেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

৫. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সমস্যা

ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকগুলোর প্রসার সম্পর্কে দেশবাসী যতখানি আগ্রহান্বিত ও উদগ্রীব ছিল বাস্তবে তা পূরণ হয়নি। অবশ্য আইবিবিএল ইতিমধ্যেই দেশের সেরা ব্যাংক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। তারপরও বলতেই হবে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকিং এদেশে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে, নানা রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে। এজন্যে যে সব কারণ দায়ী তার কিছু ব্যাংকের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা, কিছু দেশে বিদ্যমান আইন কাঠামো, প্রশাসন ব্যবস্থা এবং জনগণের মানসিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট। নীচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রথম, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাংকগুলো সীমিত কতকগুলো ক্ষেত্রেই শুধু বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি খুবই কম কিন্তু মুনাফা প্রাপ্তি নিশ্চিত। ফলে অর্থনীতির অন্যান্য খাত অবহেলিত ও উপেক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু বিনিয়োগের অন্যান্য যেসব ইসলামী পদ্ধতি রয়েছে, বিশেষতঃ ইসলামী অর্থনীতির প্রাণশক্তি মুদারাবা ও মুশারাকার কোন চর্চাই হচ্ছে না।

দ্বিতীয়, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের অসততা ও মুনাফা গোপন করার প্রবণতার কারণে ব্যাংক সঠিক হিসাব পায় না। ফলে বাৎসরিক ঘোষিত মুনাফার হারও স্বভাবতঃই কম হয়। অপরদিকে যারা সৎ-অসৎ উপায় নির্বিশেষে মুনাফা অর্জনকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় তারাও ইসলামী শরীয়াহর কড়াকড়ি অনুশাসনের আওতায় আসতে চায় না।

তৃতীয়, বিনিয়োগের জন্যে অর্থ গ্রহণের পর ঐ অর্থ পরিশোধে গ্রহীতাগণ নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকসমূহ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করে ঐ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। কিন্তু শরীয়াহর নিষেধের কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো এই পদক্ষেপ নিতে পারে না। এজন্যে জরিমানা আদায় করলেও তাতে শরীয়াহর অনুমোদন না থাকায় ব্যাংক তা নিজস্ব আয় হিসাবে দেখাতে পারে না। ফলে ঐ অর্থ চলে যায় সাদাকাহ তহবিলে।

চতুর্থ, ইসলামী ব্যাংকগুলো নিয়মিত যাকাত আদায় করে থাকে। এর পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। এই অর্থ জনকল্যাণেই ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু সুদী ব্যাংকসমূহকে যাকাত দিতে হয় না। তারা বরং এর চেয়ে অনেক কম পরিমাণ অর্থ মাঝে-মধ্যে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণমূলক কর্মকাণ্ডে দান করে যেমন সুনাম অর্জন করে তেমনি ঐ অর্থ খরচ হিসাবে দেখিয়ে আয়কর মওকুফের সুবিধা পায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো যাকাত প্রদান করলেও এজন্যে কর মওকুফের কোন সুবিধা পায় না। অথচ তাদের এই সুবিধা পাওয়া উচিত ছিল যুক্তিসংগতভাবেই।

পঞ্চম, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংএর জন্যে এখনও উপযুক্ত ও পৃথক আইন কাঠামো তৈরী হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকিং এ্যাক্ট ১৯৯১ ও কোম্পানী আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী এদেশের ব্যাংক সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বয়স তিন দশক পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে আজও ইসলামী শরীয়াহ আইন তৈরী হয়নি। ফলে প্রতি পদে তাকে বাধাগ্রস্ত হতে হচ্ছে।

ষষ্ঠ, ইসলামী ব্যাংকের জন্যে এখনও দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাব প্রকট। প্রাথমিক পর্যায়ে আইবিবিএলকে অন্যান্য সুদী ব্যাংক হতে দক্ষ জনশক্তি সংগ্রহ করে কাজ শুরু করতে হয়েছিল। তাদেরকে অবশ্য ইলসামী ব্যাংকিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর শাখা সম্প্রসারণের জন্যে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উদ্বুদ্ধ জনশক্তির অভাব প্রধান অন্তরায় বলে স্বীকৃত।

সপ্তম, ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনও পুরোপুরি ইসলামী পদ্ধতিতে তাদের হিসাব পরিচালনা করতে পারছে না। শরীয়াহ্ কাউন্সিল বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে এ্যাক্রুয়াল পদ্ধতিতেই হিসাব রাখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়-দায়িত্বও কম নয়। কিন্তু তারাও এ ব্যাপারে যথোচিত-দিক নির্দেশনা প্রদান করছে না।

অষ্টম, এদেশের সমাজ জীবন এখন এক সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক পরিচালনা এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। বিশ্বাস সততা আমানতদারী ওয়াদা রক্ষা ও সময়ানুবর্তিতা নিঃসন্দেহে যেকোন ব্যবসায় ও কার্যক্রমের প্রাণশক্তি। আমাদের সমাজে এখন এসবের নিদারুণ অভাব। উপরন্তু দাপটের সাথে বিদ্যমান দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, চাঁদাবাজী, দীর্ঘসূত্রীতা, স্বজনপ্রিয়তা ও রাজনৈতিক জিঘাংসা। এর অবসান না হলে সঠিক মানে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা এক দুরূহ কাজ।

নবম, ইসলামী ব্যাংকিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের মান উন্নয়ন। এদেশের জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ পল্লীবাসী, কৃষিজীবি এবং একই সঙ্গে দরিদ্রও । পরিণাম ফল যাই হোক না কেন কৃষি ব্যাংকসহ সুদী ব্যাংকগুলো কৃষিঋণের ব্যবস্থা করে কৃষকদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। অথচ দরিদ্র কৃষকদের বিনিযোগ সুবিধা প্রদানের জন্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনও কার্যকর কোন বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেনি। ফলে গ্রামীণ জনগণ তথা দেশের কৃষককুলের জীবনের যেমন গুণগত পরিবর্তনের সুযোগ হচ্ছে না তেমনি তাদের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রসার ঘটেনি।

দশম, ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনও পর্যন্ত দেশের পল্লী এলাকায় কোন শাখা প্রতিষ্ঠা করেনি। বেসরকারী সুদী ব্যাংকগুলোর মত এরাও মূলতঃ শহর এলাকাতেই শাখা সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ রেখেছে। এ অবস্থা আদৌ কাঙ্খিত হতে পারে না। ইসলামী

ব্যাংকিংকে অবশ্যই গণমুখী হতে হবে। এক্ষেত্রে দুটো বাধা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথম, ব্যাংকের জনশক্তি গ্রামে থাকতে অনিচ্ছুক। কারণ গ্রামাঞ্চলে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব। দ্বিতীয়, শহরের তুলনায় পল্লীতে কম আয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরতদের মনে রাখা উচিৎ তারা এখানে শুধু চাকুরীই করছে না, তাদের কার্যক্রম ইবাদাতের শামিল। ইসলামী ব্যাংকগুলোর জনশক্তির কাছ থেকে এদেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ কিছুটা আরাম-আয়েশের কুরবানী আশা করতে পারে বৈ কি। একই সাথে শুধু মুনাফা অর্জনই একটা কল্যাণমুখী ব্যাংকিং-এর মূখ্য কাম্য হতে পারে না। মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কল্যাণ ও গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ততাকেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিৎ।

একাদশ, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণের প্রবল বিরোধিতা করছে এদেশের সরকারই। এজন্যেই ইসলামী ব্যাংকগুলো যতগুলো নতুন শাখা স্থাপনের অনুমতির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন জানায় বহু দেন-দরবারের পর তার এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেকের অনুমোদন পায়। ফলে ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের শাখা সম্প্রসারণ করতে পারছে না। এর কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে। এদেশের সুদী ব্যাংকগুলো সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে জনমনে ইসলামী ব্যাংকিং তথা ইসলামী অর্থনীতি যে আসলেই প্রগতিশীল ও কল্যাণময় অর্থনীতি বাস্তবায়নে সক্ষম তাই-ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদেশে মুখে ইসলাম পছন্দ অথচ বাস্তবে প্রচন্ড ইসলামী জীবনাদর্শবিরোধী সরকারগুলো কখনই ইসলামের কল্যাণকর দিক বাস্তবায়নে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেনি।

উপসংহার

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় বাংলাদেশে ২০০০ সালের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্মপদ্ধতি ও সাফল্য সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এত অল্প সময় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি ব্যাংকিং পদ্ধতির কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্যে আদৌ যথেষ্ট নয়। তাকে আরও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে, পার হতে হবে অনেক চড়াই-উৎরাই। তবু একথা বলা বাঞ্ছনীয় যে, অর্থনীতির মাত্র একটি বা দুটি খাতকে ক্রমাগত প্রাধান্য দিয়ে গেলে বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পদশালী অংশকেই বরাবর সুযোগ দিতে থাকলে দীর্ঘকালীন সামষ্টিক উন্নতি ও কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন আদৌ সম্ভব নয়। এজন্যে চাই যুগপৎ সমাজের সকল শ্রেণীর বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর ভাগ্য উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি অর্থনীতির সকল খাতেই বিচরণ করার যোগ্যতা অর্জন। এজন্যে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকগুলোকে আরও গণমুখী, ব্যাপকভিত্তিক ও শেকড় সন্ধানী হতে হবে। তার বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে হতে হবে বহুধা বিস্তৃত, সহযোগিতাধর্মী ও দরিদ্রদের জন্যে প্রকৃতই উপযোগী অর্থাৎ, আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থানমূলক। তাহলেই নিশ্চিত হবে এদেশের জনগণের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক

প্রতিষ্ঠা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে ইসলামী ব্যাংকটি বিগত ত্রিশ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে, যার সক্রিয় সহযোগিতায় আজকের মুসলিম দেশগুলোর অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি সাবলীল রয়েছে এবং যার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছে সেই ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank বা আইডিবি) সম্পর্কে এদেশে আলোচনা হয়েছে অতি অল্পই। মূলতঃ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো, যার অধিকাংশই মুসলিম, তাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে যে কয়টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর আজ খুব বেশী নির্ভরশীল ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক তাদের অন্যতম। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর (জিলক্বদ, ১৩৯৩) মাসে সউদী আরবের জেদ্দায় মুসলিম দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে ইসলামী মডেলের এই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ১৯৭৫ সলের জুলাই মাসে জেদ্দাতেই প্রস্তাবিত ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলী বা বোর্ড অব গভর্নরসের উদ্বোধনী সভায় মুসলিম উম্মাহর আশা-আকাংখার প্রতীক এই ব্যাংকের উদ্বোধন করা হয়। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকটি কাজ শুরু করে ১৫ শাওয়াল, ১৩৯৫ (২০ অক্টোবর, ১৯৭৫)।

উদ্দেশ্য

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

১. সুদবিহীন লেন-দেন, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য পরিচালনা;
২. সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী প্রকল্পসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
৩. সদস্য দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন;
৪. সদস্য দেশগুলোর সামাজিক উন্নয়নে অংশ গ্রহণ; এবং
৫. দেশ নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে যে কোন শরীয়তসম্মত প্রয়াসে সহযোগিতা দান।

ব্যাংকের প্রধান অফিস সউদী আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। যেকোন সদস্য দেশে আঞ্চলিক অফিস খুলবার জন্যে ব্যাংককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রধান অফিসের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Islamic Research and Training Institute)। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাংকের তৎপরতা অব্যাহত রাখা ও পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই এই

ইন্‌স্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪ সালে মরক্কোর রাবাত ও ১৯৯৫ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ব্যাংকের দুটি আঞ্চলিক অফিস চালু হয়। মধ্য এশিয়ার রিপাবলিকসমূহের সাথে আইডিবির ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের জন্যে ১৯৯৭ সালে কাজাখস্তানের আলামাতায় খোলা হয়েছে তৃতীয় আঞ্চলিক অফিসটি। এছাড়া ইরান, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, গাম্বিয়া, গিনি বিসাউ, পাকিস্তান, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া, সেনেগাল, সুদান ও সিয়েরালিওনে মাঠ প্রতিনিধির অফিসও রয়েছে।

হিজরী সালই এই ব্যাংকের আর্থিক বছর হিসাবে গণ্য হয়। আরবী ভাষা ব্যাংকের সরকারী বা অফিসিয়াল ভাষা। এই ভাষাতেই ব্যাংকের সকল কাজ পরিচালিত হয়। তবে অধিকতর সুষ্ঠু সেবা প্রদান এবং সদস্য দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্যে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাকেও 'কাজের ভাষা' হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মূলধন

আইডিবির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ শুরুতে ছিল দুই শত কোটি ইসলামী দীনার। প্রতিটি ১০,০০০ ইসলামী দীনার মূল্যের সর্বমোট ২,০০,০০০ শেয়ারে এই অর্থকে ভাগ করা হয়েছে। ১৪২২ হিজরীতে আলজেরিয়ায় বোর্ড অব গভর্নরসের সভায় অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পনেরো শত কোটি ইসলামী দিনারে উন্নীত করা হয় হয়েছে। বিলিকৃত (subscribed) হয়েছে ৭৯৬.০ কোটি ইসলামী দীনার। [সারণী-১ দ্রষ্টব্য]। ব্যাংকের মুদ্রামান ১ ইসলামী দীনার ১ এসডিআর-এর সমমানের। এসডিআর বা Special Drawing Right আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund) কর্তৃক ব্যবহৃত মুদ্রামান। বাংলাদেশী মুদ্রায় ১ ইসলামী দীনার বর্তমানে ৮০.০০ টাকার সমান।

সদস্য

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের ৫৫টি দেশ এই ব্যাংকের সদস্য। শুরুতে বাইশটি দেশ মিলে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করে। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ব্যাংকের সদস্য হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমতঃ দেশটিকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও.আই.সি) সদস্য হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরস সময়ে সময়ে যে সমস্ত শর্ত ও নিয়ম নির্ধারণ করে দেবেন তা মেনে নিতে দেশটিকে সম্মত থাকতে হবে। সারণী-১ হতে সদস্য দেশসমূহের নাম ছাড়াও সদস্য হিসাবে তাদের অন্তর্ভূক্তির বছর ও বিলিকৃত মূলধনে তাদের শেয়ারের পরিমাণ জানা যাবে।

সারণী-১ হতে দেখা যায় বাইশটি দেশ নিয়ে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৬ সালেই আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ক্যামেরুন, ও সিরিয়া এই চারটি দেশ এর

সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী বছরে আরও পাঁচটি দেশ-উগান্ডা, প্যালেষ্টাইন, লেবানন, শাদ ও সেনেগাল এর সদস্য পদ লাভ করে। এরপর প্রায় প্রতি বছর একটি-দুটি করে দেশ ব্যাংকটির সদস্য হতে থাকে। সর্বশেষ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভেঙ্গে পড়া সোভিয়েত রাশিয়ার মুসলিম দেশগুলো।

কাজের প্রকৃতি

আইডিবি গৃহীত কাজের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তবে সেসবই সদস্য দেশসমূহের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্যেই এসব কর্মসূচী অনুসৃত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, অ-সদস্য দেশের মুসলিম অধ্যুষিত জনপদের কল্যাণের জন্যেও এর কর্মসূচী রয়েছে। ব্যাংকের প্রস্তাবিত ও গৃহীত কর্মসূচী নিম্নরূপঃ-

ক. সদস্য দেশসমূহে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ;
খ. সদস্য দেশসমূহের সরকারী বিনিয়োগ উদ্যোগসমূহে ইকুইটির ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ;
গ. সদস্য দেশসমূহের বেসরকারী উদ্যোগসমূহে ঋণ মঞ্জুরীর মাধ্যমে মূলধন সরবরাহ;
ঘ. সদস্য দেশসমূহকে মহার্ঘ ব্যবহারিক সামগ্রী (যথা-তেলবাহী, মালবাহী ও মাছ ধরার জাহাজ, যন্ত্রপাতি, কারখানা, রেলগাড়ী ইত্যাদি) ইজারা দেওয়া;
ঙ. সদস্য দেশসমূহের আমানত গ্রহণ ও তহবিল বৃদ্ধি করা;
চ. ট্রাষ্ট তহবিল পরিচালনা;
ছ. অ-সদস্য দেশের মুসলিম জনসাধারণের সাহায্যের জন্যে বিশেষ তহবিল গঠন ও পরিচালনা;
জ. সবচেয়ে কম উন্নত সদস্য দেশসমূহের জন্যে বিশেষ প্রকল্প ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ. সদস্য দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের, বিশেষ করে মূলধনী পণ্য সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;
ঞ. সদস্য দেশসমূহে কারিগরী সহায়তা প্রদান;
ট. সদস্য দেশগুলোতে উন্নয়নমুখী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঠ. মুসলিম দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্ব স্ব দেশে শরীয়াহ মুতাবিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের জন্যে মূলধন সরবরাহ এবং গবেষণাকর্মে সহায়তা করা;
ড. ব্যাংকের পরিচালনা ও কার্য নির্বাহের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হবেনা সেই উদ্বৃত্ত অর্থ উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ; এবং
ঢ. এমন সব কাজে অংশ গ্রহণ করা যা ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে সহায়ক হবে।

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকটি যথাযথ পরিচালনার জন্যে বোর্ড অব গভর্ণরসকে সহায়তা করে থাকে বোর্ড অব একজিকিউটিভ ডিরেক্টরস। সদস্য দেশসমূহের অর্থমন্ত্রী বা পরিকল্পনা মন্ত্রী অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গর্ভণর পদাধিকার বলে ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য হয়ে থাকেন। এরাই চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড অব একজিকিউটিভ ডিরেক্টরস (বা নির্বাহী পরিচালক পরিষদ)-এর জন্যে প্রতিনিধি মনোনীত করে থাকেন। এদের কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর। প্রতি তিন বছর পর পর বোর্ড অব একজিকিউটিভ ডিরেক্টরবৃন্দের সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত হয়ে থাকেন।

সদস্য দেশসমূহ হতেই বোর্ড অব গভর্ণরস পাঁচ বছরের জন্যে বোর্ড অব একজিকিউটিভ ডিরেক্টরসের জন্যে একজন সভাপতি নিয়োগ করে থাকেন। তিনি ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে গণ্য হন। এছাড়া রয়েছেন তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তারা বাণিজ্য, অপারেশন এবং কর্পোরেট কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একজিকিউটিভ ডিরেক্টরবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত তিনটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি রয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ ক) পরিচালনা কমিটি; খ) ফাইন্যান্স ও প্রশাসনিক কমিটি এবং গ) দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য অর্থায়ন কমিটি। উপরন্তু কতকগুলো বিশেষ কমিটিও রয়েছে যেগুলো স্বল্পোন্নত সদস্য দেশ, ইসলামী ব্যাংক পোর্টফোলিও, ইউনিট ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড, অমুসলিম দেশের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি এবং পেনশন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্যান্সিয়াল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতিমধ্যেই আইডিবি সকল মহলে পরিচিতি লাভ করেছে এবং মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন হতে পেরেছে। নানা বিষয়ে এর সহযোগিতা সদস্য দেশগুলোর অর্থনীতিকে যেমন চাঙ্গা রেখেছে তেমনি ব্যাংক নিজেও প্রভূত মুনাফা অর্জন করেছে। ব্যাংকের এ যাবৎ গৃহীত কর্মতৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান নিলেই এ সত্য ধরা পড়বে।

ক. তহবিল সংগ্রহ

ব্যাংক যেহেতু একটি ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান সেহেতু তাকে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে হবে, পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্যে উপার্জন করতে হবে। মুনাফা অর্জনও তার অন্যতম লক্ষ্য থাকবে। এজন্যে চাই বিনিয়োগযোগ্য পর্যাপ্ত তহবিল। শেয়ারহোল্ডারদের পরিশোধিত মূলধন এই তহবিলের একটি বড় অংশ হলেও অন্যান্য উৎস হতে ব্যাংককে তহবিল সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ এই তহবিলের যোগান দেয়। কিন্তু আইডিবি যেহেতু একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক সেহেতু প্রচলিত

উৎস হতে তার তহবিল সংগ্রহের উপায় নেই। তাই একে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। ব্যাংকের ফাইন্যান্সের উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে সদস্য দেশসমূহের পরিশোধিত মূলধন, বিনিয়োগ আমানত স্কীমে প্রাপ্ত জমা এবং বিশেষ সাহায্য তহবিলে সদস্য দেশসমূহের প্রদত্ত চাঁদা। এভাবে ধীরে ধীরে তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যাংক তা থেকেই ফাইন্যান্সিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়া তহবিল বৃদ্ধির জন্যে তিনটি বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে: (১) ইউনিট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড, (২) ইসলামী ব্যাংকস পোর্টফোলিও ফর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং (৩) আইডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফান্ড।

১. **ইউনিট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (UIF)** : নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি ও সদস্য দেশগুলোতে মূল্যবান সামগ্রী সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে জানুয়ারী ১, ১৯৯০ (১৪১০ হিজরী) হতে ব্যাংক 'ইউনিট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড' নামে একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটি ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে তবে আইডিবির প্রেসিডেন্ট এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বশীল থাকবেন। দশ কোটি মার্কিন ডলারের প্রারম্ভিক অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন নিয়ে এর তহবিল গঠিত হয়। তহবিলের অর্থকে ইউনিট এ ভাগ করা হয় এবং প্রতি ইউনিটের মূল্য ধার্য করা হয় ১.০ মার্কিন ডলার। বিনিয়োগে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম এক লক্ষ মার্কিন ডলার বা তার গুণিতক হারে ইউনিট কিনতে হয়। প্রথম পর্যায়ে পনেরোটি ইসলামী ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান তহবিলের সমুদয় ইউনিট কিনে নেয়। এর মধ্যে কুয়েতের পাঁচটি, সউদী আরবের চারটি, মালয়েশিয়ার তিনটি এবং বাহরাইন, কাতার ও ডেনমার্কের একটি করে প্রতিষ্ঠান রয়েছে। চার বছরের মধ্যে উদ্যোগটি বিপুল সফলতা লাভ করে। ফলে জানুয়ারী ১, ১৯৯৪ (শাওয়াল ১৯, ১৪১৪ হিজরী) অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ আরও দশ কোটি মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করা হয় এবং এবারেও সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিশোধিত হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে আরও ত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার তহবিল বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই এই বর্ধিত তহবিলের সাড়ে সাত কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের ইউনিট বিক্রি হয়ে গেছে। বর্তমানে মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২.৫০ কোটি মার্কিন ডলার।

প্রধানতঃ ইজারা ও কিস্তিতে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী বা উপকরণ সংগ্রহের জন্যে এই তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিল যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি যেসব প্রতিষ্ঠানের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে শরীয়াহর সাথে সংগতি রেখে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদেরও উপার্জনের নতুন পথ উন্মুক্ত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী নীট মুনাফার ৮৫% বন্টন করা হয় ইউনিট ক্রেতাদের মধ্যে; ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পায় ১০% মুদারিব হিসাবে এবং ৫% রিজার্ভ রাখা হয় মূলধনের মূল্যমান স্থির রাখার জন্যে। বিগত পাঁচ বছরে এই তহবিল হতে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩২.৪৯ কোটি মার্কিন ডলার। ইতিমধ্যেই পূর্বের

বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে যে অংশ ফেরত পাওয়া গেছে তা পুনরায় বিনিয়োগ করার ফলেই পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বেশী হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই ফাণ্ড হতে বিনিয়োগে মুনাফার পরিমাণ খুবই সন্তোষজনক হওয়ায় প্রাথমিক ইউনিট ক্রেতাদের বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে।

২. **ইসলামী ব্যাংক পোর্টফোলিও (IBP):** আইডিবি তহবিল বৃদ্ধির পাশাপাশি সদস্য দেশসমূহের ইসলামী ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ সালে (জমাদিউস সানী, ১৪০৭) এই কর্মসূচী গ্রহণ করে। এর পুরো নাম Islamic Banks' Portfolio for Investment and Development। এই স্কীমের আওতায় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে প্রতিটি ১০০ মার্কিন ডলার মূল্যের সমপরিমাণ অর্থের ২৫ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে বাজার দরে এই সার্টিফিকেট নিজেদের মধ্যে কেনা-বেচাও করতে পারে। আইডিবির নিজের জন্যেও এ সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে। এই তহবিলের অর্থ ইজারা, ইকুইটি বিনিয়োগ ও সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে ব্যবহৃত হবে। বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে যে মুনাফা অর্জিত হবে তার ৯০% শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টিত হবে। মুদারিব হিসাবে আইডিবি পাবে ৫%, বাকী ৫% রিজার্ভ হিসাবে গচ্ছিত থাকবে মূলধনের মূল্যমান স্থির রাখার জন্যে। আইডিবিসহ এ যাবৎ ২১টি ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান এতে অংশ গ্রহণ করেছে।

এই স্কীমের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩৮.০ কোটি মার্কিন ডলার, এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৯.০ কোটি মার্কিন ডলার। এ ছাড়া আইডিবি ইজারার জন্যে ১৫.০ কোটি মার্কিন ডলার ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্যে অতিরিক্ত আরও ৭.০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে। শুরুর বছর হতে ১৪২৪ হিজরী পর্যন্ত এই কর্মসূচীর আওতায় ১৯টি সদস্য দেশে ২১৪টি প্রকল্পে ৩৩৯ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ১৪২৪ হিজরীতেই ১৯টি প্রকল্প ২৯.২২ কোটি মার্কিন ডলার মঞ্জুরী পেয়েছে। এই উদ্যোগ হতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তিনটি উপকার পাচ্ছেঃ

১. ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে পরোক্ষভাবে তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থায়নের সুবিধা ও অভিজ্ঞতা লাভ করছে;
২. উদ্বৃত্ত অর্থ কার্যকরভাবে ব্যবহার করে মুনাফা উপার্জনের সুযোগ পাচ্ছে, এবং
৩. ব্যাংকগুলো তাদের বড় গ্রাহকদের পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রশস্ত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব পূরণের জন্যে নতুন পদ্ধতির সাথেও পরিচিত করিয়ে দেওয়ার সুবিধা লাভ করেছে।

৩. **আইডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফান্ড (IIF)** : সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবকাঠামোসমূহ বিনির্মাণের জন্যে বেসরকারী বিনিয়োগ স্বাগত জানাবার জন্যে আইডিবির পক্ষ হতে আইডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফান্ড গঠন ছিল একটি

ব্যতিক্রমী প্রয়াস। একশত কোটি মার্কিন ডলার ইকুইটি মূলধনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ফান্ডটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে মূলধনের ৫১ শতাংশের মালিকানা আইডিবির। তহবিলটির কার্যক্রম পরিচালিত হবে বাহরাইন হতে। ফান্ডের ন্যূনতম ইকুইটি বিনিয়োগের পরিমাণ হবে এক কোটি মার্কিন ডলার। কোন প্রকল্পে সর্বোচ্চ ইকুইটি হবে দশ কোটি মার্কিন ডলার। এই ফান্ড বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সূত্রে বৃহৎ সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। টেলিকম্যুনিকেশন, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, পরিবহন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এই তহবিল হতে ১৪২৪ হিজরীতে চারটি সদস্য দেশের পাঁচটি প্রকল্পে ২০.৮০ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।

খ. প্রকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি

আইডিবি তার তহবিল ব্যবহারের জন্যে শরীয়াহ অনুমোদিত পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রকল্প অর্থায়ন, (২) বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন এবং (৩) বিশেষ সহায়তামূলক কর্মকাণ্ড। প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে শুরুতে শুধুমাত্র ঋণ ও ইকুইটির ব্যবহার হতো। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে ইজারা (১৯৭৭), মুনাফার অংশীদারীত্ব (১৯৭৮), কিস্তিতে বিক্রয় (১৯৮৫), ইসতিসনা (১৯৯৬) প্রভৃতি পদ্ধতি গৃহীত হয়। এছাড়া প্রকল্প অর্থায়ন কর্মসূচীর আওতায় সদস্য দেশগুলোতে কারিগরি সহায়তা প্রদান কর্মসূচীও রয়েছে।

প্রকল্প অর্থায়নের আওতায় বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুযায়ী ২০০৪ (১৪২৪ হিজরী) পর্যন্ত মোট বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৬১.৭৯ কোটি ইসলামী দীনার। এর মধ্যে ঋণ খাতে রয়েছে ২৫১.১৩ কোটি ইসলামী দীনার (৩২.৯৬%), ইজারা খাতে ১৬৭.৫০ কোটি ইসলামী দীনার (২১.৯৯%), কিস্তিতে বিক্রয় খাতে ১৫৫.৯১ কোটি ইসলামী দীনার (২০.৪৭%), ইকুইটি খাতে ২৮.৪২ কোটি ইসলামী দীনার (৩.৭৩%), জাতীয় উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা প্রদান ১৮.৭৮ কোটি ইসলামী দীনার (২.৪৬%), মুনাফার অংশীদারী কর্মকাণ্ডে ৬.২৪ কোটি ইসলামী দীনার (০.৮২%), ইসতিসনার জন্যে ১২০.৫২ কোটি ইসলামী দীনার (১৫.৮২%) এবং কারিগরি সহায়তার জন্যে ১৩.২৩ কোটি ইসলামী দীনার (১.৭৪%)। সারণী-২ হতে এই অর্থায়নের একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

ঋণ: সদস্য দেশসমূহের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সেসব দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যে আই.ডি.বি. তহবিল মঞ্জুরীর মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার বছর হতে এ পর্যন্ত এই খাতে

৪৩টি সদস্য দেশে সর্বমোট ২৫১.১৩ কোটি ইসলামী দীনার মঞ্জুর করা হয়েছে। সড়ক ও পোতাশ্রয় নির্মাণ ও উন্নয়ন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ, সার কারখানা নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রকল্পে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে [সারণী-২ দ্রষ্টব্য]। এর ৬০% ব্যয়িত হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে সহযোগিতার ক্ষেত্রে।

এই স্কীমের আওতায় প্রকল্প মঞ্জুরীর অর্থ পরিশোধের মেয়াদকাল বেশ দীর্ঘ-১৫ হতে ২৫ বছর। উপরন্তু শুরুতেই ৩-৭ বছরের রেয়াত দেওয়া হয়। ব্যাংক প্রকৃত ব্যয় নির্বাহের জন্যে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে থাকে। অবশ্য স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ০.৭৫%। ব্যাংকের নির্বাহী পরিষদ ১৯৯২ সালে একক প্রকল্প অর্থায়নের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছে। ফলে এখন এর পরিমাণ-১৯৯১ সালের ৩০.০ লক্ষ ইসলামী দীনার হতে ৪৯.০ লক্ষ ইসলামী দিনারে উন্নীত হয়েছে।

ইজারাঃ প্রতিষ্ঠার বছর হতেই আইডিবি সদস্য দেশসমূহকে নানা ধরনের মহার্ঘ ব্যবহারিক সামগ্রী ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। এসব সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে তৈলবাহী, মালবাহী ও মাছ ধরার জাহাজ, যন্ত্রপাতি, রেল ওয়াগন, ফ্রিজার, গবাদি পশু পরিবহন যান, গৃহ ও সড়ক নির্মাণ সরঞ্জাম প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠার বছর হতে আজ পর্যন্ত এই খাতে ব্যাংক ১৬৭.৫০ কোটি ইসলামী দীনার মঞ্জুর করেছে। [সারণী-২ দ্রষ্টব্য] এই অর্থ দিয়ে ১২৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ১৪২৪ হিজরীতেই ৮টি সদস্য দেশে ৮টি ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ ৭ হতে সর্বোচ্চ ১২ বছর মেয়াদের জন্যে ইজারা দেওয়া হয়। অবশ্য শুরুতে ২-৩ বছরের জন্যে রেয়াতী সময় দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যে মার্ক আপ ধার্য হয় তা নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে পরিশোধ করলে সংশ্লিষ্ট দেশ মোট দেয় মার্ক-আপের উপর ১৫% হারে রেয়াত পেয়ে থাকে। মার্ক-আপের হার বার্ষিক ৮%-৯% হতে হ্রাস করে ১৯৯২ সালে ৭.৫%-৮.৫% এ নামিয়ে আনা হয়েছে।

কিস্তিতে বিক্রয়ঃ এই কার্যক্রমের অধীনে গ্রহীতা সদস্য দেশকে মহার্ঘ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি [যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানি সরবরাহ, তেলের পাইপ বসানো] কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিক্রী করা হয়। সাধারণতঃ ১০-১২ বছরের মধ্যেই নির্ধারিত মার্ক-আপসহ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। ইজারার মতো মার্ক-আপের হারও সম্প্রতি ৮%-৯% হতে হ্রাস করে ৭.৫%-৮.৫% এ নামিয়ে আনা হয়েছে। এই স্কীমে গ্রাহকের কাছে কোন সামগ্রী হস্তান্তরের সময়ে তার মালিকানাও দিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয় ১৪০৫ হিজরীতে এবং আজ অবধি ১৬৪টি প্রকল্পে ১৫৫.৯১ কোটি ইসলামী দীনার বিনিয়োজিত হয়েছে।

সারণী-২
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্র
১৪২১-১৪২৪ হি.

(কোটি ইসলামী দীনার)

পদ্ধতি	১৪২১		১৪২২		১৪২৩		১৪২৪		১৩৯৬-১৪২৪	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
ঋণ	৫২	২০.২৭ (৩৪.০৩%)	৪৯	২০.৬৯ (২৯.১৪%)	৪৮	২২.০৯ (৩১.৩৯%)	৫৩	২৩.৬৫ (২৮.৬৩%)	৫৭৯	২৫১.১৩ (৩২.৯৭%)
ইকুইটি	৪	০.৫২ (০.৮৭%)	২	০.৩১ (০.৪৪%)	১	০.৪৪ (০.৬২%)	২	০.১৯ (০.২৩%)	১০৮	২৮.৪২ (৩.৭৩%)
ইজারা	২	৩.৫৫ (৫.৯৬%)	৬	১১.৮০ (১৬.৬২%)	৪	১০.৯১ (১৫.৫০%)	৮	১৩.৭৮ (১৬.৬৮%)	১২৭	১৬৭.৫৫ (২১.৯৯%)
কিস্তিতে বিক্রয়	৮	৯.৪১ (১৫.৮০%)	১০	৮.৭৩ (১২.৩০%)	১৪	২০.৪৬ (২৯.০৯%)	১১	৭.৯০ (৯.৫৬%)	১৬৪	১৫৫.৯১ (২০.৪৭%)
মুনাফার অংশীদারিত্ব	-	-	-	-	-	-	-	-	৭	৬.২৫ (০.৮২%)
ইসতিসনা'	১৬	২৩.৫৮ (৩৯.৬০%)	১৩	২৫.৮৫ (৩৬.৪১%)	৭	১৪.৭০ (২০.৮৮%)	১৯	৩৬.৩০ (৪৩.৯৩%)	৭০	১২০.৫২ (১৫.৮২%)
লাইন্স অব ফাইন্যান্সিং	১	১.১০ (১.৮৪%)	২	২.৭৪ (৩.৮৬%)	১	১.০০ (১.৪২%)	-	-	১৯	১৮.৭৮ (২.৪৬%)
কারিগরি সহযোগিতা	৩৩	১.১৩ (১.৯০%)	৩৯	০.৮৭ (১.২২%)	২৯	০.৭৮ (১.১০%)	২৪	০.৮০ (০.৯৭%)	৪৩২	১৩.২৩ (১.৭৪%)
মোট	১১৬	৫৯.৫৬ (১০০%)	১২৯	৭০.৯৯ (১০০%)	১০৪	৭০.৩৮ (১০০%)	১১৭	৮২.৬২ (১০০%)	১৫০৬	৭৬১.৭৯ (১০০%)

উৎস : ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৪২৪ হিঃ।

ইকুইটি ফাইন্যান্স: প্রতিষ্ঠার বছর হতে ব্যাংক এ পর্যন্ত এই খাতে ২৮.৪২ কোটি ইসলামী দীনার বিনিয়োগ করেছে। [সারণী -২ দ্রষ্টব্য]। সদস্য দেশসমূহের নানাবিধ প্রকল্পে এই অর্থ বিনিয়োজিত হয়েছে। প্রকল্পগুলোর অনেকগুলোই ইতিমধ্যে উৎপাদন শুরু করেছে। যেসব প্রকল্পে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে সেসবের মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট কারখানা, সূতা ও কাপড়ের কল, বোর্ড ও কাগজের কল, পাইপ শিল্প, কাঠের আসবাব তৈরীর কারখানা, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা প্রভৃতি। ইকুইটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক ডিভিডেন্ড পেয়ে থাকে।

ইসতিসনা: ইসতিসনার অর্থ ক্রেতার সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেসন বা ফরমায়েশ অনুযায়ী বিক্রেতা নির্ধারিত একটা সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করবে। পদ্ধতিটি চালু হয় ১৯৯৬ সালে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশসমূহের মধ্যে মূলধনী পণ্যের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি। বেসরকারী খাতে অবকাঠামো তৈরীর জন্যেও এটি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এ পর্যন্ত এখাতে ১২০.৫২ কোটি ইসলামী দীনার বরাদ্দ করা হয়েছে।

জাতীয় উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা: আইডিবি তহবিল বিনিয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো সদস্যসমূহের জাতীয় উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে অর্থ যোগান। শুরু হতেই এই পদ্ধতিতে সদস্য দেশসমূহের নানা ধরনের প্রকল্পে ব্যাংক অংশ গ্রহণ করে আসছে। বিভিন্ন আরব দেশীয় তহবিল, আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক ও সদস্য দেশগুলোর সরকারের সাথে যৌথভাবে অংশ গ্রহণ করে সামাজিক প্রয়োজনীয় গণউপযোগধর্মী প্রকল্পে ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করছে। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের গ্রুপ বার্ষিক সভায় আইডিবি অংশ গ্রহণ করে ও এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কর্মসূচী পুনর্বিন্যস্ত করে। এই কর্মসূচীর আওতায় আইডিবি এ পর্যন্ত ২৫টি সদস্য দেশে মোট ১৮.৭৮ কোটি ইসলামী দীনার বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে।

মুনাফার অংশীদারীত্ব: মুনাফার অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ আইডিবির অন্যতম কর্মসূচী। মাঝে কয়েক বছর ব্যাংক এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ স্থগিত রেখে ১৪১৪ হিজরী হতে পুনরায় বিনিয়োগ শুরু করেছে। ব্যাংক এ পর্যন্ত সাতটি প্রকল্পে মোট ৬.২৪ কোটি ইসলামী দীনার বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে ১৪১৪ হিজরীতেই সংযুক্ত আরব আমীরাতের শারজাহতে আমীরাত বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্যে ব্যাংক ১.১৫ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

কারিগরী সহায়তা: এই কর্মসূচীর অধীনে সদস্য দেশসমূহে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে তার সম্ভাব্যতা নিরীক্ষা, জরীপ, গবেষণা, পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ প্রভৃতি

কাজের জন্যে অনুদান বা ঋণ অথবা আংশিক ঋণ ও আংশিক অনুদান উভয় আকারেই অর্থ সাহায্য করা হয়ে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের বিস্তারিত নকসা প্রস্তুত, উপদেষ্টা নিয়োগ প্রভৃতি কাজের জন্যেও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠার বছর হতে ১৪২৪ হিজরী পর্যন্ত ব্যাংক ৩৯টি সদস্য দেশে এই ধরনের ৪৩২টি কার্যক্রমে সর্বমোট ১৩.২৩ কোটি ইসলামী দীনার প্রদান করেছে। শুধুমাত্র ১৪২৪ হিজরীতেই ২৪টি প্রকল্পে ৭২.০ লক্ষ ইসলামী দীনার অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া বিশেষ বিবেচনায় ইউরোপে আলবেনিয়া ও মধ্য এশিয়ার পাঁচটি সদস্য দেশ আজারবাইজান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান কাজাখস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের ৮টি প্রকল্পে মোট ১৩.৬ লক্ষ ইসলামী দীনার (বা ১৮.৯ লক্ষ মার্কিন ডলার) মঞ্জুর করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আইডিবি তার অনুসৃত নীতি, পদ্ধতি ও কর্মকৌশলের দ্বারা সদস্য দেশসমূহের তো বটেই, অসদস্য দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়েছ স্বল্পোন্নত একুশটি দেশ। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, ইয়েমেন, উগান্ডা, কমোরো, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি বিসাউ, জিবুতি, নাইজার, বারকিনা ফাসো, বাংলাদেশ, বেনিন, মালদ্বীপ, মালি, মোজাম্বিক, মৌরিতানিয়া, শাদ, সেনেগাল, সিয়েরালিওন, সুদান ও সোমালিয়া। এসব দেশের কৃষির সম্প্রসারণ, শিল্পের বিকাশ, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও যাতায়াত, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন, এবং গণ উপযোগসমূহের স্থাপনা ও বিকাশের (বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, পানি সরবরাহ, হাসপাতাল স্থাপন প্রভৃতি) ক্ষেত্রে ব্যাংক যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

গ. খাতভিত্তিক অর্থায়ন

প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক পূর্বে সামাজিক প্রয়োজনীয়তার উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে প্রকল্পের মুনাফা যোগ্যতাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এর পরিবর্তন ঘটে ১৯৯৫ হতে। এই সালে Strategic Agenda for the Medium Term Financing গৃহীত হওয়ার পর হতে আইডিবি যেসব খাতকে গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে সেগুলো হলোঃ কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের শিল্প, সামাজিক খাত এবং পরিবহন ও যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। আইডিবির অর্থায়নে সমাপ্ত ও চালু প্রকল্পগুলোকে পাঁচটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ (ক) কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প (খ) শিল্প ও খনি, (গ) সামাজিক উন্নয়ন, (ঘ) পরিবহন ও যোগাযোগ এবং (ঙ) গণউপযোগ। সারণী-৩ হতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসব খাতে বরাদ্দের বিবরণী জানা যাবে। নীচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো।

সারণী-৩

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রমে বিনিয়োগের চিত্র

১৪২১-১৪২৪ হি.

(কোটি ইসলামী দীনার)

খাত/বছর	১৪২১		১৪২২		১৪২৩		১৪২৪		১৩৯৬-১৪২৪	
	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান
কৃষি ও কৃষি বিষয়ক শিল্প	১৬	৩.৫০ (৫.৮৮%)	১৫	৩.৯৫ (৫.৫৭)	১৫	১১.১২ (১৫.৮০)	২৩	১৩.৩৭ (১৬.১৯%)	৩১০	১১৪.১৬ (১৪.৯৯%)
শিল্প ও খনি	-	-	৩	৪.২০ (৫.৯৩%)	১	৩.৪০ (৪.৮৩%)	১	২.৭৮ (০.৩৪)	১০৪	৬০.৬৩ (৭.৯৬%)
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৪	১২.১২ (২০.৪৬%)	২৩	১৭৪.৪১ (২৪.৫৭%)	১৮	১৫.৬২ (২২.২০%)	১৭	১৭.৬৫ (২১.৩৬%)	২৬১	১৪৩.২০ (১৮.৮০)
সামাজিক উন্নয়ন	৫৩	১৯.১৩ (৩২.১২%)	৪৮	২১.৬০ (৩০.৪৩%)	৩৯	২০.৭৭ (২৯.৫২%)	৩৮	২১.৬০ (২৬.১৪%)	৪০৮	১৭৭.৮২ (২৩.৩৪%)
গণউপযোগ	২১	২২.১৪ (৩৭.১৭%)	১৮	২০.৫৭ (২৮.৯৮%)	১৪	১৫.০২ (২১.৩৫%)	২২	২৮.১৯ (৩৪.১৩%)	২৬১	২১৮.১৩ (২৮.৬৩%)
অন্যান্য	১২	২.৬০ (৪.৩৬%)	১৪	৩.২০ (৪.৫২%)	১৭	৪.৪৩ (৬.৩০)	১৬	১.৫২ (১.৮৪%)	১৬২	৪৭.৮৪ (৬.২৮%)
মোট	১১৬	৫৯.৫৬ (১০০%)	১২১	৭০.৯৯ (১০০%)	১০৪	৭০.৩৮ (১০০%)	১১৭	৮২.৬২ (১০০%)	১৫০৬	৭৬১.৭৯ (১০০%)

উৎস : ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৪২০ হিঃ

গণ উপযোগ : ব্যাংকের গৃহীত কর্মসূচী ও প্রকল্প অর্থায়নের পরিমাণের দিক হতে বর্তমানে এটি প্রথম স্থানে রয়েছে। এ খাতে গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশ, স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন। পূর্বের তুলনায় ১৯৯৫ সাল হতে এ খাতে ব্যাংকের বরাদ্দ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ২১৮.১৩ কোটি ইসলামী দীনার বরাদ্দ হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ২৮.৬৩%।

সামাজিক উন্নয়ন : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন এ খাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। কারিকুলাম উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পুস্তক প্রকাশনা, স্কুলের পাঠ সহায়ক উপকরণ সংগ্রহ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা প্রদান প্রভৃতি খাতে ব্যাংক আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। এ জন্যে এ যাবৎ মোট ১৭৭.৮২ কোটি ইসলামী দীনার বরাদ্দ হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ২৩.৩৪%। বিগত চার বছরে এর অবস্থান দ্বিতীয় হলেও এর গড় অবস্থান হ্রাস পেয়েছে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে এই ধরনের গুরুত্ব প্রদান না করার কারণে।

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প : এ খাতে ব্যাংকের অর্থায়নের মূল লক্ষ্য হলো সদস্য দেশসমূহের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে খাদ্য সংকট মুকাবিলা করা এবং খাদ্যে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। কৃষি খাতে অধিকতর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এযাবৎ ১১৪.১৬% কোটি ইসলামী দীনার বরাদ্দ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প বরাদ্দের মধ্যে এই পরিমাণ ১৪.৯৯%। গুরুত্বের দিক দিয়ে গত ৩/৪ বছর ধরে খাতটি তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।

শিল্প ও খনি : এক্ষেত্রে আইডিবির কৌশল হলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের সহায়তার মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহে শিল্পের ভিত মজবুত ও সম্প্রসারণ করা। সদস্য দেশের সরকারী ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানমূহের মাধ্যমেই ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার পাশাপাশি ইজারার মাধ্যমেও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং খনিভিত্তিক শিল্প (যেমন পেট্রোলিয়াম পরিশোধন প্লান্ট, খনিজ সার) স্থাপনও এই ফাইন্যান্সিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যাংকের পুঞ্জীভূত মোট বরাদ্দের মধ্যে এ খাতের অংশ ৬০.৬৩ কোটি ইসলামী দীনার বা ৭.৯৬%। সারণী-৩ হতে দেখা যাবে বিভিন্ন বছরে এই খাতের গুরুত্বের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ : পরিবহনই সভ্যতা। উপরন্তু বিশ্বায়ন ও বাণিজ্যিক উদারীকরণের ধাক্কা লেগেছে আইডিবির সদস্য দেশগুলোতেও। বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্যে তাদের চাই প্রশস্ত ও দীর্ঘ আধুনিক সড়ক, উন্নত পোতাশ্রয়, মালবাহী জাহাজ,

রেলগাড়ী এবং বিমান। চাই ছোট শহর হতে রাজধানী এবং শিল্প এলাকা ও বন্দরের সাথে দ্রুত ও নিরাপদ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই আইডিবি এ খাতের উন্নয়নের জন্যে বড় ধরনের অর্থ বরাদ্দ করবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। প্রশস্ত দীর্ঘ রাস্তা তৈরীর পাশাপাশি বন্দর উন্নয়ন, বিশেষতঃ মালামাল উঠানামা, নিরাপদ নৌপরিবহনের আধুনিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এসব কাজে এযাবৎ মোট ১৪৩.২০ কোটি ইসলামী দীনার ব্যবহৃত হয়েছে মোট বরাদ্দে যার অংশ ১৮.৮০%।

অন্যান্য : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের প্রকল্প অর্থায়নে সংকট মোচনের ও বিভিন্ন দেশে যেসব ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান শরীয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ আগ্রহী তাদের বিশেষ প্রয়োজন পূরণে জন্যে ব্যাংক এ পর্যন্ত ৪৭.৮৪ কোটি ইসলামী দীনার (৬.২৮%) বরাদ্দ করেছে।

ঘ. বাণিজ্যিক কার্যক্রম

আমদানী বাণিজ্যে অর্থায়ন: সদস্য দেশসমূহের আমদানী বাণিজ্যে সহায়তার জন্যে এই কর্মসূচীটি শুরু হয় ১৯৭৭ সাল (১৩৯৭ হিজরী) হতে। পূর্বে এর নাম ছিল Foreign Trade Financing Operations । এর নতুন নামকরণ হয়েছে Import Trade Financing Operations (ITFO)। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এ পর্যন্ত এ প্রকল্পে ১,৬৮১.০ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা করেছে। যেসব পণ্যসামগ্রী আমদানীতে এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: অপরিশোধিত তেল, পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, ইউরিয়া সার, সিমেন্ট, গন্ধক, পাথুরে ফসফেট, ভোজ্য তেল, কাগজ ও মণ্ড, চিনি, জিপসাম, পাটজাত দ্রব্য, তুলা, সূর্যমুখীর বীজ, আকরিক সীসা, বিভিন্ন মধ্যবর্তী শিল্পজাত সামগ্রী, আকরিক লোহা, এ্যামোনিয়া, তামা, বাইসাইকেল, প্লাইউড, রবার, পেট্রোকেমিক্যাল, এ্যালুমিনিয়াম, কেওলিন প্রভৃতি। তেলসমৃদ্ধ ধনী সদস্য দেশ ছাড়া অন্যান্য সকলেই এই স্কীমের আওতায় বৈদেশিক মুদ্রার আকারে আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেছে।

রপ্তানী অর্থায়ন কার্যক্রম: এই বিশেষ কর্মসূচীটি শুরু হয় ১৯৮৭ সাল (১৪০৭ হিজরী) হতে। পূর্বে এর নাম ছিল Longer Term Trade Financing Scheme। এর নতুন নামকরণ হয়েছে Export Financing Scheme (EFS)। অপ্রচলিত পণ্য ও মূলধনী পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সহযোগিতা করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে আমদানী ও রফতানীকারী উভয় দেশকে অবশ্যই ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য হতে হবে। এ পর্যন্ত ২৩টি সদস্য দেশ এই স্কীমে যোগ দিয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সউদী আরব, মালয়েশিয়া, তিউনিসিয়া, কুয়েত, তুরস্ক প্রভৃতি। যেসব পণ্য ও মূলধনী সামগ্রী দীর্ঘ মেয়াদে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে সেগুলোর

মধ্যে রয়েছে টেলিফোন কেবল, প্লাইউড, টায়ার, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পাম তেল, এ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটর, রোলিং মিল মেশিনারী ও সরঞ্জাম ইত্যাদি। এই কর্মসূচীতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১২৩.৩১ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ঙ. মুনাফা

এই আন্তর্জাতিক ব্যাংকটির যাবতীয় কার্যক্রম সুদবিহীন। সেহেতু যে প্রধান ছয়টি উপায়ে ব্যাংক তার পরিচালনা ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্যে অর্থ উপার্জন করে থাকে সেগুলো উল্লেখের দাবী রাখে। এগুলো যথাক্রমে:-

১. বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম অংশগ্রহণ হতে আয়;
২. প্রকল্প ফাইন্যান্সের জন্যে সার্ভিস চার্জ;
৩. সদস্য দেশসমূহে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং হতে আয়;
৪. ইজারা হতে আয়;
৫. যৌথ অর্থায়ন হতে আয়; এবং
৬. কারিগরী সহায়তার জন্যে সার্ভিস চার্জ।

এসব উপায় বা পদ্ধতি ব্যবহার করে গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৪১৫ হি. হতে ১৪২৪ হিজরী পর্যন্ত ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করেছে তার একটা তুলনামূলক চিত্র সারণী-৪ হতে পাওয়া যাবে। মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক নিয়ম অনুযায়ী মোট আয় হতে প্রশাসনিক ও পরিচালনা ব্যয় এবং স্থির সম্পদের অবচয় বাদ দেওয়া ছাড়াও ইকুইটি বিনিয়োগের মূলধন মান স্থির রাখার জন্যে ১৪০৩ হিজরী হতে ১৪১১ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে ন্যূনতম ২০ লক্ষ হতে সর্বোচ্চ ১ কোটি ৫০ লক্ষ ইসলামী দীনার আলাদা করে রেখেছে। অবশ্য ১৪১২ হতে ১৪১৫ হিজরী সালে এই ধরনের আলাদা অর্থ রাখা হয়নি। এ যাবৎ এই অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯.৫৫ কোটি ইসলামী দীনার। সদস্য দেশসমূহের প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থা, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি কারণে ইকুইটি অর্থের যে মান হ্রাস পায় তা পূরণ ও সম্ভাব্য লোকসান পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে এই ব্যবস্থা। এই অর্থ হতে আদৌ আদায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন মোট ২.৩৯ কোটি ইসলামী দীনারের ইকুইটি অবলোপন করা হয়েছে।

এই সারণী হতে দেখা যাবে গত দশ বছরে ব্যাংকটির মুনাফার পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে খুব বড় ধরনের পরিবর্তন নেই। অবচয় ও প্রভিশন খাতে যে অর্থ রাখা হয়েছে তা সন্তোষজনক। তবে হঠাৎ করে ১৪২৪ হিজরীতে রাখা অবচয় ও প্রভিশনের অংক চোখে পড়ার মতো। এর কারণ হলো বিশ্বব্যাপী মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও বিনিময় হারের অস্থিরতার জন্যে এ বছরে আইডিবির বিনিময়জনিত ক্ষতি (Exchange Loss) হয়েছে ২৯০ লক্ষ ইসলামী দিনার। প্রভিশনের সঙ্গে এই অর্থ যুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

সারণী - ৪

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের মুনাফার বিবরণ : ১৪১৫ হি.-১৪২৪ হি.

(লক্ষ ইসলামী দীনার)

বছর	আয়	ব্যয়	অবচয় ও প্রভিশন	মুনাফা
১৪১৫	১০২০	২৫০	১১০	৬৬০
১৪১৬	৯৬০	২৬০	১১০	৫৯০
১৪১৭	১০৯০	৩১০	১০০	৬৮০
১৪১৮	১১২০	৩৫০	১৮০	৫৯০
১৪১৯	১৩৬০	৩৭০	২৩০	৭৬০
১৪২০	১৪০০	৪০০	২৮০	৭২০
১৪২১	১৫১০	৪৪০	২৯০	৭৮০
১৪২২	১৭১০	৫৩০	৪৫০	৭৩০
১৪২৩	১৬১০	৪৯০	৩৯০	৭৩০
১৪২৪	২২২০	৫৩০	১১০০	৫৯০

উৎস : ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ

চ. ওয়াকফ তহবিল কার্যক্রম

আইডিবির সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে যাদের জনসাধারণ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। তাদের মাথাপিছু আয়ও বিশ্বের সর্বনিম্ন। সেসব দেশের জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে সরকারের গৃহীত নানা উন্নয়নমুখী কর্মসূচীতে এই ব্যাংক বিশেষ সাহায্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ব্যাংকের বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক ১৩৯৯ হিজরীতে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুসারে তলবী ও আমানত হিসাব খাত থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে *বিশেষ সহায়তা তহবিল* (Special Assistance Account) নামে একটি পৃথক তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৪১৭ হিজরীতে এর নাম পরিবর্তন করে *ওয়াকফ ফান্ড রাখা হয়*। এই তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য হলো:

১. সদস্য দেশসমূহের অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং কার্যক্রমকে শরীয়াহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
২. সদস্য দেশসমূহকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও বিপর্যয়ে সহায়তা প্রদান;
৩. ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়ন ও বিকাশে সহযোগিতা করা; এবং
৪. স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহকে বিশেষ টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান।

এই তহবিলের অর্থ হতে ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (IRTI) পরিচালিত হচ্ছে। আনন্দের কথা, প্রতি বছরই তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মকাণ্ডও। উদাহরণস্বরূপ, ১৪০৯ হিজরীতে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬৭.৭৪ কোটি ইসলামী দীনার। পরবর্তী বছরে

তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭২.৮১ কোটিতে। ১৪১৯ হিজরীতে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮৯.৪০ কোটি ইসলামী দীনার।

সদস্য দেশসমূহের যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন কিন্তু বিধিবদ্ধ খাত হতে অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে এই তহবিল হতে অর্থ সাহায্য করার বিধান রয়েছে। উপরন্তু অ-মুসলিম দেশের মুসলিম জনসাধারণের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্যেও এই তহবিল হতে সাহায্য করা হয়। ১৩৯৯ হিজরীতে (১৯৭৯) প্রতিষ্ঠার পর হতে এ পর্যন্ত ১০১৭টি প্রকল্পে ৫৬.৫৫ কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে সদস্য দেশসমূহে ৩৭৪টি প্রকল্পে ৩৭.০২ কোটি মার্কিন ডলার মঞ্জুর করা হয়েছে। অমুসলিম দেশসমূহের মুসলমানদের জন্যে ৬৪৩টি প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯.৫৩ কোটি মার্কিন ডলার।

অমুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুসলমান বাস করে ভারতে, প্রায় বারো কোটি। তাদের সহায়তার জন্যে, বিশেষতঃ বেকার ও মেধাবী তরুণ-তরুণীদের জন্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষা লাভের সুবিধার্থে আইডিবি ১৪০৫ হিজরীতে ৩.০ কোটি মার্কিন ডলারের একটি বিশেষ বরাদ্দ মঞ্জুর করে। এই বরাদ্দ হতে প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট ও বাছাইকৃত প্রকল্পে সাহায্য করছে ব্যাংক। এযাবৎ ভারতীয় মুসলিমদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডে সাহায্যের জন্যে এ তহবিল হতে সর্বমোট ১৭০টি প্রকল্পে ২.৯৯ লক্ষ মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। উপরন্তু এগারোটি অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষা চর্চার সুবিধার জন্যে ২৩টি বিশেষ প্রকল্পে ৫৫.৯০ লক্ষ মার্কিন ডলার সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, গণচীন, বুরুন্ডি, ইথিওপিয়া প্রভৃতি। পাকিস্তানে আগত আফগান মুহাজিরদের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাবসন কর্মসূচীতে ব্যাংকের সহযোগিতা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

স্কলারশীপ স্কীমঃ আইডিবি অমুসলিম দেশসমূহে বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপীয় দেশ, বিলুপ্ত সোভিয়েত রাশিয়ার মুসলিম দেশ এবং আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত অসদস্য দেশসমূহের মেধাবী মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা ও পেশাদারী প্রশিক্ষণ লাভের সুবিধার্থে ১৯৮৩ সাল (১৪০৪ হিজরী) হতে স্কলারশীপ স্কীম চালু করেছে। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের দেশেরই খ্যাতিসম্পন্ন নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা আইডিবির সদস্য দেশসমূহের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার জন্যে এই স্কলারশীপ ভোগ করতে পারেব। এই অর্থ করযে হাসানা আকারে প্রদত্ত হয়। শিক্ষা জীবন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে এই অর্থ পরিশোধ করবে। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ দেশে আইডিবি সৃষ্ট ওয়াকফ তহবিলে এ অর্থ জমা দেবে এবং তা থেকে পুনরায় মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি মঞ্জুর করা হবে। স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহেও এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এই সুবিধা ভোগ করছে।

চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, পশুপালন, ফার্মেসী, হিসাববিজ্ঞান, ফাইন্যান্স, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা ও পেশাদারী প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে এই সুযোগ রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫১টি দেশের ৬,৮২৭জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে এই কর্মসূচীর আওতায় স্কলারশীপ প্রদান করা হয়েছে যার পরিমাণ ৫.০৫ কোটি মার্কিন ডলারেও বেশী।

সদস্য দেশসমূহে উচ্চতর প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্যে ১৪০৯ হিজরী হতে আইডিবি হাই টেকনোলজিতে তিন বছর মেয়াদী পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী ও একবছর মেয়াদী পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণার জন্যে স্কলারশীপ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে (১৪১৩ হিজরী) হতে স্কীমটি চালু হয়। প্রথম পর্যায়ে ৫ বছরের জন্যে প্রকল্পটি গৃহীত হলেও মেয়াদ শেষে এটি পুনরায় ৭ বছরের জন্যে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এম.এস-সি. ডিগ্রী অর্জনের সুবিধার্থে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ (১৪১৯ হিজরী) হতে আলাদা বৃত্তি কর্মসূচী চালু করেছে আইডিবি।

এনজিও ও মহিলা উন্নয়ন: ওয়াকফ তহবিলের আওতায় নতুন এই দুটি কর্মসূচীর কাজ শুরু হয় যথাক্রমে ১৪১৮ ও ১৪১৯ হিজরী হতে। সদস্য দেশসমূহের ইসলামী এনজিওসমূহ ও মহিলাদের উন্নয়নের জন্যে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচীর আওতায় এযাবৎ ২৪ টি প্রকল্পে ছয় লক্ষ ডলার ব্যয়িত হয়েছে।

কল্যাণধর্মী কর্মসূচী: এই কর্মসূচীর আওতায় সউদী আরবে প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে যে লক্ষ লক্ষ পশু কুরবানী হয় সেসব বিশেষ প্রক্রিয়ায় হিমাগারে সংরক্ষণ করে স্বল্পোন্নত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত সদস্য দেশসমূহে বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পূর্বে কুরবানীকৃত লক্ষ লক্ষ পশু বুলডোজার দিয়ে বালির নীচে পুঁতে ফেলা হত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর জনগণের পুষ্টির কথা বিবেচনা করে ১৯৮৩ সাল (১৪০৩ হি.) হতে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত ব্যাংক এই কর্মসূচীর আওতায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষেরও বেশি ভেড়া ও উটের গোশত স্বল্পোন্নত সদস্য দেশ ও অমুসলিম দেশের দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

ছ. বিনিয়োগ ও রপ্তানী ঋণের ইসলামী বীমা

আইডিবির অপর অন্যতম অঙ্গসংস্থা বিনিয়োগ ও রপ্তানী ঋণের ইসলামী বীমা কর্পোরেশন (Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)। সদস্য দেশসমূহের রপ্তানী বৃদ্ধি ও রপ্তানীতে বিনিয়োজিত অর্থের বীমা করার উদ্দেশ্যেই ১৯৯৪ সালে (১৪১৫ হিজরী) প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। আইডিবির প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে এই কর্পোরেশনেরও প্রেসিডেন্ট। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ দশ কোটি ইসলামী দীনার। আইডিবি এর ৫০%

পরিশোধ করেছে, বাকী ৫০% পরিশোধ করেছে তেইশটি দেশ। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৫ সালের জুলাই হতে শরীয়াহ নীতিমালার আলোকে রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ ঝুঁকি, যুদ্ধ, চুক্তি সম্পাদনকারী সরকারের সম্ভাব্য ওয়াদা খেলাপ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদির বিপরীতেও বিনিয়োগ বীমা স্কীম চালু করেছে।

জ. বেসরকারী খাত উন্নয়নের বিশেষ পদক্ষেপ

১. আইসিডি (ICD): আইডিবির বোর্ড অব গভর্ণরসের ২৫তম বার্ষিক সভায় (১৪২০ হিজরী) সদস্যদেশগুলোর বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্যে 'ইসলামী কর্পোরেশন ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব প্রাইভেট সেক্টর' নামে আরেকটি অঙ্গসংস্থা তৈরী হয়েছে। স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে তবে আইডিবির প্রেসিডেন্টই এই কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হবেন। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি ডলার। আইডিবি মূলধনের ৫০% পরিশোধ করবে। সদস্য দেশগুলো মূলধনের ৩০% শেয়ার ক্রয় করবে। বাকী ২০% ক্রয় করবে সদস্য দেশগুলোর সরকারী সংস্থাসমূহ। এই উদ্দ্যোগের ফলে সদস্য দেশগুলোর বহুমুখী উন্নয়নে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতেও এখন আইডিবির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলো।

২. ওয়ার্ল্ড ওয়াকফ ফাউন্ডেশন (WWF): বিশ্বব্যাপী ওয়াকফ কার্যক্রম পরিচালনা ও দানশীল ব্যক্তিদের দান গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই তহবিল গঠিত হয়েছে ১৪২২ হিজরীতে (সেপ্টেম্বর ২০০১)। যে কেউ এই তহবিলে দশ লক্ষ মার্কিন ডলার দান করে এর সদস্য হতে পারেন। আইডিবি নিজেও এই তহবিলে প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে ২.৫০ কোটি মার্কিন ডলার দান করেছে। আইডিবির প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে এই ফাউন্ডেশনেরও প্রেসিডেন্ট। সদস্য দেশসমূহের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থবহ উন্নয়নের জন্যে এই ফাউন্ডেশন কাজ করে যাবে।

৩. আওকাফ প্রোপার্টি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (APIF): ইসলামের বিশেষ ঐতিহ্য হিসাবে ওয়াকফের পুনর্জীবন ও আওকাফের ভূমিকা উন্নয়ন এবং সদস্য ও অসদস্য দেশসমূহের ওয়াকফকৃত স্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৪১৮ হিজরীতে এই তহবিল গঠিত হয়। আইডিবি ইতিমধ্যেই এই তহবিলে ৫.০ কোটি মার্কিন ডলার প্রদান করেছে এবং সদস্যরা ৫.৫ কোটি মার্কিন ডলারের মূলধন পরিশোধের অঙ্গীকার করেছে।

ঝ. ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। যে সমস্ত ইসলামী ব্যাংকের মূলধনের অংশ বিশেষ সরবরাহসহ বিভিন্ন পরামর্শ ও কারিগরী জ্ঞান দিয়ে এই আন্তর্জাতিক ব্যাংকটি সহায়তা করেছে সেগুলো হচ্ছে:

১. দুবাই ইসলামী ব্যাংকের গৃহায়ণ প্রকল্পের জন্যে ৪২.৭০ লক্ষ ইসলামী দীনার মঞ্জুর করেছে; ২. বাহরাইন ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ারের ১৫% আই.ডি.বি.কিনে নিয়েছে যার অর্থ মূল্য ৩০.৫ লক্ষ ইসলামী দীনার; ৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের মোট পরিশোধিত মূলধনের ৭.৫% প্রদান করেছে; ৪. গাম্বিয়ার ইসলামী ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধনের ৭.৫% প্রদান করেছে।

এছাড়া মিশরের ইন্টারন্যাশন্যাল ইসলামিক ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট, জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক (সুদান এবং মিশর), ব্যাংক ইসলামিক দ্য নাইজার, ব্যাংক ইসলামিক দ্য সুদান এবং ব্যাংক ইসলামিক দ্য গিনি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে কারিগরী পরামর্শ ও নানাবিধ সহায়তা প্রদান করেছে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক। এই ব্যাংকের সাফল্য ও কার্যকারিতা অন্যান্য দেশেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্যে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবেও কাজ করেছে।

উপরন্তু বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ, শরীয়াহ পরিপালন, হিসাব নিরীক্ষণ ও রেটিং নির্ধারণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই আইডিবি যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো: Auditing and Accounting Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM), Liquidity Management Centre (LMC), International Islamic Rating Agency (IIRA), General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI).

এ. আই আর টি আই

আইডিবির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Islamic Research and Training Institute বা আই.আর.টি.আই.) সম্বন্ধে আলোকপাত না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠার পর হতেই আইডিবি সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার পাশাপাশি তাদের দেশে দক্ষ ইসলামী জনশক্তি গড়ে তোলা এবং ইসলামী অর্থনীতির চর্চা-চিন্তার সম্প্রসারণ ঘটানোও জরুরী বলে বিবেচনা করে। এই দায়িত্ব পালনের জন্যেই ১৪০১ হিজরীতে আই.আর.টি.আই.-এর প্রতিষ্ঠা। ইন্সটিটিউটটি পাঁচটি ক্ষেত্রে অব্যাহত তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব তৎপরতা ও উদ্যোগ আইডিবির তহবিল বিনিয়োগ ও ব্যবহারের জন্যে নতুন কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সহযোগিতার কাজে প্রভূত সহায়তা করছে। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং সম্বন্ধে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও পরিচালকদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ইসলামের কালজয়ী জীবনাদর্শ সম্প্রসারণেও সহায়তা করছে।

১. **ওয়ার্কশপঃ** আইআরটিআই এযাবৎ পঞ্চাশটিরও বেশী সফল ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছে। জেদ্দার সদর দপ্তরে ছাড়াও সদস্য দেশসমূহের রাজধানীতে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা, ইসলামী ফাইন্যান্স বিষয়ক কৌশল উদ্ভাবন, ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সফলভাবে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে এসব ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা সংঘটিত হয়েছে।

২. **সেমিনারঃ** ইনস্টিটিউটটি সদস্য দেশগুলোর অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আগ্রহী বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্থনৈতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে নিয়মিতভাবে ইসলামী অর্থনীতির পঠন-পাঠন, যাকাতের ব্যবস্থাপনা, ওয়াকফ প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সরকারী অর্থব্যবস্থা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস তৈরী, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ইসলামী কমন মার্কেট প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যবহুল ও দিক-নির্দেশনামূলক সেমিনার ও কনফারেন্সের আয়োজন করছে।

৩. **গবেষণা ও পুরস্কারঃ** আইআরটিআই নিজস্ব তত্ত্বাবধানে অর্থনীতিতে আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম গবেষকদের দ্বারা ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং-এর নির্বাচিত সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যোগ্য গবেষকদেরও এ ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে উৎসাহিত করে আসছে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে। ইন্সটিটিউট সম্প্রতি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রখ্যাত গবেষকদের আমন্ত্রণমূলক বক্তৃতামালার কর্মসূচীও চালু করেছে।

আইডিবি আইআরটিআই-এর সহযোগিতায় ১৪০৮ হিজরী (১৯৮৮) হতে 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার' নামে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর উপর আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদানের প্রথা চালু করেছে। ইসলামী অর্থনীতির চর্চা, প্রচার ও প্রসার, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় যাঁদের মেধা, শ্রম ও সাংগঠনিক অবদান অসাধারণ তাঁদের কাজের স্বীকৃতি ও সম্মাননা জানাবার জন্যে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। একক ও যুগ্ম উভয়ভাবেই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদানের উল্লেখসহ সনদপত্র ও নগদ ত্রিশ হাজার ইসলামী দীনার (প্রায় চল্লিশ হাজার মার্কিন ডলার সমান) প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত যাঁরা এই আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সারণী-৫ হতে তাঁদের নাম জানা যাবে।

৪. **প্রকাশনাঃ** বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্সে পঠিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যেগুলো উন্নতমানের ও প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় সেগুলো সম্পাদনা করে বই বা সংকলন আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করছে ইন্সটিটিউট। এছাড়া মানসম্মত

গবেষণাপত্রসমূহের সম্পাদিত সংস্করণ বই আকারে প্রকাশ করে যাচ্ছে। এযাবৎ এরকম ছোট বড় ২৩২টির বেশী সংকলন ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আইডিবির সরকারী ভাষা যেহেতু আরবী এবং কাজের ভাষা ইংরেজী ও ফরাসী সেহেতু এসব বই ও গবেষণাপত্র এই তিন ভাষাতেই প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক সময় একই বই বা গবেষণাপত্র তিনটি ভাষাতে প্রকাশিত হয়। সংখ্যার দিক দিয়ে ইংরেজী ভাষার প্রকাশনাই বেশী। উপরন্তু অত্যাধুনিক কম্পিউটার ডাটা প্রসেসিং সুবিধাসহ একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরীও গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৮,৬৮০টি বই, সদস্য দেশসমূহের ১৫,৪৪৮টি অর্থনৈতিক ও ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ১৯,২৭২টি মূল্যবান প্রকাশনা/ মূল্যায়ন রিপোর্ট সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া ৫৩২টি সাময়িকীও নিয়মিত ক্রয় করছে।

৫. তথ্য সংগ্রহ : ইসলামী উম্মাহর স্বার্থে মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহের মুসলমানদের সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ এবং বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করার দায়িত্বও পালন করে চলেছে আই.আর.টি.আই.। জনসংখ্যার বন্টন, শিক্ষা, পেশাগত অবস্থা, বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সূচক এবং বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গের উপাত্ত সংগ্রহ এই দায়িত্বের অংশ। মূলতঃ সদস্য দেশসমূহের মধ্যে আর্থ-সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী তথ্য বিনিময়ের সুবিধার জন্যে নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক হিসাবে আইডিবি যেন কাজ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই OIC Information Systems Network তৈরীর এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং একটি সুবিন্যস্ত, নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত Muslim World Information Database তৈরিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ না করলেই নয় যে বিশ্বব্যাংকের আদলে মুসলিম উম্মাহর বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইডিবি নিজস্ব উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োস্যালাইন এগ্রিকালচার (ICBA) নামে একটি সম্পূর্ণ অলাভজনক ফলিত কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাইয়ে। কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৪২০ হিজরীতে (১৯৯৯ খৃ:)। জেনেটিক বিষয়ক গবেষণা, লবণাক্ত জমি পুনরুদ্ধার, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা ইত্যাদি কর্মকান্ডের মধ্যে কেন্দ্রটি এগিয়ে চলেছে।

ট. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা

প্রতিষ্ঠার পর হতেই আইডিবি যেমন সদস্য দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে তেমনি বিশ্বমানবতার কল্যাণের স্বার্থে অংশগ্রহণ করে আসছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন ও ফোরামের সাথে। শুরু থেকেই আইডিবি বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

(ADB), আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (AFDB) এবং ইউরোপীয়ান ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (EBRD) এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এছাড়াও ওআইসি এবং তার বিভিন্ন অংগসংগঠন যেমন COMSTECH, COMIAC, ICCI, ISESCO, ICDT, SESRTCIC, বিশেষ করে COMCEC এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে। আন্ত:আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আইডিবি যেসব সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে সেসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো আরব-মাগরেব ইউনিয়ন (AMU), গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (GCC), পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহের অর্থনৈতিক ইউনিয়ন (ECOWAS), কাস্টমস ইউনিয়ন অব সেন্ট্রাল আফ্রিকান ষ্টেটস (CUCAS), দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের সংস্থা (ASEAN), সাউথ এশিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওন্যাল কোঅপারেশন (SAARC), এবং আটটি মুসলিম দেশ নিয়ে গঠিত ডি-৮। এছাড়া জাতিসংঘ এবং এর যেসব অংগ সংগঠনের সাথে আইডিবি বিশেষ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে সেসবের মধ্যে রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO), ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স অন ট্রেড এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট (UNCTAD) প্রভৃতি। উপরন্তু কমন মার্কেট ফর ইস্টার্ন এ্যান্ড সাউদার্ন আফ্রিকা (COMESA), এসোসিয়েসন ফর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশন (ADFIMI), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO), ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (IFAD), ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেনশন (WIPO) প্রভৃতির সাথেও সংযোগ রেখে চলেছে। ফলে অভিজ্ঞতা বিনিময়, উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের মাধ্যমে উভয় পক্ষই উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করছে।

মন্তব্য ও সুপারিশ

১. আইডিবির বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো হতে দেখা যায় যে, ১৩৯৬-১৪২৪ সময়কালে মোট মঞ্জুরীর ৩৩% ছিল প্রকল্প ঋণ। নিঃসন্দেহে এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ব্যাংকটির সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধেকেই স্বল্পোন্নত। এদের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যে এই কর্মসূচী আরও দশ বছর অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

২. মুনাফার অংশীদারীত্বের পদ্ধতি আইডিবির ফাইন্যান্সিং কার্যক্রমের মধ্যে একেবারে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে। এমন হওয়া উচিৎ ছিল না। ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি বিকাশের স্বার্থেই এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে এর ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল আইডিবির। কারণ শুধু মাত্র মুনাফা অর্জন কোনক্রমেই আইডিবির চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় এই ব্যাংক যেহেতু পদ্ধতিটি ব্যবহারে যথোচিত গুরুত্ব দিচ্ছে না সেহেতু অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও এ ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হতে বিরত রয়েছে।

৩. সদস্য দেশসমূহে আইডিবির মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। সংস্কৃতির সাথে ঋণের সম্পৃক্ততা না থাকলে সামাজিক সমস্যা আরও বিস্তৃত ও ঘনীভূত হয়; বিরোধ বাধে, সমাজে ভাঙন ধরে। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এসব দেশে বিদেশী অর্থে পুষ্ট ও পরিচালিত এনজিওগুলো ইসলামী সংস্কৃতি তথা জীবনধারাবিরোধী কার্যক্রমকে উস্কে দিচ্ছে তাদের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে। এর প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের জন্যে আইডিবির উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্থিক সহযোগিতা পৌঁছে দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আর্থিক ভিত মজবুত করতে না পারলে পরিণামে যে অনিবার্য বিপর্যয় ঘটবে তা রুখবার কোন উপায় থাকবে না।

উপসংহার

আইডিবির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উপরে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো তার আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায় বিগত ত্রিশ বছর ধরে ব্যাংকটি যে সাফল্য অর্জন করেছে তা বাস্তবিকই প্রশংসার দাবীদার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আইডিবি বিশ্বব্যাংকের মতোই একটি উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাংক সত্যিকার অর্থে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়। সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এই ব্যাংক সুদ ও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সহযোগিতা করে থাকে। এরই বিকল্প ইসলামী মডেল আইডিবি। আই আর টি আই-র কর্মকাণ্ডসহ এই ব্যাংক যেসব কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম উম্মাহর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই ব্যাংকের অবদান তাই গুরুত্বের সঙ্গেই স্মরণ করতে হয়।

সারণী-১

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের বিলিকৃত মূলধনে সদস্য দেশসমূহের শেয়ার ও সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির বছর

[২৯.১২.১৪২৪ হিজরী (২০.০২.২০০৪ পর্যন্ত)]

দেশের নাম	অন্তর্ভূক্তির বছর	শেয়ার মূলধন (লক্ষ ইসলামী দীনার)	মোট শেয়ারের শতকরা অংশ
আজারবাইজান[১]	১৯৯২	৯৭.৬	০.১২
আফগানিস্তান	১৯৭৬	৫০.০	০.০৬
আলজিরিয়া	১৯৭৫	২,৪৬৬.৭	৩.১০
আলবেনিয়া	১৯৯৩	২৫.০	০.০৩
ইরাক	১৯৭৯	১৩০.৫	০.১৬
ইরান	১৯৮৯	৬,৯৪৫.১	৮.৭২
ইন্দোনেশিয়া	১৯৭৫	১,৮৫৪.৭	২.৩৩
ইয়েমেন	১৯৭৬	৪৯৬.২	০.৬২
উগাণ্ডা	১৯৭৭	২৪৬.৩	০.৩১
উজবেকিস্তান	২০০৩	২৫.০	০.০৩
ওমান	১৯৭৫	২৭৩.৫	০.৩৪
কমোরো	১৯৮০	২৫.০	০.০৩
কাজাখস্তান	১৯৯৬	৪৯.৬	০.০৬
কাতার	১৯৭৫	৯৭৭.০	১.২৩
কিরঘিজিস্তান	১৯৯৪	৪৯.৬	০.০৬
কুয়েত	১৯৭৫	৯,৮৫৮.৮	১২.৩৮
কোৎ দ্য আইভরি	২০০২	২৫.০	০.০৩
ক্যামেরুন	১৯৭৬	২৪৬.৩	০.৩১
গাম্বিয়া	১৯৮০	৪৯.৬	০.০৬
গিনি	১৯৭৫	২৪৬.৩	০.৩১
গিনি বিসাউ	১৯৭৯	৪৯.৬	০.০৬
গ্যাবন	১৯৮১	২৯৩.২	০.৩৭
জর্দান	১৯৭৫	৩৯৪.৭	০.৫০
জিবুতি	১৯৮০	২৫.০	০.০৩
টোগো	১৯৯৮	৪৯.৬	০.০৬
তাজিকিস্তান	১৯৯৫	৪৯.৬	০.০৬
তিউনিসিয়া	১৯৭৫	১৯৫.৫	০.২৫

দেশের নাম	অন্তর্ভুক্তির বছর	শেয়ার মূলধন (লক্ষ ইসলামী দীনার)	মোট শেয়ারের শতকরা অংশ
তুরস্ক	১৯৭৫	৬,২৬০.৫	৭.৮৬
তুর্কমেনিস্তান	১৯৯৪	২৫.০	০.০৩
নাইজার	১৯৭৫	২৪৬.৩	০.৩১
পাকিস্তান	১৯৭৫	২,৪৬৫.৯	৩.১০
প্যালেষ্টাইন	১৯৭৭	৯৮.৫	০.১২
বারকিনা ফাসো[২]	১৯৭৮	২৪৬.৩	০.৩১
বাহরাইন	১৯৭৫	১৩৮.৯	০.১৭
বাংলাদেশ	১৯৭৫	৯৭৮.২	১.২৩
বেনিন	১৯৮৪	৯৭.৬	০.১২
ব্রুনাই	১৯৮৬	২৪৬.৩	০.৩১
মরক্কো	১৯৭৫	৪৯২.৪	০.৬২
মালয়েশিয়া	১৯৭৫	১,৫৭৮.৯	১.৯৮
মালদ্বীপ	১৯৯৮	২৫.০	০.০৩
মালি	১৯৭৮	৯৭.৬	০.১২
মিশর	১৯৭৫	৬,৮৬৮.৪	৮.৬৩
মোজাম্বিক	১৯৯৬	৪৯.৬	০.০৬
মৌরিতানিয়া	১৯৭৫	৯৭.৬	০.১২
লিবিয়া	১৯৭৫	৭,৯৩৭.৯	৯.৯৭
লেবানন	১৯৭৭	৯৭.৬	০.১২
শাদ	১৯৭৭	৯৭.৬	০.১২
সউদী আরব	১৯৭৫	১৯,৭৮৮.৭	২৪.৮৬
সেনেগাল	১৯৭৭	২৪৬.৫	০.৩১
সিরিয়া	১৯৭৬	৯৯.২	০.১২
সিয়েরালিওন	১৯৮২	৪৯.৬	০.০৬
সুদান	১৯৭৫	৩৯০.৭	০.৪৯
সুরিনাম	১৯৯৭	৪৯.৬	০.০৬
সোমালিয়া	১৯৭৭	২৫.০	০.০৩
সংযুক্ত আরব আমীরাত	১৯৭৫	৫,৬১৬.৭	৭.০৬
৫৫টি দেশ	মোট	৭৯,৬০৭.১	১০০.০০

উৎস : ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ, ১৪২৪ হি.

১. সদস্য দেশগুলোর নাম বাংলা বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো

২. পূর্বের আপার ভোল্টা

সারণী-৫

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান : ১৪০৮-১৪২৪ হিজরী

#	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	পুরস্কারের ক্ষেত্র	হিজরী	খ্রীষ্টাব্দ
১.	প্রফেসর খুরশীদ আহমদ	অর্থনীতি	১৪০৮	১৯৮৮
২.	ডঃ এম. উমার চাপরা	অর্থনীতি	১৪০৯	১৯৮৯
৩.	ডঃ সামী হাসান হামুদ	ব্যাংকিং	১৪০৯	১৯৮৯
৪.	ডঃ এম. আনাস জারকা	অর্থনীতি	১৪১০	১৯৯০
৫.	লেমবাগা উরুসান দান তাবুং হাজী, মালয়েশিয়া	ব্যাংকিং	১৪১০	১৯৯০
৬.	ডঃ ইউসুফ আল-কারযাবী	অর্থনীতি	১৪১১	১৯৯১
৭.	ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমেদ	ব্যাংকিং	১৪১১	১৯৯১
৮.	প্রফেসর সাবাহ আল-দীন যাইম	অর্থনীতি	১৪১২	১৯৯২
৯.	সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকনমিকস, কিং আব্দুলআযীয ইউনিভার্সিটি, সউদী আরব	অর্থনীতি	১৪১৩	১৯৯৩
১০.	ডঃ আহমদ মোহাম্মদ আলী	ব্যাংকিং	১৪১৪	১৯৯৪
১১.	ডঃ মুহাম্মদ উমার যুবায়ের	অর্থনীতি	১৪১৫	১৯৯৫
১২.	জনাব সালেহ আব্দুল্লাহ কামেল	ব্যাংকিং	১৪১৬	১৯৯৬
১৩.	ডঃ রফিক ইউনুস আল-মিসরী ডঃ আবদুল রহমান ইউসরী	অর্থনীতি	১৪১৭	১৯৯৭
১৪.	ডঃ তানজিলুর রহমান	ব্যাংকিং	১৪১৮	১৯৯৮
১৫.	ডঃ মুহাম্মদ আল-হাবীব ইবন আল-খোজা	অর্থনীতি	১৪১৯	১৯৯৯
১৬.	ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক ইকনমিকস, পাকিস্তান	ব্যাংকিং	১৪২০	২০০০
১৭.	ডঃ মনযের কা’ফ ডঃ এস.এম. হাসানুজ্জামান	অর্থনীতি	১৪২১	২০০১
১৮.	প্রফেসর জন প্রেসলে শেখ সাঈদ আহমদ লুতাহ্	ব্যাংকিং	১৪১২	২০০২
১৯.	ড. আব্বাস মিরাখর ড. মোহসীন এস. খান	অর্থনীতি	১৪২৩	২০০৩
২০.	ড. মোহাম্মদ আলী আল-কারী	ব্যাংকিং	১৪২৪	২০০৪

তথ্যসূত্র : ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার সার্কুলারসমূহ।

ইসলামী বীমা বা তাকাফুল : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি

১. ভূমিকা

আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বীমা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ক্ষেত্রবিশেষে এর গুরুত্ব ব্যাংকের চাইতেও বেশী। কেননা দুর্ঘটনার কারণে কারো ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোন কারণে ধ্বংস হয়ে গেলে বীমা ব্যবস্থা যেভাবে তার পাশে দাঁড়াতে ও সহায়তার কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারে ব্যাংকের সে ক্ষমতা বা সুযোগ নেই। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। পরিবারের প্রধান বা মূল উপার্জনকারীর দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বা মৃত্যু হলে পরিবারে যখন দুঃখের অমানিশা নেমে আসে ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয় তখন বীমাই তাদের কার্যকর সহায়তা দিতে পারে। মূলতঃ এই উদ্দেশ্যেই বীমার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। উপরন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থার সফলতার জন্যেও বীমার সহযোগিতা অপরিহার্য। আইনগত কারণেই ব্যাংকিং সেক্টর বীমার সাহায্য নিতে বাধ্য। তাছাড়া বীমা কোম্পানীর সংগৃহীত তহবিল ব্যাংকিং খাতে মূলধন যোগায়। এসব কারণে ব্যাংক ও বীমা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল।

২. প্রচলিত বীমার বিরুদ্ধে ইসলামের আপত্তি

প্রচলিত সনাতন বীমা মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ইসলামী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বিপদ-মুসিবত ও আকস্মিক দুর্যোগ মুকাবিলা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্যে নিরাপদ ভবিষ্যত তৈরীর ক্ষেত্রে ইসলামে কোন আপত্তি নেই। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন-

"তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও অপর লোকদের উপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদেরকে সচ্ছল, ধনী ও সম্পদশালী রেখে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অনেক ভাল।" (সহীহ আল্-বুখারী)

তিনি আরও বলেন- "যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন লোকের সংকট নিরসন করার উদ্যোগ নেয় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সংকট হতে অব্যাহতি দেবেন।" (মুসলিম)

আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রচলিত সুদভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা ভবিষ্যত প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে একটি স্বেচ্ছাধীন সঞ্চয়ী ব্যবস্থা বলেই মনে হয়। কিন্তু এতে এমন পাঁচটি

মৌলিক শরীয়াহবিরোধী উপাদান রয়েছে যার অপনোদন বা প্রতিবিধান না ঘটলে মুসলমানদের পক্ষে ঈমান-আকীদা বজায় রেখে এই বীমা পদ্ধতিতে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব। শরীয়াহবিরোধী এই উপাদানগুলো হচ্ছে : (১) আল্-ঘারার, (২) আল্-মাইসির, (৩) আল্-রিবা, (৪) শরীয়াহবিরোধী নোমিনী মনোনয়ন এবং (৫) প্রিমিয়াম প্রদানের বিদ্যমান শর্ত।

১. আল্-ঘারার (অজ্ঞতা/অনিশ্চয়তা): প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রহীতা বীমা কোম্পানীর (সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই) সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার পলিসি গ্রহণের চুক্তি সম্পন্ন করার পর সেই টাকা অনেকগুলো সমান কিস্তিতে প্রিমিয়াম হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে জমা দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার পর বীমা গ্রহীতা দুর্ঘটনা কবলিত হলে বা মৃত্যুবরণ করলে বীমা কোম্পানী পলিসির চুক্তি মুতাবেক পুরো টাকাটাই বীমা গ্রহীতা বা তার নোমিনীকে প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই টাকা কোথা থেকে কিভাবে প্রদান করা হলো তা বীমা গ্রহণকারীর কাছে অজানা বা অজ্ঞাত থাকে। প্রচলিত সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা উভয় ক্ষেত্রেই এই অজ্ঞতা বা অনিশ্চয়তার উপাদান বিদ্যমান। শরীয়াহর পরিভাষায় একে বলা হয় আল-ঘারার।

২. আল্-মাইসির (জুয়া): বীমার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জীবন বীমার ক্ষেত্রে আল-ঘারার বিদ্যমান থাকার কারণেই জুয়া বা আল-মাইসির-এর উদ্ভব ঘটে। উদাহরণতঃ যখন জীবন বীমার কোন পলিসি গ্রহীতা তার বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন তখন চুক্তিবদ্ধ প্রিমিয়ামের আংশিক পরিশোধ করা হলেও তার নোমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অর্থের পুরোটাই পেয়ে থাকেন। শরীয়াহর দৃষ্টিতে এটা জুয়া।

৩. আল-রিবা (সুদ): প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলোর কার্যক্রমে সুদের লেনদেন, সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে যা শরীয়াহ আইন ও অনুশাসনের পরিপন্থী বলে ফকীহ্গণ সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন।

৪. শরীয়াহবিরোধী নোমিনী মনোনয়ন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আল-নিসায় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত এবং তাদের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রহীতা তার ইচ্ছামাফিক যে কোন ব্যক্তিকে নোমিনী নির্ধারণ করতে পারে। সকল ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে এই নোমিনীই বীমার পুরো অর্থ পাবে যা শরীয়াহর সুস্পষ্ট বরখেলাপ। এটা আদল ও ইহসানবিরোধী।

৫. প্রিমিয়াম প্রদানের বিদ্যমান শর্ত: বিদ্যমান বীমা আইনে (জীবনবীমা ব্যতীত) বীমা পলিসি কার্যকর হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। ঐ মেয়াদের মধ্যে একটি কিস্তিও যদি অনাদায়ী থাকে তাহলে বীমা গ্রহীতা ঐ সময় পর্যন্ত

যত টাকা প্রিমিয়াম হিসাবে দিয়েছেন তার পুরোটাই মার যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থায় বীমা কার্যকর হওয়ার জন্যে ন্যূনতম দুই বছর প্রিমিয়াম দেওয়া বাধ্যতামূলক। কোন বীমা গ্রহীতা যদি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম দেন তাহলে তাকে দু'বছরে মোট আটটি কিস্তি দিতে হবে। কিন্তু তিনি যদি সাতটি কিস্তি জমা দেওয়ার পর বাকী কিস্তিটি কোনো কারণে দিতে না পারেন তাহলে ঐ পলিসিটি কার্যকর বলে গণ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট বীমা গ্রহীতা বা তার নোমিনী কিছুই পাবেন না। অর্থাৎ, বীমা গ্রহীতার মূলধনই খোয়া যাবে। এটা আদল ও ইহসানের পরিপন্থী।

৩. ইসলামী তাকাফুল

উপরোক্ত সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহ্র প্রয়োজন পূরণ ও ইসলামে গ্রহণযোগ্য একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থার সন্ধানে ইসলামী আইনবেত্তা ও বীমা বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা, গভীর গবেষণা ও পর্যালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছেন। ইসলামী শরীয়াহসম্মত বীমা পরিচালনা প্রসঙ্গে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৬১ সালে দামেস্কে, ১৯৬৫ সালে কায়রোয়, ১৯৭৫ সালে মরোক্কো ও লিবিয়ায় এবং ১৯৭৬ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশেষে ১৯৮০ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে সংস্থাভুক্ত দেশসমূহে ইসলামী বীমা চালু করার সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, বাহরাইনে সর্বপ্রথম ইসলামী বীমার কার্যক্রম শুরু হয়। এজন্যে সে দেশে পৃথক আইনও প্রণীত হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী বীমা বিস্তৃতি লাভ করে। আফ্রিকায় এর কার্যক্রম প্রথম শুরু হয় সুদানে। দূর প্রাচ্যে মালয়েশিয়া এ ব্যাপারে এগিয়ে রয়েছে। ইসলামী বীমার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সে দেশে "মালয়েশিয়া তাকাফুল এ্যাক্ট, ১৯৮৪" নামে পৃথক আইন প্রণীত হয়েছে।

ইসলামী বীমা তাকাফুল নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আরবী *কাফালা* শব্দ থেকে এটি উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ যৌথ জামিননামা বা সামষ্টিক নিশ্চয়তা, অর্থাৎ পারস্পারিক দায়িত্ব গ্রহণ। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকাফুল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সদস্য গ্রুপের যৌথ নিশ্চয়তার অঙ্গীকার যা দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য বা সদস্যদের ক্ষতিপূরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। গ্রুপের সদস্যগণ এমন একটি যৌথ নিশ্চয়তার চুক্তিতে আবদ্ধ হন যাতে কোন সদস্য দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের শিকার হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ করতে পারেন। বস্তুতঃ এটি হচ্ছে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মীতা। এই পদ্ধতিতে গ্রুপের সদস্যগণ তাদেরই একজনের বিপদে সাহায্য করার জন্যে সকলেই একযোগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে আসেন। তাকাফুল ব্যবস্থার ভিত্তি হলো ভ্রাতৃত্ব (Brotherhood), সংহতি (Solidarity) ও পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual Assistance)। ইসলামী তাকাফুল তাই একই সঙ্গে একটি

সহায়তামূলক ও কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং এক মুমিন ভাইয়ের আপদকালে তার সাহায্যে এগিয়ে আসার গোষ্ঠীবদ্ধ উপায়ও বটে।

এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ায় গৃহীত তাকাফুল এ্যাক্টের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে-

"Takaful means a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance which provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need whereby the participants mutually agree to contribute for the purpose .... its aims and operations do not involve any element which is not approved by the *Shariah*."

অর্থাৎ, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা তাকাফুল এমন এক স্কীম যেখানে প্রয়োজনের সময়ে অংশগ্রহণকারীরা পারস্পরিক আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা যোগায়। এই উদ্দেশ্যে তারা পরস্পর সম্মত হয়েই দান করে থাকে .... শরীয়াহর অনুমোদন নেই এমন কোনো উপাদান এর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকে না।

৪. ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ বিদ্যমান সুদী বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের জন্যে যেসব পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন সেগুলো এক কথায় যুগান্তকারী ও বীমা গ্রহীতার স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে খুবই বলিষ্ঠ ও কার্যকর। এসব পরিবর্তন ও সংযোজনই ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত। যথা -

ক. কোম্পানী তার তহবিল শরীয়াহসম্মত উপায়ে বিনিয়োগ করবে। শরীয়াহতে নিষিদ্ধ ও সুদের সংশ্রব রয়েছে এমন কোন ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য বা কার্যক্রমে কোন অর্থ বিনিয়োগ বা লেনদেন করা চলবে না। তাকাফুল পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের বিধি-বিধানের উৎস হবে শরীয়াহ।

খ. প্রচলিত বীমা ব্যবসায়ে সৃষ্ট তহবিল বীমা কোম্পানীর মালিকানায় থাকে। কিন্তু ইসলামী বীমা কোম্পানীতে পলিসি গ্রহীতাদের অর্থে সৃষ্ট তহবিল তাদেরই মালিকানায় থাকে। বীমা গ্রহীতাগণকে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের মতোই বিবেচনা করা হয় যেন তারা কোম্পানীর মুনাফা বা নীট উদ্বৃত্তের অংশীদার হতে পারেন।

গ. কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেকটরস-এ বীমা গ্রহীতাগণের পক্ষ হতে পর্যাপ্ত প্রতিনিধি থাকবে। তারা কোম্পানীর নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে সকল হিসাব পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা রাখবে।

ঘ. কোন নির্দিষ্ট বছরে বীমা গ্রহীতাগণ যে প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন তাতে যদি কোম্পানীতে তাদের অংশের লোকসান পূরণ না হয় তাহলে তারা অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

ঙ. বীমা প্রতিষ্ঠানটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই একটি শরীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড থাকবে। এই বোর্ড শরীয়াহর আলোকে প্রতিটি কাজ তদারক এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

চ. ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থায় নোমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি ট্রাস্টি বা অছি হিসেবে কাজ করবে। প্রাপ্ত অর্থ শরীয়াহসম্মত ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া তারই দায়িত্ব।

ছ. বীমা কোম্পানী দুটি পৃথক ও সুস্পষ্ট হিসাব (Accounts) রক্ষা করবে : (ক) শেয়ারহোল্ডারদের হিসাব ও (খ) পলিসি গ্রহীতাদের হিসাব। পলিসি গ্রহীতাদের হিসাবে তাদের জমাকৃত প্রিমিয়াম, চাঁদা এবং তাদের তহবিল বিনিয়োগ করার ফলে অর্জিত মুনাফায় তাদের যে অংশ সবই জমা হবে।

পলিসি গ্রহীতাদের হিসাব থেকে সার্ভিস চার্জ ও দাবী পূরণের পর উদ্বৃত্ত হতে প্রয়োজনীয় রিজার্ভ আলাদা রেখে অবশিষ্ট অর্থ তাদের মধ্যেই পুনঃবন্টিত হবে। যদি কখনো কোন ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে তা সাধারণ রিজার্ভ তহবিল হতে পূরণ করা হবে। অবশ্য যদি সাধারণ রিজার্ভ তহবিল ঘাটতি পূরণের জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত না হয় তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের রিজার্ভ ও মূলধন হতে তা করযে হাসানা আকারে গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে পলিসি গ্রহীতাদের হিসাবে উদ্বৃত্ত হলে তা থেকে প্রথমেই এই করযে হাসানা পরিশোধিত হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোনক্রমেই পলিসি গ্রহীতাদের তহবিল বা উদ্বৃত্ত গ্রহণ করতে পারবে না। শেয়ার মূলধন বিনিয়োগ হতে উপার্জিত আয় শেয়ারহোল্ডারদের একাউন্টেই দেখানো হবে এবং চলতি ব্যয় ও অন্যান্য দাবী পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত অর্থ তাদের মধ্যেই বন্টিত হবে।

জ. একটি যাকাত বা সাদাকাহ তহবিল গঠিত হতে হবে। শেয়ার মূলধন, রিজার্ভ ও মুনাফা হতে প্রতি বছর ২.৫% হারে গ্রহণ করে এই তহবিলে জমা করা হবে। পলিসি গ্রহীতাদের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের হিসাবের নীট উদ্বৃত্ত হতেও বার্ষিক ২.৫% হারে যাকাত আদায় করে এই তহবিলে জমা দেওয়া যেতে পারে। তহবিলটি কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরসের গৃহীত উপবিধি অনুসারে বোর্ড অব ট্রাষ্টি দ্বারা পরিচালিত হবে।

৫. তাকাফুলের প্রকারভেদ

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার মত ইসলামী তাকাফুল বা বীমাও দুই ধরনের। যথা:-

ক. পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা;

খ. সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমা।

ক. পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা

পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা মূলতঃ একটি বিনিয়োগ কর্মসূচী যে বিনিয়োগ বীমা গ্রহীতাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যত আর্থিক নিরপত্তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রম পরিচালিত হয় দীর্ঘমেয়াদী মুদারাবা নীতি অনুসারে। এর আওতায় কোন ব্যক্তি নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করেন। এই সঞ্চয় লাভজনক কাজে বিনিয়োজিত হয় এবং মুনাফা তার হিসাবে জমা হয়। সমুদয় অর্থই বীমা গ্রহীতা ও তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার কাজে আসে। উপরন্তু এই কর্মসূচীর আওতায় বীমা গ্রহীতাদের কারো মৃত্যু ঘটলে ঐ সদস্যের পরিবারবর্গ বীমা চুক্তির সমুদয় অর্থ ও অর্জিত মুনাফা পেয়ে থাকে।

খ. সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমা

সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমার আওতায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ একক বা দলবদ্ধভাবে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের (কল-কারখানা, গুদামঘর, পণ্য, যানবাহন ইত্যাদি) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডজনিত কারণে ক্ষয়-ক্ষতি বা ধ্বংসের বিপরীতে বীমা সম্পাদন করতে পারে। ইসলামী জীবন বীমার অনুরূপ এ বীমার চুক্তি ও শর্তাবলী নির্ধারিত হয় মুদারাবা নীতির উপর ভিত্তি করে। সাধারণ তাকাফুলের মেয়াদকাল সাধারণতঃ এক বছর। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় নবায়ন করা যায়।

তাকাফুল ব্যবস্থার অধীনে বীমা গ্রহীতা যে প্রিমিয়াম প্রদান করে তার নির্দিষ্ট একটি অংশ *তাবাররু* বা ডোনেশন হিসাবে গণ্য হয়। দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত কারণে বীমা গ্রহীতাদের সম্পদের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যে এই তাবাররু ও কোম্পানীর মুনাফার অংশবিশেষ সমন্বয়েই তহবিল গঠিত হয়। সাধারণ তাকাফুল কোম্পানী বীমা তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করে তাও ঐ তহবিলে জমা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতেই বীমা কর্তৃপক্ষ ঐ তহবিল থেকেই বীমা গ্রহীতাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। মূলতঃ তাকাফুল কোম্পানী ঐ তহবিলের ট্রাস্টী হিসাবে কাজ করে। তাকাফুল পদ্ধতির অভিন্ন লক্ষ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান হলেও সাধারণ তাকাফুলে পারিবারিক তাকাফুলের অনুরূপ সঞ্চয়ের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে না।

তবে এই বীমার অধীনে গ্রাহককে যদি কোন ক্ষতিপূরণ দিতে না হয় এবং বীমা কার্যক্রম পরিচালনার আনুষঙ্গিক খরচ বাদে বীমা গ্রহীতার একাউন্টে যদি উদ্বৃত্ত অর্থ (মুনাফাসহ) জমা থাকে তাহলে ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার মধ্যে মুদারাবার নীতি অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত আনুপাতিক হারে (যথা ৬:৪, ৫.৫:৪.৫ বা

৫:৫) বন্টিত হবে। বীমার মেয়াদকাল শেষে তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রচলিত সুদনির্ভর সাধারণ বীমা ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থার এখানেই বিরাট পার্থক্য এবং ইসলামী পদ্ধতি যে বাস্তবিকই একই সঙ্গে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এটা তার প্রকৃষ্ট নজীর।

৬. ইসলামী বীমার কার্যপদ্ধতি

ইসলামী তাকাফুল যেহেতু একটি ইসলামী ব্যবসা পদ্ধতি তাই এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইসলামী শরীয়াহ মুতাবিক অর্থাৎ, *আহকাম আল-মুয়ামালাহ*-র নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী। তাকাফুলের সকল চুক্তি (*আকাদ*) সম্পাদিত হয় মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে। এই নীতির ভিত্তিতে গঠিত ইসলামী বীমা বা তাকাফুল ব্যবস্থাপনার অধীনে বীমা কোম্পানী মুদারিব হিসাবে বীমা গ্রহীতার (*সাহিব আল-মাল*) নিকট হতে কিস্তিতে যে প্রিমিয়াম গ্রহণ করেন তার নাম *রাস আল-মাল*।

ব্যবসায়িক চুক্তি হিসাবে তাকাফুলে এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে যে, কোম্পানী (মুদারিব) কিভাবে বীমা গ্রহীতাদের (সাহিব আল-মাল) নিকট হতে গৃহীত প্রিমিয়াম (রাস আল-মাল) কাজে খাটাবে। তাকাফুলের নিয়ম-নীতি মুতাবিক বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারী কোম্পানী উভয়ের দায়-দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে চুক্তি সম্পাদিত হবে। উপরন্তু মুদারাবার নিয়ম অনুসারেই বীমা গ্রহীতাকে তার বিনিয়োগকৃত প্রিমিয়ামের লভ্যাংশ প্রদানের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হবে। উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে এই লভ্যাংশ বন্টনের অনুপাত ৭:৩, ৬:৪, ৫:৫, ৪:৬ অথবা অন্য যে কোন স্বীকৃত অনুপাত হতে পারে। তবে সাথী বীমা গ্রহীতাদের ক্ষতিপূরণে সহায়তা প্রদানের দায়-দায়িত্ব পূরণের পরই কেবল তাকাফুলে মুনাফা বা উদ্বৃত্ত অর্থ বন্টন কার্যকর হয়।

তাকাফুলে যে অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত হয়ে একে পুরো ইসলামী চরিত্র দান করেছে তার নাম তাবাররু বা ডোনেশন। তাকাফুল পদ্ধতির যৌথ জামানত এবং পারস্পরিক সাহায্য প্রদানের দায়-দায়িত্ব পালনের জন্যে ইসলামী তাকাফুলে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দেয় প্রিমিয়ামের নির্দিষ্ট একটি অংশ সহযোগীদের দুঃসময়ে দান করার অঙ্গীকারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমা দিয়ে থাকেন। এটাই তাবাররু।

এজন্যেই ইসলামী তাকাফুলে বীমা গ্রহীতাদের একাউন্টে দুটি ভাগ থাকে: (১) পারটিসিপেন্টস একাউন্ট (পি.এ.) এবং (২) পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট (পি.এস.এ.)। বীমা গ্রহীতার কিস্তির প্রিমিয়ামের প্রায় পুরোটাই পি.এ.-তে জমা হয় শুধুমাত্র সঞ্চয় তথা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। অবশিষ্ট সামান্য অংশ পি.এস.এ.-তে জমা হয় তাবাররু হিসাবে। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী কোন বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের অথবা দুর্ঘটনা কবলিত খোদ বীমা গ্রহীতাকেই তাকাফুল ফায়দা প্রদান করার জন্যে পি.এস.এ বা তাবাররুর এই অর্থ ব্যবহৃত হয়। তাই পি.এ.

সঞ্চয় সংগ্রহে ভূমিকা রাখে এবং পি.এস.এ. মৃত্যুজনিত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে পরিশোধযোগ্য একটি পারস্পরিক সাহায্য তহবিল গঠনে ভূমিকা রাখে। তাকাফুল প্রিমিয়ামের কত অংশ পি.এ.-তে এবং কত অংশ পি.এস.এ.-তে তাবাররু হিসাবে জমা হবে তা নির্ধারিত হয় বীমা গ্রহীতার বয়স, অংশ গ্রহণের মেয়াদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির ভিত্তিতে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে মূল প্রিমিয়ামের ২% ন্যূনতম তাবাররু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমায় অংশ গ্রহণকারীর যদি তাকাফুলের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু হয় তাহলে বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ তার পলিসি গ্রহণের তারিখ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পারটিসিপেন্টস একাউন্টে পরিশোধিত কিস্তির সমুদয় টাকা এবং কিস্তির বিনিয়োগকৃত টাকার জন্যে প্রাপ্ত মুনাফার অংশও পাবেন। উপরন্তু ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকলে অবশিষ্ট কিস্তিগুলোতে মোট যত অর্থ জমা দিতেন তার সমপরিমাণ অর্থও তার উত্তরাধিকারীগণ পাবেন। বীমা গ্রহীতাদের তাবাররু হিসাবে প্রদত্ত অর্থ দিয়ে গঠিত পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট থেকে বকেয়া কিস্তির সমপরিমাণ এই অর্থ প্রদান করা হয়। অপরদিকে কোন বীমা গ্রহীতা তার সম্পাদিত পারিবারিক তাকাফুলের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর জীবিত থাকলে তার নিজস্ব পরিশোধিত প্রিমিয়ামসমূহের সমুদয় টাকা এবং টাকার বিপরীতে প্রাপ্ত মুনাফার অংশ সবই পাবেন।

উদাহরণস্বরূপ সারণী-১-এ মালয়েশিয়ার শিরকত তাকাফুল মালয়েশিয়া সেনদিরিন বেরহাদ-এর অনুসৃত তাকাফুল কিস্তির পি.এ. ও পি.এস.এ.-র হার উল্লেখ করা হলো।

সারণী- ১

কিস্তিতে প্রদেয় প্রিমিয়ামে পি.এ. ও পি.এস.এ.-র হার

বয়সের গ্রুপ	পারিবারিক তাকাফুলে অংশ গ্রহণের মেয়াদ					
	১০ বছর		১৫ বছর		২০ বছর	
	পি.এ.	পি. এস. এ.	পি.এ.	পি.এস.এ.	পি.এ.	পি.এস.এ.
১৮-৩০	৯৮.০%	২.০%	৯৬.৫%	৩.৫%	৯৫.০%	৫.০%
৩১-৩৫	৯৭.৫%	২.৫%	৯৫.৫%	৪.৫%	৯৩.৫%	৬.৫%
৩৬-৪০	৯৬.৫%	৩.৫%	৯৪.০%	৬.০%	৯১.০%	৯.০%
৪১-৪৫	৯৫.০%	৫.০%	৯১.৫%	৮.৫%	-	-
৪৬-৫০	৯৩.০%	৭.০%	-	-	-	-

উৎস : Islami Bank Bangladesh Ltd., *Islamic Banking and Insurance*, Seminar Proceedings (Dhaka, 1990).

পারিবারিক তাকাফুল পরিকল্পনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি কোন বীমা গ্রহীতা তার অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে না চান অথবা কোন কারণে প্রিমিয়াম প্রদানে অপারগ হয়ে পড়েন তাহলে তিনি তার প্রদত্ত কিস্তির মোট অর্থ এবং কিস্তির অর্থ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা যা তার পি.এ.-তে জমা হয়েছে সবই পাবেন। তবে তাবাররু হিসাবে (পি.এস. এ.) জমাকৃত অর্থ বা এই হিসাবে অর্জিত মুনাফার অংশ কোন কিছুই তিনি পাবেন না।

৭. বাংলাদেশে ইসলামী বীমা

বাংলাদেশে ইসলামী পদ্ধতির বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জন্যে জনমত গঠন ও পরিচিতির উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৯ সালে অক্টোবর মাসে ঢাকায় এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। পরবর্তীকালে ইসলামপ্রিয় কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় একটি ইসলামী তাকাফুল কোম্পানী গঠিত হয় এবং বিধিবদ্ধ কোম্পানী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন জানায়। এক দশক পরে ১৯৯৯ সালে চার/পাঁচটি ইসলামী সাধারণ ও জীবন বীমা কোম্পানী সরকারের অনুমোদন লাভ করে কাজ শুরু করে।

তবে এর যথার্থ কার্যকারিতা ও সাফল্যের জন্যে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূর করা অপরিহার্য। বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে ১৯৩৮ সালের বীমা আইন ও ১৯৫৮ সালের বীমা বিধিমালার আওতায়। এই আইনের কারণে ইসলামী বীমাকে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে নীচে সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করা গেল।

ক. প্রচলিত বীমা আইনে প্রিমিয়াম সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের নির্ধারিত অংশ সরকারী সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের বিধান রয়েছে। এখানে সুদের প্রসঙ্গ থাকায় ইসলামী বীমার জন্যে এই আইন মানা অসম্ভব।

খ. প্রচলিত বীমা আইনে বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণ ও ব্যালান্সশীট তৈরীর ক্ষেত্রে মুদারাবা, তাবাররু, যাকাত, সাদাকাহ ইত্যাদি শরীয়াহসম্মত শিরোনামে হিসাব দেখাবার সুযোগ নেই। ফলে বাধ্য হয়েই ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোকে অবৈধ পন্থার আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

গ. বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বীমার সুবিধা বন্টনের সুযোগ নেই। অপরপক্ষে বর্তমান স্বেচ্ছাধীন নোমিনী মনোনয়নের বিধান শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক।

ঘ. বিদ্যমান আইনে পলিসি বাজেয়াপ্তকরণের যে বিধান রয়েছে তা শরীয়াহতে অনুমোদনযোগ্য নয়। এর সমাধান হওয়া আবশ্যক।

ঙ. তাকাফুল চুক্তিতে সমর্পণের ক্ষেত্রে পলিসি গ্রহীতার প্রদত্ত সমুদয় প্রিমিয়াম এবং তা বিনিয়োগে যা মুনাফা হয়েছে সবই ফেরত দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে প্রচলিত জীবন

বীমা পলিসিতে মেয়াদের প্রাথমিক বছরগুলোতে পলিসি গ্রহীতার পরিশোধিত প্রিমিয়াম প্রদত্ত সমর্পণ মূল্যের চেয়ে অনেক কম হয়ে থাকে।

চ. প্রচলিত আইনে বীমা পরিকল্পের যে রেটচার্ট ব্যবহৃত হচ্ছে তা ইসলামী তাকাফুলের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ মুদারাবা ও তাবাররুর ভিত্তিতে রেটচার্ট তৈরী হয়নি।

ছ. তাকাফুলের পলিসি ডকুমেন্টেই লাভ-লোকসান বন্টনের এবং সুবিধা প্রদানের উৎসগুলোর উল্লেখ থাকা শরীয়াহর দাবী। অথচ প্রচলিত বীমা আইনের কারণে তা আদৌ সম্ভব না।

জ. ইসলামী তাকাফুলের জন্যে যে একচ্যুয়ারীর প্রয়োজন বাংলাদেশে তার নিদারুণ অভাব। এমনকি ওআইসি-র মত প্রতিষ্ঠানও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়নি। এ সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিকভাবেই সকল ইসলামী তাকাফুল কোম্পানীর একযোগে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

ঝ. প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় পুনর্বীমা করার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও সুদের প্রসঙ্গ যুক্ত। উপরন্তু বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্বীমা করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে এটি দারুণ একটি সমস্যা।

ঞ. দক্ষ জনশক্তি ছাড়া তাকাফুলের দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাকাফুলের সাথে যে সকল কর্মকর্তা ও মাঠকর্মী সংশ্লিষ্ট আছেন তারা এর ইসলামী কলা-কৌশল সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। এখানে শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রায় সকলেই এসেছেন সুদী পদ্ধতির বীমা কোম্পানী থেকে। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বিপুল অংশই তরুণ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব সুস্পষ্ট। এজন্যে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর মানসম্পন্ন একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা সময়ের দাবী।

৮. উপসংহার

সুদনির্ভর বীমা পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে ইসলামী পদ্ধতিতে বীমা বা তাকাফুল পরিচালনার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর হতেই অর্থাৎ ১৯৭৫ সালেই। বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা, আইনগত খুঁটিনাটি দূর, সর্বোপরি শরীয়াহসম্মত কর্ম ও বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবনে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে তো বটেই, অমুলিম দেশেও ইসলামী বীমা কোম্পানী বা *শিরকত আল-তাকাফুল আল-ইসলামিয়া* প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। বাংলাদেশেও ইসলামী বীমা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ, যার অধিকাংশই শরীয়াহর সাথে সম্পৃক্ত, দূর করতে পারলে ইসলামী তাকাফুলও ইসলামী ব্যাংকের মতই সনাতন বীমা ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের সমস্যা : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে জানার ও তা বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনা রয়েছে। বিশেষতঃ কিভাবে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্বন্ধে তরুণ সমাজে যথেষ্ট কৌতূহল বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক পথ নির্দেশনার যথেষ্ট অভাবই শুধু প্রধান অন্তরায় নয়, সমস্যাসমূহ যথাযথ চিহ্নিত করা হয়নি আজ অবধি। শুধু সস্তা শ্লোগান বা আন্তরিক সদিচ্ছা এদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করে দেবে না। বরং এজন্যে চাই প্রকৃত সমস্যাগুলো সনাক্ত করার প্রয়াস। এই আলোচনায় সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। আশা করা যায়, এসব সমস্যা সমাধানের জন্যে ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই সচেতনভাবে চিন্তা এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন আন্তরিকতার সাথে।

সমস্যাসমূহ

১. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এদেশের সরকার। বাংলদেশের জনসাধারণের ৮৬% মুসলিম। তাই সরাসরি এদের জীবনাদর্শের বিরোধিতা করা কোন সরকারের পক্ষেই আদৌ সম্ভব নয়। এজন্যে শেখ মুজিবর রহমান যেমন তাঁর বক্তৃতায় 'ইন্‌শাল্লাহ', 'আল্লাহর রহমতে' বলতেন, তেমনি জিয়াউর রহমানও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করতেন। নির্বাচনের সময়ে জনগণের কাছে ভোট চাইতে গিয়ে আওয়ামী লীগকে বলতে হয় - "নৌকার মালিক তুই আল্লাহ। "বি.এন.পি. বলে - "ধানের শীষে বিসমিল্লাহ"। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ক্ষমতার মসনদে একবার আসীন হওয়ার পর সবাই পূর্বকথা ভুলে যান বেমালুম। তাই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কোথাও ইসলামী অর্থনীতির কোন দাবী বা বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নের প্রতি সরকারের কোন আগ্রহ থাকে না। সরকার এক্ষেত্রে জনগণের দাবীকে কিন্তু সরাসরি বিরোধিতা করেন না। বরং কৌশল হিসাবে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেন বা কমিশন বসান যার সদস্যদের অধিকাংশই ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধী, অথবা খুব বেশী হলে সেক্যুলার মতাদর্শের অনুসারী। সুতরাং, এসব রিপোর্ট আদৌ জনগণের আশা-আকাংখার অনুসারী হয় না। অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্টগুলো চলে যায় হিমাগারে। এভাবেই সরকারের অনীহা কিংবা সত্যিকার আগ্রহের অভাবেই ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের যে-কোন গণদাবী এদেশে কার্যতঃ উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

২. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দু' একটি দল ছাড়া প্রায় সকল দলই ইসলামী জীবন-বিধান বাস্তবায়নের বিরোধী। রাজনৈতিক দলসমূহের চেষ্টার ফলেই জনগণের আশা-আকাংখা বাস্তাবায়িত হওয়ার সুযোগ ঘটে। কিন্তু তারাই যদি জনগণের ঈমান-আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়ে কথা বলে তাহলে জনগণের আশা-আকাংখা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে না। ইসলামী জীবনাদর্শবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাস, শঠতা ও ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্ষমতায় যাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। এদেশে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইত্তেহাদুল উম্মাহ, নেজামে ইসলাম, খেলাফত মজলিস, মুসলিম লীগ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের কথা বলে থাকে। এদের মধ্যে কেবলমাত্র জামায়াতে ইসলামীরই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রয়েছে এবং একটি সুশৃংখল কর্মীবাহিনী রয়েছে সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপ লাভ করছে না একারণেই যে, না তারা জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে ক্ষমতায় যেতে পেরেছে, না সহযোগী সংগঠনগুলো তাদের পুরো মদদ যোগাচ্ছে। বরং ইসলাম বাস্তবায়ন যাদের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে নেই তারাই বার বার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার কারণে বর্তমান ত্রিশংকু অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

৩. এদেশে কর্মরত এনজিওগুলোর প্রায় সবগুলোই ইসলামবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত। বাংলাদেশ সরকার এদের কর্মসূচী জেনেও এদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না। গত ১৯শে আগষ্ট, ১৯৯২ সরকার এনজিওগুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এডাবের সরকারী নিবন্ধন বাতিলের ঘোষণা দেন। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ঐদিন বিকালেই আরেকটি আদেশ জারী করে পূর্বের আদেশ বাতিল করা হয় এনজিও কর্মকর্তা ও দাতা দেশগুলোর চাপে। [*দৈনিক সংগ্রাম*, ২৪ আগষ্ট, ১৯৯২]

এদেশে এনজিওগুলো বিকল্প সরকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এ অভিযোগ নতুন নয়। সরকারের কর্তৃত্ব অনেকক্ষেত্রেই এনজিওগুলো গ্রাহ্য করে না। সরকারের কাছে জবাবদিহিতারও প্রয়োজনবোধ করে না। এরা বিদেশী উৎস হতে প্রতি বছর কি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে এবং তা কোথায় কোন কর্মসূচীতে খরচ করে তার কোন স্বচছ হিসাবও তারা সরকারকে দেয় না। উপরন্তু এতই এদের খুঁটির জোর, এদের পেছনে দাতা দেশগুলোর অবস্থান এতই শক্ত যে, এদের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে সরকার আরও একবার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ বস্তিতে এনজিও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সরকার এক নির্দেশ জারী করে। সকলেই জানে বস্তিগুলো এনজিওদের কার্যক্রমের এক বিরাট ক্ষেত্র। এরাই প্রধানতঃ বস্তিগুলো জিইয়ে রাখার কাজ করে যাচেছ। অথচ বস্তিগুলোই নগর জীবনের বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম ও অপরাধের উৎস ও আশ্রয়স্থল। এজন্যে সরকার যখন একই সংগে বস্তি উচ্ছেদ কর্মসূচী গ্রহণ ও বস্তিতে এনজিও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেয় তখন দেশবাসী তাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু এনজিওগুলো এর প্রবল বিরোধিতা করে। এ থেকেই এদের

বস্তিপ্রেমের রহস্য বুঝতে কারও বাকী থাকার কথা নয়। এদেরই চাপে মাত্র আড়াই মাসের মাথায় (১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯) সরকার তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। (*দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৯)

উল্লেখ্য, শহুরে দারিদ্র্য দূরীকরণে এনজিওদের আদৌ কোন ভূমিকা নেই। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণেও অধিকাংশ এনজিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। ইউএনডিপির এক রিপোর্টে মাঠ জরীপের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এনজিওদের তৎপরতার মূল্যায়নে বলা হয়েছে এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তেমন উপকারে আসছে না। এছাড়া এনজিওদের প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ স্বল্প; কিন্তু সুদের হার, ঋণদাতাদের দুর্ব্যবহার এবং ঋণগ্রহীতাদের হয়রানি অনেক বেশী। একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, মহাজনী ঋণের চড়া সুদের হার থেকে রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এদেশের শীর্ষস্থানীয় এনজিওধর্মী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়কৃত প্রকৃত সুদের হার ২১৯% -এরও অধিক। (*দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)। উপরন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ধ্বংস, অর্থনৈতিক শোষণ আরও স্থায়ী, গোষ্ঠীগত বা বিশেষ রাজনৈতিক দলের খবরদারী এবং পারিবারিক ভাঙন সৃষ্টিতে তৎপর থাকার মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে প্রায় সকল এনজিওর বিরুদ্ধে।

আজ কে না জানে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড মিশনারী ইভানজেলিজম, দ্য স্যালভেশন আর্মি, সেভেনথ ডে এ্যাডভেনটিষ্ট চার্চ, বাংলাদেশ লুথারিয়ান মিশন, সোস্যাল ইনস্টিটিউশান বোর্ড, খ্রীষ্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি, ফিনিস ফ্রি ফরেন মিশন, ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ, হীড বাংলাদেশ, কারিতাস, ওয়ার্ল্ড মিশন প্রেয়ার লীগ, দীপ শিখা, ফ্রি ব্যাপটিষ্ট চার্চ, ইয়ং ক্রিশ্চিয়ান ওয়ার্কার্স, ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন, তেরে দেস হোমস, ভলান্টারী সার্ভিস ওভারসীজ, শান্তাল মিশন, খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (CCDB), মিশনারীজ অব চ্যারিটি, খ্রীষ্টিয়ান লাইফ বাংলাদেশ, চার্চেস অব গড মিশন, সেভ দ্য চিলড্রেন (অষ্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), রাড্ডা বারনেন, দামিয়েন ফাউন্ডেশান, অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারী, ল্যাপরসি মিশন প্রভৃতি সংস্থা এদেশের দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সেবা ও সাহায্য বিতরণের নামে আসলে ইসলামবিরোধী ধ্যানধারণারই প্রচার ও প্রসারের কাজে লিপ্ত। ছলে-বলে-কৌশলে তারা ধর্মান্তরকরণের কাজও চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু খ্রীষ্টান না হওয়ার অপরাধে পাঁচ শতাধিক কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ (*দৈনিক সংগ্রাম*, ১১ নভেম্বর, ১৯৯৯)। চার্চিয়ান ফেডারেশনের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ১৯৭১ সালে ২,০০,০০০। মাত্র বাইশ বছরে অর্থৎ ১৯৯৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৯১,৩০০। উপরন্তু ২০০০ সালের মধ্যে ৩৫টি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে খ্রীষ্টবাদের প্রচার ও নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানসহ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পুনর্বাসনের জন্যে ৩০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা বাস্তাবায়নের কাজ চলছে অব্যাহত গতিতে।

এই অপচেষ্টার সয়লাবের বিপরীতে রাবিতাত আল-আলম আল-ইসলামী, মুসলিম এইড বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন, মডেল বাংলাদেশ, রয়াল ইকনমিক সার্ভিস এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (RESCU), আল মারকাজুল ইসলামী, আহসানিয়া ওয়েলফেয়ার মিশন, ইসরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রভৃতি ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রচেষ্টা বিশাল সমুদ্রে বিপুল জলরাশির মধ্যে গোস্পদ মাত্র।

৪. সামাজিক-সাংস্কৃতিক পর্যায়েও দুর্লভ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে সদা সচেষ্ট। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ তৈরী হওয়া জরুরী, এদেশের অসংখ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অহর্নিশ তার বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন পেশাজীবীদের সংগঠনের মাধ্যমেই বৃহত্তর জনমানুষের দাবী আদায় সহজ হয়। কিন্তু সেসব সংগঠনের হোতারাই যদি হন ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধী তাহলে ইসলামের আলোকে অধিকার আদায় তো দূরে থাক, ইসলামবিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নই হবে পরিণাম ফল। বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ তাঁতী কল্যাণ সমিতি, ব্যাংকার্স কল্যাণ পরিষদ, ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা প্রভৃতি গুটিকয়েক সামাজিক এবং সাইমুম, বিপরীত উচ্চারণ, কাফেলা, রেনেঁসা, টাইফুন, প্রত্যয় প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কোনক্রমেই চৌদ্দ কোটি লোকের চাহিদা পূরণ বা আশা-আকাংখা বাস্তবায়নে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সংগঠিত উপায়ে জনগণের প্রকৃত আশা-আকাংখাকে বিপথে পরিচালিত করার জন্যে অনৈসলামী সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি উপর্যুপরি কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে।

৫. বাংলাদেশের প্রচার ও গণসংযোগ মাধ্যমসমূহও ইসলামী ধ্যান-ধারণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিদারুণ বৈরী। সাধারণভাবে দেশের গণসংযোগ মাধ্যম এবং প্রচার যন্ত্রগুলি জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। জনগণের ধ্যান-ধারণাকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করে তোলাই এদের কাজ। কিন্তু বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসমূহের আচরণ ও নীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে ইসলাম বিরোধিতাই এদের ব্রত। এদেশের টেলিভিশন ও মঞ্চ নাটকের প্রতি নজর ফেরালে এসত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সরকারী গণমাধ্যমগুলির, বিশেষ করে টেলিভিশনের ইসলাম বিরোধিতা এতই তীব্র যে, বিজ্ঞাপনের জন্যে নির্ধারিত হারে অর্থ পরিশোধের চুক্তিতে পর্যন্ত 'ইনশাআল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যায় না। সরকারী দপ্তরে এজন্যে ব্যাখ্যা চেয়েও কোন উত্তর মেলে না।

খবরের কাগজ ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার অবস্থাও তথৈবচঃ। এখানে ইসলাম বিরোধিতার পাশাপাশি রয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র কটুক্তি ও বিষোদগার। সরকারের

গৃহীত উদার প্রকাশনা নীতির সুবাদে এই অবস্থা বর্তমানে আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বেশ কিছু ভূঁইফোড় সাপ্তাহিক ও সদ্য গজিয়ে ওঠা দৈনিক পত্রিকা ইসলামের রীতি-নীতি, ইসলামী ইতিহাস ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কুৎসিত ও কদর্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা এদের রীতিবিরুদ্ধ এই জোয়ারের বিরুদ্ধে ইনকিলাব, সংগ্রাম, আল-মুজাদ্দেদ, সোনার বাংলা, মুসলিম জাহান, বিক্রম, পৃথিবী, মদীনা, কলম, পালাবদল, দারুস সালাম, আত-তাহরীক প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা দুঃসাহসী ব্যতিক্রম। এরাই মুসলিম গণমানুষের চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরছে দেশের কাছে, দশের কাছে। কিন্তু সরকারের নিদারুণ ঔদাসীন্য এবং ইসলামবিরোধীদের গোয়েবলসীয় প্রচারণার বিরুদ্ধে এই প্রয়াস কতদূর ও কতখানি সফলতা অর্জনে সক্ষম?

৬. এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন তথা এর প্রচার ও প্রসারের বিরোধী। মাদরাসা শিক্ষাসহ দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই ইসলামী অর্থনীতি পড়ানো হয় না। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীর অর্থনীতি সংক্রান্ত পাঠ্যসূচীর কোন কোন পত্রে সামান্য মাত্র ইসলামী ব্যাংকিং, অর্থনীতি চিন্তা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মাষ্টার্স ডিগ্রী নিয়েও ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে ছাত্রদের সঠিক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জিত হয় না। মাদারাসা শিক্ষাতেও ইসলামী অর্থনীতি নামে যা পড়ানো হয় তা আসলে বাংলাদেশের অর্থনীতি। ঐ অর্থনীতি পড়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা বা ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানার কোন উপায় নেই। আসলেই বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক কোন পরিবর্তন এদেশে হয়নি - না পাকিস্তান আমলে, না বাংলাদেশ আমলে। যে পরিবর্তন হয়েছে তা শুধু বহিরঙ্গ বা উপরি কাঠামোর, ভেতরে কোন কার্যকর পরিবর্তন আজ অবধি হয়নি। এদেশের জনগণের চিন্তা-চেতনার পরিপোষক পাঠ্যক্রম তৈরী করতে সরকারের যথোচিত উদ্যোগের অভাবের কথা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার নেই।

৭. বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থাও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের প্রতিকূল। এদেশের আইন ব্যবস্থা বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থারই কিছুটা সংশোধিত রূপ। মূলতঃ এই আইন বৃটিশ ও রোমান আইনের সংমিশ্রণ। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেমন পারিবারিক আইন, সম্পত্তির বাঁটোয়ারা ও উত্তরাধিকার আইন। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম, কর, ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও ইসলামী অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। বিদ্যমান ব্যবসায় আইন সুদের সপক্ষে; ইসলামী ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও বীমার বিপক্ষে। তাই এই আইন কাঠামোর আওতায় ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা দুঃসাধ্য।

৮. এদেশে ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগের সুযোগ নেই। বিদ্যমান শ্রমনীতি পুঁজিবাদের অনুসারী। তাই এই শ্রমনীতি ইসলামের অনুশাসনের কাছাকাছিও নয়। তথাকথিত বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের শ্রমনীতিও ইসলামী শ্রমনীতির মূল বক্তব্যের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি। 'ইসলামী শ্রমনীতির মর্মকথা-'শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই'। এই বিধানের স্বীকৃতি খোদ আই.এল.ও. কনভেনশনের চার্টারে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তাই একদিকে যেমন রয়েছে মালিকের অব্যাহত শোষণ ও নানা দুর্নীতি, শ্রমিক নেতাদের লোভ ও অন্যায় চাপ, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে সরকারের দুর্বলতা এবং সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর নিদারুণ বঞ্চনা। শ্রমিকদের জন্যে প্রবর্তিত ইসলামী শ্রমনীতি-যাকে বলা হয় মানবিক শ্রমনীতি-প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এদেশে বাধা রয়েছে তিন পক্ষের। প্রথম পক্ষ খোদ শিল্প মালিকেরা, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রমিকদের স্বার্থের ধ্বজাধারী ট্রেড ইউনিয়ন এবং তৃতীয় পক্ষ সরকার নিজেই। বিশেষতঃ সরকার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের চাইতে মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি অধিক যত্নবান। আইন কাঠামো পরিবর্তন না করে তাই এদেশে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন দুরূহ ব্যাপার।

৯. ভূমিস্বত্ব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এদেশে ইসলামী অর্থনীতির বিধি-বিধান প্রয়োগের সুযোগ নেই। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, এদেশের আইন ব্যবস্থা বৃটিশ আইন ব্যবস্থার অনুসারী। তাই এসব ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা প্রয়োগ আদৌ সম্ভবপর নয়। ফলশ্রুতিতে ইসলামী অর্থনীতির সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সকলেই। ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রাজস্ব ও উশর আদায় এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ইসলামীকরণ করতে হলে প্রথমেই বাধা আসবে এদেশের বড় বড় জোতদার ও বড় মাপের জমির মালিকদের পক্ষ থেকে। তাদের সমর্থন জোগাবে গ্রামীন টাউট ও রাজনৈতিক মাস্তানরা। সরকারও এদের অন্যায় দাবীর কাছে নতি স্বীকার করবে (অতীতেও যেমন করেছে) ভোটের জন্যে।

১০. উপযুক্ত লোক, প্রতিষ্ঠান ও মানসিকতার অভাবে মুদারাবা, মুশারাকা ও করযে হাসানা প্রদানের ব্যবস্থা করা এদেশে এখন অসম্ভব ব্যাপার। ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হলে যেসব কর্মপদ্ধতি অতি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে সেসবের মধ্যে করযে হাসানা প্রদান ও মুদারাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজে অভাবী লোকের সাময়িক প্রয়োজন পূরণ এবং কর্মসংস্থানের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামের সোনালী যুগে তো বটেই, এমন কি আইয়ামে জাহেলিয়ায়ও মুদারাবা পদ্ধতি চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে সুদের সর্বগ্রাসী প্রকোপ এবং ব্যক্তি চরিত্রের নিদারুণ অবনতির কারণে না করযে হাসানা প্রদান করা যায়, না মুদারাবার উদ্যোগ নেওয়া যায়। ইসলামী ব্যাংকগুলি পর্যন্ত বাংলাদেশে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে ভরসা পাচ্ছে না ব্যক্তি চরিত্রের অবনতি ও আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগের অভাবে। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারতেই মসজিদকেন্দ্রিক করযে হাসানা প্রদান ও মুদারাবা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। মানসিকতার পরিবর্তন এবং উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরীর ব্যর্থতাই এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক।

১১. বাংলাদেশে যাকাত আদায় ও বিলিবন্টনের জন্যে উপযুক্ত সরকারী আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের পথে অন্যতম অন্তরায়। এদেশে ইনস্টিটিউশন হিসাবে যাকাতের ব্যবহার নিদারুণভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। যাকাতের আর্থ-সামাজিক উপযোগিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। খুলাফায়ে রাশেদার (রা.) আমলে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত আদায় ও বিলিবন্টনের উপযুক্ত উদ্যোগ নেই। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ডের কাংখিত সুফল হতে জাতি বঞ্চিত। প্রসঙ্গতঃ বলা ভাল, সরকারীভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে এদেশে কোন আইন নেই। যাকাত হতে স্থায়ী সুফল পেতে হলে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন যেমন আশু কর্তব্য তেমনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাও অতীব জরুরী।

১২. ইসলমী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান শত্রু সুদ। অথচ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুদের সর্বগ্রাসী আক্রমণ কবলিত। দেশের সব ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কোন-না-কোনভাবে সুদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত। সুদের উচ্ছেদ ইসলামী অর্থনীতির শুধু অন্যতম দাবীই নয়, সুদ বিদ্যমান থাকলে ইসলামী অর্থনীতি তার সঞ্জীবনী শক্তি হারাবে। সুদ সমাজ শোষণের নীরব অথচ বলিষ্ঠ হাতিয়ার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ নানা বেইনসাফীর উৎসমূল এই সুদ। কিন্তু বাংলাদেশে কি সরকার, কি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কেউই সুদ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়। সুদী কার্যক্রম নিরোধের এবং সুদের যুলুম হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনে কোন মহলেরই আগ্রহ নেই। উপরন্তু আইনের সাহায্যে সুদকে সর্বব্যাপী করে দেওয়া হয়েছে এদেশের ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে।

১৩. জুয়ার উচ্ছেদ ইসলামী অর্থনীতির অপর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবী। কিন্তু বাংলাদেশে জুয়ার উচ্ছেদের পরিবর্তে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং বহুক্ষেত্রেই তা সরকারী ছত্রছায়াতেই। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শুধুমাত্র ঘোড়দৌড় বা রেসের জুয়াই সরকারী নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যান্য সব জুয়া রয়ে গেছে পূর্বের মতই। বরং যাত্রার প্যান্ডেলে হাউজি এবং ট্রেন ষ্টেশন, বাস ষ্ট্যান্ড সর্বত্রই নানা রূপে ও নানা কৌশলে জুয়া চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। এর উচ্ছেদ না হওয়ায় সাধারণ লোক ক্রমাগত ঠকছে, নিঃস্ব হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতি ইনসাফ, আদল ও ইহসানের অর্থনীতি। জুয়ার অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। বড় বড় কোম্পানী, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ধনী লোকেরাই নানা অবয়বে জুয়ার ব্যবসায়ে লিপ্ত। জুয়া উচ্ছেদের বাধা আসবে প্রথমতঃ তাদের কাছ থেকেই। কিন্তু সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও আপামর জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে এর উচ্ছেদ অপরিহার্য।

১৪. ব্যবসায়িক অসাধুতার প্রশ্রয়দান ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে বৈরীতার নামান্তর। কোন সৎ ও সভ্য সমাজে ব্যবসায়িক অসাধুতা প্রশ্রয় পায় না। চোরাকারবারী,

মুনাফাখোরী, মজুতদারী, কালোবাজারী, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, ওজনে কারচুপি, নকল করা প্রভৃতি সকল দেশেই ঘৃণ্য অপরাধ। এর জন্যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। রাসুলে করীমের (সা.) যুগ হতে 'হিসবাহ্' ও 'হিজর' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান অব্যাহতভাবে কাজ করে গেছে সব ধরনের ব্যবসায়িক অসাধুতা ও প্রতারণা নিরোধ ও উচ্ছেদের জন্যে। বাংলাদেশেও এর প্রতিবিধানের জন্যে ফৌজদারী আইন রয়েছে। এমনকি ফায়ারিং স্কোয়াডে চোরাকারবারীর মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু কাজীর গরু কেতাবেই থাকে, গোয়ালে নয়। তাই আজকের বাজার ব্যবস্থা চরম অনিয়ন্ত্রিত এবং অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের শিকার। এজন্যে আইনের দীর্ঘসূত্রীতা এবং আমলাতান্ত্রিকতা দায়ী। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আমলাতান্ত্রিকতা ও আইন প্রয়োগের দীর্ঘসূত্রীতা দ্রুত পরিহার করতে হবে। তবেই ইসলামী অর্থনীতির আদল ও ইহসানের সুফল পৌঁছাবে জনগণের ঘরে ঘরে।

১৫. কালো টাকাও এদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। বাংলাদেশে বর্তমানে কালো টাকার পরিমাণ ষাট হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করে গেছে (*দৈনিক আমার দেশ*, ৬ এপ্রিল ২০০৫)। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ পরিচালিত এক জরীপ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি মানুষকে বছরে গড়ে ৪৮৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়। নয়টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী খাতে পঁচিশ ধরনের সেবা দিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জনগণের কাছ থেকে বছরে আনুমানিক ৬,৭৯৬ কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে আদায় করে (*দৈনিক সংগ্রাম*, ২১ এপ্রিল ২০০৫)। এভাবে যারা নানাবিধ অসামাজিক অনৈতিক ও বেআইনী কাজের মাধ্যমে কোটি কোটি কালো টাকার মালিক হয়েছে ও হচ্ছে তারা কিছুতেই ইসলামী ইনসাফ আদল ও ইহসানের কাছে নতি স্বীকার করতে চাইবে না। কর ফাঁকি দেওয়া, জালিয়াতি, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা, দুর্নীতি, ঘুষ ও চাঁদাবাজি, বৈদেশিক বাণিজ্যে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং প্রভৃতি হেন অপকর্ম নেই যা এই চক্রের লোকেরা করে না। অসদুপায়ে অর্জিত এই অর্থের অংশবিশেষ দিয়ে তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ফায়দা লোটে, সামাজিক মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করে। এমন কি জাতীয় নির্বাচনেও তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের পক্ষের শক্তিকে জিততে সাহায্য করে যেন তাদের স্বার্থবিরোধী কোন পদক্ষেপ গৃহীত হতে না পারে। ফলে আপামর জনসাধারণ যে ভয়ানক আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতি ও ভোগান্তির শিকার হয় তার সীমা-পরিসীমা নেই।

১৬. বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এদেশের মানুষের মানসিক গঠনও অন্যতম প্রতিবন্ধক। এদেশের জনসাধারণ খুবই আবেগপ্রবণ, যুক্তি নির্ভর নয়। মনমত কথা বলে সহজেই এদের চিত্ত জয় করা যায়। তাই হাতে তসবীহ্ নিয়ে বা বিস্‌মিল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করে ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হয়।

ক্ষমতায় গিয়ে জনগণকে বুড়ো আঙুল দেখালে কিছু যায় আসে না। কারণ জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে সোচ্চার ও সক্রিয় প্রতিবাদ জানায় না। অধিকাংশ অশিক্ষিত, আবেগপ্রবণ ও অসংগঠিত জনগণের কারণে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ করে সরকার রেহাই পেয়ে যায়। ইসলাম অনুসারী কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের তো প্রশ্নই ওঠে না।

১৭. ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বুনিয়াদ *আমর বিল মারুফ* (সুনীতির প্রতিষ্ঠা) এবং *নেহী আনিল মুনকার* (দুর্নীতির উচ্ছেদ)। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এ দুটি নীতির কোনটিই প্রয়োগ হচ্ছে না। বরং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দুস্কৃতি এখন এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, দেশের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন-- দেশে এখন শিষ্টের দমন আর দুষ্টের লালন চলছে। একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্যে কী গভীর লজ্জা ও পরিতাপের কথা! সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদের জন্যে যে ঈমানী জযবা প্রয়োজন তাও অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে অনুপস্থিত। ফলে ইসলামী অর্থনীতির যে ধারণা বা নীতি কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে যাবে তার বাস্তবায়ন প্রতি পদে বাধা পাবে এদেশে। এটাই স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বাভাবিক। সরকারও এদের মদদ যোগান-কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে। তাই ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে বাধা ঘরে-বাইরে সর্বত্রই।

১৮. বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলিমের ধর্মীয় অনুভূতি খুবই তীব্র ও প্রবল। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এই অনুভূতি বহুলাংশে আবেগবহুল। ইসলামের বহিরঙ্গ নিয়েই জনগণ তৃপ্ত। খোদায়ী জীবন বিধানের বাস্তব প্রয়োগ করে জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর রঙে রঙীন করার লক্ষ্য তার কাছে গৌণ। ইসলামী শরীয়াহর বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে ইহলৌকিক জীবনকে পারলৌকিক জীবনের জন্যে প্রস্তুত করে নেওয়ার দৃঢ় বাসনা তার মধ্যে প্রায়শঃই অনুপস্থিত। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই চেতনার অভাবে তাদের ইসলামের প্রতি আবেগতাড়িত অনুভূতিকে সুসংহতভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন বা প্রতিষ্ঠার জন্যে সেটাই সবচেয়ে বেশী জরুরী।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আর্থার ল্যুইস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Principles of Economic Planning* গ্রন্থে পরিকল্পনার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার আবশ্যিক শর্ত হিসাবে যে বিষয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা এক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর মতে - "জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি।" বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় বিপুল জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা গ্রহণ ও ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংহত করে সুগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার বড়ই অভাব। এই প্রয়োজন পূরণই বর্তমানের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমাগত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে চলেছে। এ দেশের ৮৬% লোকই মুসলমান। ইসলামী জীবন দর্শনে তারা বিশ্বাসী। কিন্তু ইসলামী জীবন দর্শনে বিশ্বাসীদের জীবনে যে শান্তি, কল্যাণ, উন্নয়ন ও নিরাপত্তা থাকার কথা তাদের জীবনে আজ তা অনুপস্থিত। এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল না। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা এবং ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতির আলোকে ঐসব সমস্যার সমাধান কতখানি সম্ভব সেই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা হয়েছে বর্তমান আলোচনায়। সমস্যা যত ব্যাপক ও গভীর হবে তার সমাধান ততই জোরালো ও ত্বরিৎ ফলপ্রসূ হতে হবে। এবং তা হতে হবে ইসলামী জীবন দর্শন তথা ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতির আলোকেই। এ দেশের জনসাধারণ দীর্ঘদিন ভ্রান্তির কবলে নিপতিত। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের দাওয়াই এ দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবেই, কিন্তু উন্নতি ও কল্যাণ তো আসেই নি বরং অকল্যাণের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের মানের হয়েছে অধোগতি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির সমস্যা হিসাবে প্রধানতঃ এবং প্রায়শঃ যেসব বিষয়কে চিহ্নিত করা হয় তার অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে মূল সমস্যা নয়। পুঁজির ঘাটতি, শ্রমিকের অদক্ষতা, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, নিরক্ষর জনগণ, প্রাচীন কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ, কম সঞ্চয়, দুর্বল ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদিকে এদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। অথচ প্রকৃত সমস্যাকে হয় পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় নতুবা সামাজিক সমস্যাগুলিকে অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে এক করে বিচার করা হয়। যেসব সমস্যার সমাধান করলে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশ গতিশীল হতে পারে, বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেতে পারে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পেতে পারে সেসব জরুরী অথচ সমাজের গভীরে প্রোথিত সমস্যার মূলোৎপাটন আজ একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা প্রধানতঃ পাঁচটি। যথাঃ-

ক. ধন বন্টনে বৈষম্য;
খ. পর্যাপ্ত উৎপাদন না হওয়া;
গ. অপব্যয়, দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রসার;

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি; এবং
ঙ. ব্যাপক বেকারত্ব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে যারা নানা পথ নির্দেশের প্রস্তাবনা পেশ করেন, নানা প্রেসক্রিপশান দিয়ে থাকেন বিভিন্ন চটকদার মোড়কে তারা না আমাদের জীবন দর্শনে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল, না তারা আমাদের যথার্থ হিতৈষী। আমাদের সমস্যা সমাধানে আজ আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে; আমাদের প্রয়োজন পূরণে আমাদেরকেই বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখ্তে হবে। এ কাজে এ দেশের তৌহীদবাদী অকুতোভয় নওজোয়ানরাই সেরা সেনানীর, শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তার ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরে উল্লেখিত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কিভাবে ইসলামী উপায়ে হতে পারে, অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতিতে এর কি সমাধান রয়েছে সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হলো। মনে রাখা দরকার, যে যুগে রাসূলে করীম (সা.) ইসলামের অমিয় বাণী নিয়ে এসেছিলেন এবং যে জাতির আমূল পরিবর্তন করেছিলেন আজকের পৃথিবী বহু ক্ষেত্রেই অনুরূপ পংকিলতা ও দুর্যোগের শিকার। অথচ রাসূলের (সা.) রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের হাতের কাছেই বর্তমান। আমাদের আত্মবিস্মৃতি ও পরমুখাপেক্ষিতাই যে বর্তমানে গোটা জাতিকে হীন দশায় উপনীত করেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ইসলামী সমাধান

ক. ধনবন্টনে বৈষম্য দূরীকরণ

ধনবন্টনে বৈষম্যের পথ ধরেই সমাজে হতাশা, বঞ্চনা ও শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব ও অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পায়। শোষণ-নিপীড়নের জগদ্দল পাথর চেপে বসে। অসহায় ও বঞ্চিতদের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন রয়ে যায় অপূর্ণ। তাই ধন বন্টনে বৈষম্য দূরীকরণ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে 'আমর বিল মারুফ' ও ' নেহী আনিল মুনকার' ইসলামের এই উভয় নির্দেশই যুগপৎ পালনীয়।

১. ধন বন্টনে সাম্য স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলামী মীরাস বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মৃতের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বাঁটোয়ারা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ইসলামপূর্ব যুগে পৃথিবীতে সম্পদ বন্টনের কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা বিদ্যমান ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম মৃতের সম্পদ তার আত্মীয়-স্বজন পরিবার-পরিজনদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যেমন তাদের তাৎক্ষণিক অসহায় অবস্থা দূর করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি ব্যক্তি বিশেষের হাতে সকল সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার বিপদও দূর করেছে। উপরন্তু সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকেও নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে।

আমাদের দেশের দেওয়ানী আইনে মুসলমানদের এই অধিকার স্বীকৃত আছে। ফারায়েজ অনুসারে মৃতের সম্পত্তি বাঁটোয়ারার বিধান আইনতঃ স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ সন্তোষজনক নয়। বরং বেআইনী বা জবরদস্তিমূলক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা বর্তমানে একটা স্বীকৃত রেওয়াজ বা দস্তুরে পরিণত হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের জমি, ইয়াতীম ও নাবালকদের সম্পত্তি এমনকি প্রতিবেশীর জমি বাগান দালান ছাড়াও শত্রু সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তি (খাস জমি) বাড়িঘর প্রতিষ্ঠান জবর দখল করে, কিংবা জাল বা ভূয়া দলিল করে এক শ্রেণীর মানুষ রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার সুযোগ নিচ্ছে। আইন এদের কাছে বড়ই অসহায়। ছলে-বলে কৌশলে ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে ইয়াতীমদের, বিধবা ভ্রাতৃবধূদের, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের, ভাইপো-ভাইঝিদের, বোনদের, খালা-ফুফুদের। ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। এই অবস্থার কারণেই একদিকে যেমন ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে নির্যাতন নিপীড়ন বঞ্চনা ও হতাশা বেড়েই চলেছে। তাই আজ প্রয়োজন দেশে বিদ্যমান দেওয়ানী আইনের মীরাসী অংশের পূর্ণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন।

২. যে কোন সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে যে সমাজে যে অর্থনীতিতে একবার সুদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে গেছে, সে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ধনী-গরীবের পার্থক্য হয়েছে বিপুল আর নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের আহাজারিতে ভরে গেছে আকাশ বাতাস জনপদ। সুদের বিদ্যমানতার ফলে অর্থনীতিতে যেসব প্রত্যক্ষ কুফল লক্ষ্য করা গেছে সেগুলো সম্পর্কে ইতোপূর্বেই অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। (সুদ : *অর্থনৈতিক কুফল ও উচ্ছেদের উপায়* প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

সুদের ভয়াবহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কুফলের কারণেই সুদ উচ্ছেদের জন্যে রাসূলে কারীম (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই সুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে গেছেন। তাঁরই চেষ্টায় প্রথমে মদীনা হতে ও পরবর্তীকালে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব হতে সুদ নির্মূল হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইসলামী হুকুমতের পতন দশা শুরু হওয়ার পর যখন খৃষ্টান শাসকগোষ্ঠী তথা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তি একের পর এক মুসলিম দেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার শুরু করে তখন তাদেরই উদ্যোগে ও তাদেরই তৈরী আইনের আওতায় অর্থনীতিতে সুদভিত্তিক লেনদেন পুনরায় শুরু হয়ে যায়। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। মুসলিম শাসন আমলে এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে সুদ চালু ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালে তাদেরই সহযোগিতা ও তৎপরতায় এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এ থেকে মুক্তির জন্যে তিনটি পথ খোলা রয়েছে।

প্রথমতঃ সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করে দিতে হলে এমন অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যা সম্পূর্ণ শরীয়াহসম্মত। বর্তমান যুগে বাণিজ্যিক লেনদেন যেহেতু সুদনির্ভর সেহেতু এর বিপরীতে ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপর

অধিকতর জোর দিতে হবে। ইতিমধ্যেই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সাফল্যের সাথে কাজ করে চলেছে। এই সাফল্যকে আরও বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী করতে হলে আরও বেশী সংখ্যক ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা চাই। এর ফলে সুদের যুলুম হতে মানুষ অনেকখানি নিস্কৃতি পাবে।

দ্বিতীয়তঃ সুদের অপকার সম্বন্ধে জনমত গঠন ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ দেশে স্বাক্ষরতার হার বাড়লেও শিক্ষিতের হার বাড়েনি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সম্যক জানার সুযোগ নেই। তাই ইসলামী জীবনের মূল কর্মপদ্ধতি ও নীতির যৌক্তিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক অজ্ঞ। ফলে তারা সুদের ভয়াবহ আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিণাম সম্বন্ধে আদৌ ওয়াকিফহাল নয়। এদের কাছে সুদের মারাত্মক কুফলগুলো তুলে ধরতে হবে। এ কাজ করতে হবে পোষ্টার, লিফলেট, আলোচনা, ওয়াজ-মাহফিল, সেমিনার ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে। পরিণামে গণদাবী সৃষ্টি হলে সুদের উচ্ছেদ শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

তৃতীয়তঃ সমাজে যারা সুদের লেনদেন করে, ব্যবসা করে এবং সুদে টাকা খাটায় তাদের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। তাদের প্রতিহত করতে হবে সামাজিকভাবেই। কেননা যথাযথ সামাজিক প্রতিরোধের মুখে কোন অশুভ শক্তিই টিকতে পারে না। এ দেশে পঞ্চাশ বছর পূর্বেও সুদখোরদের বাড়িতে কোন দাওয়াত গ্রহণ করতেন না আলিম-উলামারা। তাদের বিয়ে-শাদীতে শরিক হতেন না। বরং সুদখোরদের এতই অখ্যাতি ছিল যে, গরুর গায়ে পোকা হলে সাতজন সুদখোরের নাম কাগজে লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। অথচ আজ সুদী ব্যাংকের বার্ষিক প্রীতিভোজে দাওয়াত না পেলে অনেকে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে গণ্য করেন। আজ সময় এসেছে সুদখোরদের বয়কট করার, তাদের ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি না বানাবার এবং জরিমানার বদলে বাধ্যতামূলকভাবে সুদ না আদায়ের দাবী তোলার। সরকারী প্রাপ্য, যেমন জমির খাজনা বকেয়া হলে সরকার তার জন্যে সুদ আদায় করেন দণ্ড বা শাস্তি হিসাবে। এর প্রতিবিধান হওয়া দরকার। খাজনা যদি বাকি পড়েই তাহলে জমির মুসলমান মালিক সে জন্যে জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবেন, সুদ দেবেন কেন? এসব বিষয়ে নিশ্চয়ই জনগণকে বলা যায়, বোঝানো যায়। এ দায়িত্ব তরুণদের। তারাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। সুতরাং, তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। সেই সাথে অবশ্যই সহযোগিতা করবেন দেশের আলিম-উলামা ও মাশায়েখগণ।

৩. যাকাত আদায় ও তার যথোচিত ব্যবহার আয় ও সম্পদের সুবিচারপূর্ণ বন্টনের একটি বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতের লোকদের মধ্যে বন্টিত ও ব্যবহার হয় যারা প্রকৃতই বিত্তহীন শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে রয়েছে গরীব অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত মুসাফির নওমুসলিম ও

আল্লাহর পথে জিহাদকারী। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ব্যতিক্রমী কয়েকটি উদাহরণ বাদে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাধ্যতাকমূলকভাবে যাকাত আদায় ও তা বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা নেই। আমাদের দেশে তো যাকাত আদায় ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উশরের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উশর আদায়ের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য যেমন হ্রাস পায় তেমনি কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু সামাজিক বন্টনও নিশ্চিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত খাজনা পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতি এ জন্যেই উত্তম যে, নিসাব পরিমাণ ফসল না হলে উশর আদায় করতে হয় না। আজকের খাজনা ব্যবস্থায় বড় চাষীদের বিপুল বিত্তের মালিক হওয়ার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান। কারণ তাদের প্রদত্ত খাজনা ও উৎপন্নের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। পক্ষান্তরে উশর ব্যবস্থায় প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, এমনকি বর্গাচাষীরা রেহাই পায় সঙ্গতঃ কারণেই। এর ফলে ধনবন্টনে বৈষম্য হ্রাস পেতে বাধ্য।

এদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাত ও উশর আদায় এবং তার সুষ্ঠু বিলিবন্টন করা খুবই সম্ভব। এ জন্যে চাই আইনী সহায়তা ও যথাযথ উদ্যোগ। পরিকল্পিত উপায়ে যাকাত ও উশর আদায় করে তা যাকাতের হকদারদের ত্রাণ ও পুর্নবাসন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানমূলক কাজে ব্যবহার করে সমাজের হতদরিদ্র লোকদের অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিতভাবে কাজ করে চলেছে। তাদের পরিসর ক্ষুদ্র, কিন্তু সুফল পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই।

৪. ধনবন্টনে বৈষম্যের অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ব্যবসায়িক অসাধুতা। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিরা নানা অসৎ উপায়ে জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং এবং নিজেরা বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে যায়। এসব অসৎ কাজের মধ্যে রয়েছে মজুতদারী মুনাফাখোরী কালোবাজারী ওজনে কারচুপি পণ্যে ভেজাল দেওয়া নকল করা ইত্যাদি। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, চোরাকারবারী যেমন দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস ডেকে আনে, কালোবাজারীও তেমনই সামাজিক অবক্ষয়ের গতি ত্বরান্বিত করে। এ দুইয়ের যোগফল যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভয়ানক নাজুক করে তুলতে পারে। উপরন্তু এসব ব্যবসায়িক অসাধুতার সুযোগ নিয়ে কিছুসংখ্যক লোক রাতারাতি আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যায়। অন্যদিকে সাধারণ জনগণ এদের অন্যায় ও অনৈতিক কাজের শিকার হয়ে ক্রমাগত দরিদ্র হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সব ধরনের ব্যবসায়িক অসাধুতা এখন সদাপটে বিদ্যমান।

গভীর পরিতাপ ও হতাশার কথা, এসব রুখবার জন্যে দেশে ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত যে আইন এখনও বিদ্যমান রয়েছে তাও বাস্তবায়ন করার জন্যে যেন কেউ নেই। পচা দ্রব্য, ভেজাল সামগ্রী বাজার হতে বিতাড়নের জন্যে রয়েছে মার্কেট

ইন্সপেক্টর। তাকে কখনও বাজারে দেখা যায় একথা হলফ করে কেউ বলতে পারবে না। অনুরূপভাবে দেশে চোরাচালান রোধের জন্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে চোরাচালানীর মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে তিন দশক আগে। আজ অবধি সেই আইনের প্রয়োগ এ দেশে কেউ দেখেনি, যেন এদেশে চোরাচালান হয় না। ওজনে কারচুপি করলে আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে। তারও প্রয়োগ যেন কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে থেমে রয়েছে। এসব ব্যবসায়িক অসাধুতার পথেই সৃষ্ট হয় মুনাফার পাহাড় যা পরিণামে জন্ম দেয় অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের। এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন দেশে বিদ্যমান আইনের সুষ্ঠু ও ত্বরিৎ প্রয়োগের জন্যে জোর দাবী তুলতে হবে, গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে তেমনি অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধেও গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা, ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক প্রতিরোধ। সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমেই কেবল কালোবাজারী, চোরাচালানী ও মজুতদারী উচ্ছেদ সম্ভব। একই সঙ্গে আইনের নিরপেক্ষ ও কঠোর প্রয়োগ জরুরী। নেহী আনিল মুনকারের বাস্তবায়ন এখন রাষ্ট্রীয়ভাবেই আবশ্যক। রাষ্ট্র পরাঙমুখ হলে দেশের সচেতন যুব সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে ভয়াবহ দুর্যোগ ও নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হবে আপামর জনসাধারণ। বর্তমান সময়ই তার স্বাক্ষী।

৫. ঘুষ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে আয় সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঘুষের রন্ধ্রপথে দুর্নীতির যে অনুপ্রবেশ ঘটে তা গোটা প্রশাসন, বিচার ও আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থাকেই ঘুণে ধরা কাঠের মত ধ্বংস করে ফেলে। উপরন্তু সমাজে ধনবৈষম্যকে করে তোলে আরও প্রকট। ঘুষের কারণেই সরকারী চাকুরীর বয়স তিন বছর না পুরতেই রাজধানীতে জমি হয়, বাড়ি হয়, স্ত্রীর শরীরে ওঠে দামী গহণা। ঘুষের কারণেই কোন কোন অফিসের নিম্নমান সহকারীর টিনের ঘরও কয়েক বছরের মধ্যে রূপান্তরিত হয় তিনতলা পাকা বাড়িতে। অথচ সৎভাবে উপার্জন করে বহু উঁচু পদের অফিসাররাও শেষ জীবনে ভাড়া বাড়িতে কাটান। ঘুষের যত রকম রূপ সম্ভব এ দেশে তার সব কটিই প্রচলিত রয়েছে। অফিসার ইন্সপেক্টর হতে শুরু করে উঁচু পদের আমলা এমনকি মন্ত্রীরা পর্যন্ত ঘুষ খায় বলে অভিযোগ প্রকাশিত হয় জাতীয় দৈনিকগুলোতে। এর প্রতিবিধানের জন্যে বহু দেশে সরকারী আমলা ও মন্ত্রীদের সহায়-সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার বিধি রয়েছে। সেই বিবরণ খবরের কাগজগুলোতেও প্রকাশিত হয়। এ দেশেও এক সময় এ নিয়ম চালু ছিল। আজ আর নেই বলে সবাই হয়ে উঠেছে লাপরোয়া। ফলে দুর্গতি ও ভোগান্তির চূড়ান্ত হচ্ছে সাধারণ জনগণের।

এই অবস্থা নিরসনের জন্যে চাই আল্লাহ্‌র আইন, চাই সৎ লোকের শাসন। একদিকে যেমন খোদাভীরু ও যোগ্য লোক প্রশাসন, আইন, বিচার ও অন্যান্য বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে অন্যদিকে তারা ফয়সালা করবে আল্লাহ্‌র আইন অনুসারেই। আমাদের দেশে এখনও দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন যা বলবৎ রয়েছে যোগ্য ও সৎ লোক দ্বারা তার যথাযথ প্রয়োগ হলে সমাজের বহু বেইনসাফী দূর হতো, প্রতিষ্ঠিত হতো আদল ও ইহসান। তবে মানুষের

সার্বিক কল্যাণের জন্যে সকল ক্ষেত্রেই চাই আল্লাহর আইন। কারণ মানুষের তৈরী আইনে ভ্রান্তি ও দুর্বলতা থাকেই। আল্লাহর আইনই ভ্রান্তিমুক্ত ও কল্যাণধর্মী। এদেশের অর্থনীতিতে বৈষম্য দূর করে মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে যেসব আইন বলবৎ আছে অন্ততঃ সেগুলোর প্রয়োগ যেন যথাযথভাবে হয় তার চেষ্টা চালাতে হবে। একইসঙ্গে সৎ নেতৃত্ব তৈরী করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

খ. পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বিশ্বমানের অনেক নীচে। ফলে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানী করে দেশের জন্যে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উর্পাজন দূরে থাক, খাদ্য সামগ্রীসহ বহু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পর হতে আজও বাংলাদেশ কৃষিপণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। অথচ কৃষি বিশেষজ্ঞ যারাই এ দেশে এসেছেন সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁদের সকলেরই অভিমত বাংলাদেশের খাদ্যে স্বয়ং সংম্পূর্ণ না হওয়ার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। মূলতঃ যে প্রধান কারণটির জন্যে আজও এ দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি সেটি হচ্ছে কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার না হওয়া। এ ক্ষেত্রে মূল অন্তরায় হচ্ছে বিদ্যমান ক্রটিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা।

এদেশে বিদ্যমান বর্গাপ্রথা জমির উন্নয়ন ও এক ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে মস্ত বড় বাধা। যারা বেশি জমির মালিক তারা জমির যত্ন নেয় না, বর্গাদাররা স্বেচ্ছায় যা করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ বর্গাচাষী দরিদ্র হওয়ার কারণে জমির উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ। এ ক্ষেত্রে তাদের আশু প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করার জন্যে এগিয়ে আসে গ্রাম্য মহাজন যাদের সুদের হার আকাশচুম্বী। গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারী যেসব প্রতিষ্ঠান কম হার সুদে কৃষকদের উপকরণ সংগ্রহের জন্যে ঋণের যোগানদার হওয়ার দাবী করে তারা প্রকৃত দরকারের সময়ে ঋণ যোগাতে ব্যর্থ। সে সময়ে গ্রাম্য মহাজনই দ্রুত সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। ফলে উৎপাদন যেটুকু হয় ফসল ওঠার পরে সুদের দায়ে তার প্রায় সবটুকুই মহাজনের গোলায় ওঠে। বাকীটুকু পায় জমির মালিক। পরিণামে বর্গাচাষীর ঋণের বোঝা আরও স্ফীত হয়। যথাসময়ে সার সেচ উন্নত বীজ ও কীটনাশক সংগ্রহ অনেক চাষীর নাগালের বাইরে। ফলে কৃষি উৎপাদনে এ দেশ পশ্চাৎপদ রয়েই গেছে।

এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে বর্গাচাষ ব্যবস্থাকে আরও যৌক্তিক করতে হবে এবং সরকারকে অবশ্যই করযে হাসানা দেওয়ার জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। যদি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে কৃষকদের ন্যূনতম পক্ষে ঐ পরিমাণ অর্থ প্রারম্ভিকভাবে করযে হাসানা দেওয়া খুবই

সম্ভব। এর চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ-সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা দেওয়াও সম্ভব হতে পারে ন্যূনতম সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে। ফলে যারা ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করতে বাধ্য হয় তারা শুধু উপকৃতই হবে না, মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উপদ্রব হতেও তারা রেহাই পাবে। উপরন্তু বর্গার যে অংশভাগ পদ্ধতি রয়েছে তারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। প্রকৃত চাষীর অনুকূলে এই অনুপাত নির্ধারিত হলে চাষীরা উৎসাহিত হবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে। এ দুটো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে জনমত সৃষ্টি ও সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এজন্যে ব্যাপক যোগাযোগ করতে হবে চাষীদের সাথে, জনগণের সাথে। করযে হাসানা প্রদান ও বর্গার অনুপাত চাষীর অনুকূলে বাস্তবায়ন করতে হলে জমির মালিক, চাষী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ নিদারুণভাবে পশ্চাৎপদ। এ জন্যে নানা কারণ দায়ী। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব ও বিদ্যুৎ সংকটের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি (Appropriate technology) উদ্ভাবন ও ব্যবহারের প্রতি আমাদের সীমাহীন অনীহার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। অথচ টেকসই উন্নয়নের (Sustainable development) জন্যে লাগসই প্রযুক্তি অপরিহার্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামী শ্রমনীতির মূল দাবীগুলি এ দেশে উপেক্ষিত। উপরন্তু সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবৈধভাবে বিপুল সংখ্যক শিশু ও কিশোর শ্রম ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতারিত ও নিগৃহীত হচ্ছে নারী শ্রমিকেরা।

এর প্রতিবিধানের জন্যে শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের সময়ে ইসলামী শ্রমনীতির মূলনীতিগুলি যেমন অবশ্য পালনীয়, তেমনি শ্রমিকদেরও মালিকের হক আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমিকের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। দুই পক্ষের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক।

এদেশে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে মালিকরা যেমন শুরু থেকেই শ্রমিক শোষণের কথা ভাবে শ্রমিকরাও তেমনি ন্যায্য-অন্যায্য দাবী নিয়ে ঘেরাও-ধর্মঘট, কর্মবিরতি, হরতাল-পিকেটিং-লকআপ ইত্যদির আশ্রয় নিয়ে মিল-কারখানা অচল করে দেয়। এ ছাড়া রয়েছে কাজে ফাঁকি দেয়া, অন্যায়ভাবে ওভারটাইমের দাবী, বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকা, মানসম্মত উৎপাদনের চেষ্টা না করা ইত্যাদি। ফলে কল-কারখানা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লোকসানের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় তেমনি মিল বন্ধ বা লে-অফ ঘোষিত হলে শ্রমজীবি মানুষেরও দুগর্তির সীমা থাকে না।

শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয়হ্রাসের পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্প স্থাপনা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন দুরাশা মাত্র। এশিয়ার দূরপ্রাচ্যের নতুন অর্থনৈতিক শক্তি--মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া কোরিয়া তাইওয়ান থাইল্যান্ড সিংগাপুর ও হংকং-এই সেভেন টাইগারস মূলতঃ শিল্প উৎপাদনের সোপান বেয়েই সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছে। সেসব দেশে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, কারখানায় অপ্রীতিকর ঘটনা, শ্রমিকদের

স্বার্থহানিকর কাজ ঘটে কদাচিৎ। ইসলামের অনুসারী বাংলাদেশের এই বিপুল সংখ্যক লোকেরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব যদি শিল্প-কারখানা স্থাপনে এবং পরিচালনায় শ্রমিক-মালিক উভয়পক্ষই দরদী ও দেশপ্রেমিক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এ দেশে অসংখ্য মাঝারি ও বড় আকারের শিল্প স্থাপিত হওয়ার পরেও তা আর চলেনি বা চালানো হয়নি ইচ্ছাকৃতভাবেই। ব্যাংক হতে যে ঋণ নিয়ে এসব শিল্প স্থাপন করা হয়েছে সে ঋণ আদৌ শোধ করা হয়নি, হবেও না। এই ঋণ আদায়ের জন্যে এযাবৎ সকল সরকারই উপযুক্ত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাংকের সূত্র মতে সেপ্টেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত খেলাপী ঋণের পরিমাণ ২১ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি ব্যাংকের খেলাপী ঋণের পরিমাণ ১১ হাজার ৫৯২ কোটি টাকা। (*দৈনিক প্রথম আলো*, ২১ ডিসেম্বর ২০০৪)। এই ঋণ আর আদায় হওয়ার নয়।

এই বিপুল ঋণ দেওয়া হয়েছিল জনগণের সঞ্চিত আমানত এবং জনগণেরই নামে বিদেশ হতে গৃহীত মূল্যবান বৈদেশিক ঋণ থেকে। অনাদায়ী এই বিপুল ঋণের পুরো দায়ভার এখন চেপে বসেছে হতভাগ্য জনগণেরই উপর। গ্রামের বিশ হাজার কৃষক যদি গড়ে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নেয় তা হলে যে অর্থের প্রয়োজন হবে একজন বড় শিল্পপতি একাই তার চেয়ে অনেক বেশী ঋণ নিয়ে থাকে। অথচ ঐ শিল্পপতি সমুদয় ঋণই অনাদায়ী রেখে অনায়াসে সমাজে বসবাস করতে পারে, করছেও। অপরদিকে ঐ বিশ হাজার কৃষকের অর্ধেকেরও বেশী লোক যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করে থাকে, বাকীদের অর্ধেক বিলম্বে হলেও শোধ করে।

আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানা ধ্বংস হওয়া বা সে সবের অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন না হওয়ার পশ্চাতে যেসব কারণ প্রধানতঃ দায়ী সেসবের মধ্যে রয়েছে:

ক. শিল্প মালিকদের অতিলোভ ও অবিমৃষ্যকারিতা;
খ. চোরাচালানের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা;
গ. সরকারের ভ্রান্ত শিল্পনীতি;
ঘ. শ্রমিকদের অযৌক্তিক ও অন্যায্য দাবী; এবং
ঙ. সরকারী আমলাদের শিল্পস্বার্থবিরোধী অপতৎপরতা।

কৃষি ও শিল্পভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্যে অনুসৃত ও ব্যবহৃত পন্থা ও কৌশল হুবহু প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। কারণ এদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বোধ ও আচরণ ঐসব দেশের বিপরীত। এজন্যেই এদেশের সুদী ব্যাংকগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ পাশ্চাত্যে অনুসৃত কর্মকৌশল অনুসরণ করার পরেও উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নি। এজন্যে দায়ী প্রধান কারণগুলো হলো:-

১. প্রয়োজনীয় জামানত দেবার সামর্থ্য না থাকায় বিত্তহীন সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এসব ব্যাংক হতে কোন আর্থিক সহায়তা পায় না;
২. সামাজিকভাবে কাম্য কিন্তু কম লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে এসব ব্যাংক আদৌ আগ্রহী নয়;
৩. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক বিনিয়োগের পরিবর্তে বৃহৎ আকারের স্বল্পসংখ্যক বিনিয়োগে অধিক আগ্রহ;
৪. উদ্যোক্তার/ঋণগ্রহীতার প্রকল্পের সাফল্য/ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাংকগুলির যথার্থ কোন উদ্বেগ থাকে না; এবং
৫. প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তার উপযুক্ততা বা আর্থিক সাফল্য বিচার অপেক্ষা রাজনৈতিক সুপারিশ ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের চাপই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এরই রন্ধ্র পথে হাজার হাজার কোটি টাকা, যা দরিদ্র জনসাধারণের প্রদত্ত কর ও বিদেশ হতে কঠিন শর্তে গৃহীত ঋণ, হাত বদল হয়ে চলে যায় শিল্পপতি তথা অসাধু ব্যক্তিদের হাতে। এই ঋণ আর কখনও আদায় হবে না। বরং জাতির ঘাড়ে এর বোঝা চেপে বসবে জগদ্দল পাথরের মতো।

শতকরা ৮৬% জন মুসলিম অধিবাসীর দেশ বাংলাদেশে এসব সমস্যার সমাধান ইসলামের আলোকে হওয়াই সমীচীন। বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে বিশ্বসভায়। সে জন্যে নিজস্ব তাহজীব-তমুদ্দুনের উপর নির্ভর করেই, আমাদের মানসিক ও সামাজিক পটভূমিকে সামনে রেখেই কর্মকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে যেমন দেশকে স্বয়ম্ভর হতে হবে তেমনি শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে, আমদানীও হ্রাস করতে হবে। রপ্তানীমুখী শিল্প গড়ে তুললেও আমদানীর লাগাম টেনে ধরতে না পারলে বৈদেশিক ঋণ ও বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা বাড়তেই থাকবে। এর প্রতিবিধানের জন্যে চাই সৎ ও যোগ্য লোকের উদ্যোগ। অসৎ লোকের হাতে দেশের শিল্পোদ্যোগ নস্যাৎ হতে বাধ্য। কার্যতঃ হচ্ছেও তাই।

গ. অপব্যয়, দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রসার রোধ

"দুর্নীতিমূলক আচরণ আধুনিকীকরণের আদর্শ অর্জনের যেকোন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে খুবই অনিষ্টকর। দুর্নীতি উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা।" - বলেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত সুইডিস অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল তাঁর সুবিখ্যাত বই Asian Dramma-তে। কথাগুলো তিনি বলেছেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাঁর তথ্যানুসন্ধানী গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞাতা থেকে। অনুরূপভাবে অপচয় ও অপব্যয়ও উন্নয়নের পথে, স্বনির্ভরতা অর্জন ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে সমান অন্তরায়। অপচয়ের রন্ধ্র পথে

মিউনিসিপ্যালিটির বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরবরাহ করা লাখ লাখ গ্যালন পানি নর্দমা দিয়ে চলে যায়। একইভাবে বাংলাদেশে দৈনিক অফিস-আদালত ও বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে পরিমাণ কাগজ নষ্ট হয় তার পরিমাণ কয়েক টন। সারা বছরের হিসেবে ধরলে হাজার টনেরও বেশি হবে। এ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশনেরই এক অনুষ্ঠানে।

গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আমরা অপব্যয় নামক আর একটি বড় ধরনের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতির শিকার। আল্লাহ নিজেই আল-কুরআনে বলেছেন- "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই" (সূরা বনি ইসরাইলঃ ২৭ আয়াত)। বাস্তবিকই বেহুদা ব্যয় বা অপব্যয় এবং বিলাস-ব্যসনও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তাই সৎভাবে অর্জিত অর্থও বেহুদা ব্যয় করা নিষিদ্ধ। অথচ আমাদের দেশে একযোগে অপচয়, অপব্যয় ও দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলেছে। সরকারী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি হতে সাধারণ কর্মচারীটি পর্যন্ত আজ অপচয়কারী, অপব্যয়ে উন্মুখ এবং দুর্নীতির কবলে নিপতিত।

পুতুলের বিয়ে ও শবেবরাতের আতশবাজিতে আজ হাজার হাজার টাকার শুধু আতশ বাজী পোড়ানো হয় যা দিয়ে কয়েকটি পরিবারের সারা মাসের খরচ নির্বাহ হতে পারে। ধনী পরিবারের শখের একটা কুকুরের পেছনে যা খরচ হয় তাতে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের সারা মাস চলে যেতে পারে নির্বিঘ্নে। বেহুদা খরচ সম্পর্কে মহান খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) এতদূর সর্তক ছিলেন যে, মিশরের গভর্ণর তাঁর সরকারী বাসভবনের প্রাচীর তৈরী করলে তাকে পদচ্যুত করা হয়। সেই প্রাচীরও ধূলিসাৎ করা হয় খলীফার নির্দেশে। খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সরকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতেন লেখার জন্যে কলমের নিব সরু করে নিতে এবং কাগজের মার্জিনেও লিখতে। উদ্দেশ্য ছিল সরকারী সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। অথচ আজ প্রবাদ বাক্যের মতো চালু হয়ে গেছে- "সরকারকা মাল দরিয়ামে ঢাল"। অর্থাৎ, সরকারের জিনিস হলে নদীতে ফেলে দাও। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে সরকারী জিনিস অপচয় করলে, অপব্যয় করলে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন নেই, কৈফিয়ৎ চাইবারও কেউ নেই।

দুর্নীতির কবলে পড়ে দেশের শিল্প আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। সার কেলেঙ্কারীর ফলে সার রফতানীকারী দেশের নিরীহ কৃষক পুলিশের গুলিতে লাশ হয়ে ফিরে গেছে নিজের বাড়ীতে। সীমাহীন দুর্নীতি ও অপরিমেয় লোভ এজন্যে দায়ী। এ দেশে সরকারী বিধান রয়েছে চট্টগ্রামের প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের কাছ থেকে কিনতে হবে বাস, ট্রাক ও জীপ। কিন্তু সেই বিধানকে থোড়াই কেয়ার করে সরকারী আমলা ও ধনী ব্যবসায়ীরা। তাদের জন্যে বিদেশ হতে আসে পাজেরো জীপ। কিভাবে এটা সম্ভব? সরকারী দপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনেকেরই ছেলে-মেয়েরা পড়ছে বিদেশে। কোন যাদুর কাঠি হাতে পেয়েছে তারা? এ রকম হাজারটা প্রশ্ন তোলা যাবে যার প্রতিটির উত্তর আঙ্গুলি নির্দেশ

করে দুর্নীতির দিকেই। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল -এর প্রকাশিত তথ্য ও রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে ২০০০ হতে ২০০২ সালে উপর্যুপরি তিনবার এককভাবে ও ২০০৩ সালে নাইজেরিয়ার সাথে যুগ্মভাবে দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এরচেয়ে গভীর পরিতাপ ও চরম লজ্জার আর কি হতে পারে?

দুর্নীতির আরেক ভয়াবহ ও বিপর্যয়কারী রূপ হলো কালো টাকা। উন্নত বিশ্বের চেয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বেই এর বিস্তার ও বিধ্বংসী রূপের বহিঃপ্রকাশ অনেক বেশী। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ হাজার হাজার কোটি কালো টাকার ভারে ন্যুজপৃষ্ঠ। বাংলাদেশে কালো টাকার পরিমাণ কত? এক হিসাবে এই পরিমাণ ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বছরে ছিল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান (দ্রষ্টব্য: *অর্থকথা*, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৬, ১৯৯৬)। কালো টাকার দাপটে প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধ্বস নামে। গরীব জনগণ আরও গরীব হয়, শক্তিধর হয়ে উঠে কালো টাকার মালিকেরা। কালো টাকা জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করে, সমাজে সৃষ্টি করে অনভিপ্রেত বৈষম্য। যেসব উপায়ে এক শ্রেণীর লোকের হাতে বিপুল কালো টাকা সঞ্চিত হচ্ছে সেগুলি হলো:

১. সরকারী তহবিল তছরূপ ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি জবরদখল;
২. চোরাচালান;
৩. মাদক দ্রব্যের ব্যবসা;
৪. মজুতদারী, কালোবাজারী ও পণ্যে ভেজাল প্রদান;
৫. বৈদেশিক মুদ্রার আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং;
৬. কর ফাঁকি দেওয়া;
৭. পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সুবাদে আয়;
৮. টেন্ডার জালিয়াতি ও নিম্নমানের নির্মাণ কাজ;
৯. ব্যাংক ঋণের লুটপাট;
১০. বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে কমিশন আদায়;
১১. ঘুষ ও চাঁদাবাজী ; এবং
১২. পারমিট-লাইসেন্স হস্তান্তর।

এই দুর্নীতি অপচয় অপব্যয় ও কালো টাকা প্রতিরোধের উপায় এদেশের আইনে আছে বলে দৃশ্যমান হয় না। কারণ যে সরিষায় ভূত ঝাড়াবে সেই সরিষাতেই রয়েছে ভূতের আছর। জবাবদিহিতার অভাব পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। সুতরাং, দেশের শ্রীবৃদ্ধি চাইলে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও ভোগান্তি দূর করতে চাইলে, সর্বোপরি ধনবন্টন ও জীবন যাপনে প্রকট বৈষম্য দূর করতে চাইলে সমাজ দেহ হতে এই চার কালব্যধি দূর করতে হবে চিরতরে। এরা একযোগে এতই শক্তিশালী যে সরকার

পর্যন্ত উৎখাতে সমর্থ। মরণ ব্যাধি এইডসের হাত থেকে বাঁচার যেমন একটাই উপায়-- শরীয়াহসম্মত জীবন যাপন, তেমনি এই চার দুষ্টগ্রহ হতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ইসলামী অনুশাসনের অনুপুঙ্খ বাস্তবায়ন। সে কাজ করতে পারে নতুন প্রজন্মের তরুণরা। সাহস-শৌর্য, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার দ্বারা তারাই সব ধরনের সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে জনমত গড়ে তোলা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার জন্যে দুর্বার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের পবিত্র দায়িত্বও তাদের। একমাত্র নির্লোভ ও সাহসী যুব শক্তিই অর্থনীতির এই দূরারোগ্য ক্ষত নির্মূল করে তাকে তেজীয়ান ও গতিশীল করে তুলতে সমর্থ।

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দূরীকরণ

স্বাধীনতা লাভের সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে ঘাটতি ছিল এখন তা কয়েক হাজার গুণ ছাড়িয়ে গেছে। সেই ঘাটতি পূরণ ও রোধের সর্বাত্মক চেষ্টা না করে সকল সরকার ক্রমাগত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান নিয়েই চলেছে। ফলে বিদেশে আমাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি হ্রাস পেয়েছে টাকার মূল্যমান ও ক্রয়ক্ষমতা।

ব্যাপক চোরাচালান, ব্যবসায়িক অসাধুতা, আমলাদের দুর্নীতি সর্বোপরি মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি এত প্রকট। এই অবস্থার নিরসনকল্পে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী রোধের পাশাপাশি চোরাচালান বন্ধ করা দরকার কঠোরভাবে। চোরাচালানীরা সমাজের শত্রু। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে এদেশে সরকারী মহলের দুয়ার তাদের জন্যে উন্মুক্ত। মাঝে মাঝে যা দু-চারজন ধরা পড়ে তারা চুনোপুঁটি। রাঘব বোয়ালেরা থেকে যায় পানির গভীরেই। তাদের নাগাল পাওয়া ভার। এদেশে চোরাচালানীরা সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসারকে হত্যা করেও পার পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে রয়েছে ভেতর থেকেই দেশের শিল্প-কারখানা ধ্বংস করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র। মুক্তবাজার অর্থনীতির অসময়োচিত ও ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্যে ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পাবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই বিপুল ঘাটতি রোধ করতে হলে বাণিজ্যনীতির পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। ব্যবসায়িক অসাধুতা দূর করতে হবে এবং আমলাদের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের জন্যে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়াসও অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। আমদানীবিকল্প শিল্প স্থাপন করে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে হলেও সংরক্ষণ বা নিরাপত্তা দিতে হবে। পাশাপাশি বিদেশে আমাদের পণ্যসামগ্রীর বাজার খুঁজতে হবে সত্যিকার আন্তরিকতা দিয়ে, খাঁটি দেশপ্রেম দিয়ে বর্তমানে যার নিতান্তই অভাব।

ঙ. বেকারত্বের অভিশাপ হতে মুক্তি

বাংলাদেশে আজ লক্ষ লক্ষ লোক বেকার। বেকারত্বের অভিশাপে গোটা অর্থনীতি বিপর্যস্ত। বেকারত্বের কারণে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর সমাধান

রয়েছে ইসলামী পদ্ধতির মধ্যেই। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে পুঁজির যোগান পেতে হলে উদ্যোক্তাকে হতে হবে বিত্তশালী। প্রার্থিত পুঁজির সমপরিমাণ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জামানত হিসেবে দেখাতে না পারলে পুঁজি মেলে না। এই কারণেই সুদী ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্যে বিনিয়োগ পুঁজির সংকট তীব্র। অনেক সময়ে পুঁজির পর্যাপ্ত যোগান থাকলেও উপযুক্ত গ্রাহক থাকে না। এই ব্যবস্থায় যার যথেষ্ট জামানত দেবার সামর্থ্য আছে সেই শুধু পুঁজি পাবে এবং তার কারবার ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে উঠবে।

এই পুঁজি সংকটের সমাধান রয়েছে ইসলামেই। মুদারিবাত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা ইসলামী অর্থনীতির অনন্য অবদান। এই ব্যবস্থায় সাহিব আল-মাল (পুঁজির যোগানদার) ও মুদারিবের (উদ্যোক্তা) মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে কারবার বা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্জিত মুনাফা পূর্বস্বীকৃত অংশ বা হার অনুসারে উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়। সমাজে কিছু লোক রয়েছে যাদের নিকট প্রচুর অর্থ আছে। কিন্তু তা কাজে লাগাবার মতো শক্তি বা ব্যবসায়িক বুদ্ধি তাদের অনেক সময়ই থাকে না। কখনো বা শরীয়াহর কারণেই তাদের এ সুযোগ নেই। অনুরূপভাবে সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যাদের প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি ও ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাব নেই, অভাব শুধু প্রয়োজনীয় অর্থের। যদি এই দুই ধরনের লোকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় তাহলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও অর্থাগমের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। এর ফলে শুধু যে এ দুই শ্রেণীর লোকই উপকৃত হবে তা নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথও প্রশস্ত হবে।

মুদারাবার পথ ধরেই আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচীর প্রসার ঘটতে পারে। বাংলাদেশে যে তীব্র বেকারত্ব রয়েছে তার সমাধান আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী গ্রহণে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার মধ্যেই। এজন্যে তাদের প্রশিক্ষণ দেবার পাশাপাশি মূলধনেরও যোগান নিশ্চিত করা জরুরী। মূলধন যোগানের জন্যে মুদারিবাত খুবই উত্তম ও কার্যকর পদ্ধতি সন্দেহ নেই। করযে হাসানার কথাও এই সাথে বিবেচ্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নী কারবারে বা ঋণভিত্তিক ব্যবসায়ে যত শোষণ ও যুলুমের অবকাশ রয়েছে তা দূর করার মানসেই মুদারিবাত ও করযে হাসানার প্রবর্তন ইসলামী অর্থনীতির এক বৈপ্লবিক ও কার্যকর বলিষ্ঠ হাতিয়ার। বাংলাদেশে এ দুয়ের প্রবর্তন বিদ্যমান সংকট নিরসনের সর্বোত্তম উপায়।

ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্যে সমাজের বিত্তশালী লোকদের নিকট হতে করযে হাসানা নেওয়ার প্রথা চালু হয় রাসূলে করীম (সা.) মদীনায় হিজরতের পর হতে। এজন্যে সমাজে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। বায়তুলমাল হতেও করযে হাসানা নেবার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। বাংলাদেশে করযে হাসানার প্রচলন নেই। কারণ মানুষের মধ্যে আমানতদারী ও নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে মারাত্মকভাবে।

উপরন্তু দেশে বিদ্যমান আইনও মুদারিবাত ও করযে হাসানা কার্যকর করার অনুকূল নয়। তাই প্রয়াস চালাতে হবে যুগপৎ আইন সংশোধনের এবং মুদারিবাত ও করযে হাসানা পদ্ধতি চালু করার। সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরীর মধ্যেই এর উত্তর নিহিত রয়েছে। আশা করা যায়, আজকের ইসলামী কাফেলার অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রজন্ম মুদারিব ও করযে হাসানা গ্রহণকারী হিসেবে তাদের যোগ্যতা, সততা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যেমন নিজেদের বেকারত্ব দূর করতে সক্ষম হবে তেমনি সক্ষম হবে অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে।

চ. ইসলামী শরীয়াহ আইনের বাস্তবায়ন

এদেশে বিদ্যমান আইন ব্যবস্থায় ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত যেসব আইন-কানুন রয়েছে সেসব যদি যথাযথ এবং দ্রুত প্রয়োগ করা যায় তাহলে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের কাজ অনেকখানি সহজ হবে। উপরন্তু বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই বেশ কিছু অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা করাও সম্ভব হবে। অন্ততঃপক্ষে ফারায়েজ, মীরাসী আইন, শ্রমনীতি প্রভৃতি যেসব ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন রয়েছে সেগুলো প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধান করলে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আরও বেশী তৎপর হবে ইসলামের অন্যান্য সুবিচারপূর্ণ আইনের সুযোগ গ্রহণের জন্যে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান নিপীড়ন শোষণ ও বঞ্চনা দূর করতে অনেকখানি সহায়তা করতে পারে। এ দেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবেই ধর্মপরায়ণ। সুতরাং, তাদেরকে নিয়েই এগুনো সম্ভব। উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে তারা যে আপোষহীন সংগ্রামে জীবনবাজি রেখে অংশ নিতে পারে তার নজীর ভুরি ভুরি। ইতিহাসের সেই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান, যা প্রকৃতই কল্যাণধর্মী ও সুবিচারপূর্ণ, অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে।

ছ. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পাঁচটি--খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। অনেক দেরীতে হলেও জাতিসংঘ এবং তার অঙ্গসংস্থাসমূহ একথার স্বীকৃতি দিয়েছে। এই পাঁচটি প্রয়োজন পূরণে এদেশের সরকার উপযুক্ত আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। সেই সুযোগে ঈমানবিধ্বংসী এনজিওগুলো ছড়িয়ে পড়েছে দেশের গভীরে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেবার আড়ালে লুকানো তাদের দন্ত-নখর শেষ অবধি বেরিয়ে পড়েছে। এর মুকাবিলায় আমাদের আন্তরিকতার সাথে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিভাবে এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের সুব্যবস্থা করে জনসাধারণের জীবন যাপনের মান উন্নত করা সম্ভব সে বিষয়ে ইসলামের আলোকেই গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভাবতে হবে এবং যথোচিত পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য। সেজন্যে বিদ্যমান কৃষিনীতি ঢেলে সাজাতে হবে। ইসলামের ভূমিস্বত্ব, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্বের বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাতে হবে। বিপুল জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষক

এই দুই প্রান্তের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ও অসামঞ্জস্য রয়েছে তার অপনোদনও জরুরী। সেক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণই উচিত উপায়।

বাংলাদেশে সুলভে বস্ত্রের অভাবও প্রকট। স্বাধীনতা লাভের পর এই সমস্যা তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। অবস্থার এতদূর অবনতি হয়েছিল যে মৃতের দাফনের জন্যে কাপড়ের বদলে কলাপাতা ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেই ভয়াবহ সংকট এখন নেই। কিন্তু বস্ত্র এখনো দরিদ্র জনগণের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে। দেশের কাপড়ের কলগুলোর সমস্যা প্রধানতঃ দুটি--বিদেশী কাপড় চোরাচালানের অসম প্রতিযোগিতা এবং দেশে তূলা ও সূতার তীব্র সংকট। এই সংগে দুর্নীতি ও মাথাভারী প্রশাসনের কথাও উল্লেখ করতে হয়। তাঁতীরা নানা সংকটের সম্মুখীন। অথচ তারাই গ্রামাঞ্চলে কাপড়ের সিংহভাগ যোগানদার। তাদের রং, সূতা ও পুঁজির অভাব তীব্র। ভূয়া সমবায়ের মাধ্যমে সূতা বিতরণের ফলে প্রকৃত তাঁতীদের হাতে সূতা পৌঁছেনা; চড়া দামে তাদের সূতা কিনতে হয় কালোবাজার হতে। যখনই সরকার বদল হয় তখনই নতুন একদল লোক তাঁতীদের প্রতিনিধি সেজে তাদের সর্বনাশ করে, নিজেরা বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে উঠে। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বিষে এই খাতটি জর্জরিত।

শীত মৌসুমে সাধারণ লোকেদের অবস্থা হয় আরও করুণ। শত সহস্র বনি আদম ছেঁড়া চট আর খবরের কাগজ গায়ে জড়িয়ে ফুটপাত, সরকারী বে-সরকারী ভবন ও দোকানের বারান্দায় রাত কাটায়। আমাদেরই কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করা বিদেশী পুরাতন শীতবস্ত্র গাঁটকে গাঁট রাতের আঁধারে সীমান্ত পার হয়। কারা একাজ করে জনগণ তা জানে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন জনতার প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল। চোরাচালান রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও যথাযথ তৎপর নয়। বস্ত্রখাতে এই নাজুক অবস্থা দূর করার জন্যে গোটা উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার পাশাপাশি প্রকৃত তাঁতীদের করযে হাসানা প্রদান, উপযুক্ত সমবায় সমিতি গঠন, কঠোরভাবে চোরাচালান দমন এবং অসম প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ করা জরুরী।

দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এজন্যে জনগণের দারিদ্র্য যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী সরকারের ভ্রান্তনীতি। শহরাঞ্চলে বিত্তশালীরা বাড়ী তৈরীর জন্যে বিপুল অঙ্কের ঋণ পায় হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হতে। পূর্বতন ঋণ শোধ না করেও রেহাই পেয়ে যাচ্ছে বহুলোক। তাদের বাড়ী নিলামে বিক্রী হচ্ছে সত্যি, কিন্তু এর মধ্যে রয়ে গেছে শুভংকরের ফাঁকি। ছয়-সাত লাখ টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ী তৈরীর জন্যে তারা প্রকৃতপক্ষে ব্যয় করেছে দুই-তিন লাখ টাকা। উৎকোচ দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের। এরপর ইচ্ছাকৃতভাবেই তারা ঋণের কিস্তি শোধ করেনি। অথচ ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করেছে ঠিকই। অবশেষে এক সময়ে ঋণের টাকা আদায়ের জন্যে ঐ বাড়ী নীলামে চড়ায় এইচবিএফসি। বিক্রী হয় ঐ দুই-তিন লাখ টাকাতেই। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও ব্যাংকের ঋণ তাৎক্ষণিক শোধ হলো না। কিন্তু মূল ঋণ গ্রহীতা বিনা পুঁজিতেই চার-পাঁচ লাখ টাকার মালিক হয়ে সটকে

পড়ার সুযোগ পেলো। তাকে গ্রেফতার করে বা তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করে টাকা আদায়ের কোন সুযোগ নেই বিদ্যমান আইনে।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ভিন্নতর। সেখানে সরকারী সাহায্যের বা ঋণের কোন সুযোগ নেই। ফলে সাধারণ মানুষ যেভাবে জীবন যাপনে বাধ্য হয় তা সভ্যতার চরম অবমাননা। মানুষের এই তৃতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে সরকার এগিয়ে না এলেও এনজিওদের কেউ কেউ এগিয়ে এসেছে। বিশেষতঃ গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্রাক এ ব্যাপারে জোরদার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফল কি দাঁড়িয়েছে? যাদের সহযোগিতার ফলে নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হচ্ছে স্বভাবতঃই তাদের প্রতি মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি হচ্ছে দরিদ্র লোকদের। পরিণামে এনজিওদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ জীবনে। এর প্রতিকারের জন্যেই সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, ইসলামী এনজিও গঠন, যাকাতের অর্থের পরিকল্পিত ব্যবহার এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গৃহনির্মাণ ঋণদানের জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে পুষ্টিশিক্ষা, প্রতিষেধকের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, গ্রামাঞ্চলে এসবের সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার এগিয়ে আসেনি। বরং সুযোগ বুঝে এগিয়ে এসেছে এনজিওরা। তারাই গ্রামে গ্রামে মহিলাদের সন্তান পালন, পুষ্টি শিক্ষা, প্রতিষেধক গ্রহণ, স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। সেই সঙ্গে খোদাদ্রোহিতার, ইসলামবিরোধিতারও বীজ বুনে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলেও সরকারের চরম ব্যর্থতা লক্ষ্যণীয়। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সুবিধা নেই বলেই জীবন বাঁচাতে মানুষ ট্যাকের কড়ি গোণে। তারই সুযোগ নেয় ডাক্তার নামের ব্যবসায়ী মানুষগুলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে গড়ে ওঠে ক্লিনিক নামের চিকিৎসা-ব্যবসা কেন্দ্র। এসব ক্লিনিক অথবা সাইনবোর্ডসর্বস্ব হাসপাতাল যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তা আদৌ যাচাই করা হয় না। উপযুক্ত টীম দিয়ে নিয়মিত পরিদর্শন করা তো হয়ই না, ধার্যকৃত ফি-এর ক্ষেত্রেও রয়েছে নিদারুণ তারতম্য। সরকার একটু উদ্যোগ নিলেই স্বাস্থ্য সেবার মান বাড়াতে পারে। এদেশের জাতীয় ঔষধনীতিই তার প্রমাণ। এই নীতির ফলে প্রমাণিত হয়েছে অনেক কম দামেই প্রয়োজনীয় ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণেই সরবরাহ করা সম্ভব।

এদেশের সরকার দুই দশক আগে ঘোষণা করেছিল থানা হেলথ্ কমপ্লেক্সে একজন ডেন্টিস্টসহ পাঁচজন ডাক্তার থাকবে। এক সময়ে সত্যি সত্যি তা ছিলও। আজ আর নেই। পাঁচজনের এক বা দুইজন পালা করে কমপ্লেক্স পাহারা দেয়, বাকীরা সবাই জেলা সদরে প্রাকটিস করে। ফলে চিকিৎসা সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোকেরা। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক সফরে অনুপস্থিত ডাক্তারের সাময়িক বরখাস্তের আদেশও অবস্থার কোন উন্নতি হয় না। সরকার ঢালাওভাবে ডাক্তারদের বিদেশে পাড়ি দেবার অনুমতি দিয়ে চিকিৎসা সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। যেকোন উন্নত দেশের তুলনায় এদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে ডাক্তরের সংখ্যা খুবই কম। দুঃখের সঙ্গে

বলতে হয়, একজন ডাক্তার তৈরীতে জনসাধারণের ব্যয় হয় তিন লক্ষ টাকারও বেশী, অথচ সেই ডাক্তারের সেবা লাভ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। আর্ত-মানবতার সেবায় আমাদের ডাক্তারদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে; পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সুবিধা, পুষ্টিশিক্ষা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থাও করতে হবে।

জীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা দারুণ পশ্চাৎপদ। জ্ঞান অর্জন ইসলামে ফরয করা হয়েছে। অথচ এদেশের অর্ধেক লোক এখনও সত্যিকার অর্থেই নিরক্ষর। এক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে, কিন্তু বাধ্যতামূলক করা হয় নি। গ্রামে-গঞ্জে স্কুলের সংখ্যা এখনও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। যেসব স্কুল রয়েছে সেসবেও দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির ঈমান-আকীদার চর্চা ও শিক্ষার সুযোগ মানসম্মত নয়। এ দেশেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েরা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে যতটা জানে এবং আচরণ করতে বাধ্য হয় সরকার পরিচালিত স্কুলগুলোতে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা ইসলাম সম্বন্ধে অনুরূপ মানের জ্ঞান অর্জন করে না। এক্ষেত্রে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মসজিদভিত্তিক মক্তবগুলো যে খেদমত করে যাচ্ছে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

এদেশের সরকারগুলো নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়েছে। গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নৈশ পাঠশালা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখা) ইত্যাদি কার্যক্রমে সুফল না পেয়ে শেষ অবধি মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এতে আশাতীত সুফল পাওয়া যাচ্ছে বলে সম্প্রতি পরিচালিত এক জরীপ থেকে জানা গেছে। আসলেই দেশের দুই লক্ষাধিক মসজিদে যদি গড়ে বিশজন ছেলেমেয়েও দ্বীনি তালিম-তরবিয়াতের পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা লাভ করে তাহলে প্রতি পাঁচ বছরে দুই কোটিরও বেশী ছেলেমেয়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্ত হবে। শিক্ষা যেহেতু সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের চালিকা শক্তি সেহেতু এর প্রতি অধিক যত্নবান ও মনোযোগী হতে হবে। কয়েকটি এনজিও এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটি পুরোটাই নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এর প্রতিবিধান করতে হলে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সচেতন দেশবাসীকেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' -শুধু এই আপ্তবাক্য আওড়ালে জাতির উন্নতি হবে না। এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান দুর্নীতি ও সন্ত্রাসেরও উৎপাটন অপরিহার্য। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস অপরিহার্য। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস অব্যাহত থাকলে শিক্ষাঙ্গন ধ্বংস হয়ে যাবে। শিক্ষার মান নেমে যাবে নীচে, ইতিমধ্যে গেছেও। শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রের ঝনঝনানি মুক্ত করতে হলে এবং শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্র সমাজকেও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হতে হবে। সন্ত্রাস দিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না, বরং ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমেই জনতার হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করা যায়। ইতিহাসের শিক্ষাই তাই।

জ. জনসমর্থন সৃষ্টির জন্যে প্রচারণা

শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মন-মানসিকতা ইসলামমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন ইত্যাদির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে ইসলামী অর্থনীতির প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৭৮ সালে ইসলামী অর্থনীতির উপর প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনের মধ্যে দিয়ে এদেশের গণমানসে আলোড়ন ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির যে ধারা শুরু হয়েছিল আজও তা অব্যাহত রয়েছে। আজও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও কতিপয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক বিষয়ে বহু সেমিনার ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। ঐসব অনুষ্ঠানে যে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে তা অভাবিত। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি যে সুপ্ত আকাংখা রয়েছে তার উপযুক্ত পরিপোষণ করতে পারলে এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে সমর্থ হলে এদেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা খুবই সম্ভব।

ঝ. গণসচেতনতা ও গণদাবী সৃষ্টি

ইসলামী অর্থনীতির সঠিক রূপ এবং এর কার্যকরিতা সম্বন্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা ও গণদাবী সৃষ্টি করা সম্ভব। এজন্যে যেমন চাই সহজবোধ্য বই, তেমনি চাক্ষুষ জানার জন্যে চাই অডিও-ভিডিও মাধ্যমের সর্বোচ্চ ব্যবহার। জনগণ গ্রহণ না করলে ভাল জিনিসেরও মূল্য নেই। ভাল জিনিসের জন্যেও চাই প্রচারণা। আমাদের দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিরক্ষর। তাদের কাছে ইসলামী অর্থনীতি তথা ইসলামী জীবনাদর্শের সুফল তুলে ধরতে অডিও-ভিডিওর মাধ্যম খুবই উপযোগী। এই উদ্দেশ্যে বিদেশে অনেক চিত্তাকর্ষক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ করে সেসবের ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম সাহেবদের অনেকেই ইতিমধ্যে স্ব স্ব এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা যদি ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদী বিষয় জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করেন তাহলে জনমানসে পরিবর্তন সূচিত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী না হওয়ার কারণ নেই। এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান করতে হলে ইসলামী মানসিকতায় গড়ে ওঠা জনসমষ্টির অচেতন ও সংশয়দুর্বল মনকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে ইসলামী মূল্যবোধ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। ফলে সমস্যাসমূহ দূরীভূত হয়ে ইসলামী জীবন বিধান পালনের পথ সুগম হবে।

ঞ. পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ

ইসলামী অর্থনীতির সুফল জনসমক্ষে চাক্ষুষভাবে তুলে ধরতে হলে চাই সফল প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের পরিচিতি। এজন্যে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করা খুবই যুক্তিযুক্ত। উদাহরণতঃ শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বেই সুদের বিরুদ্ধে কার্যকর

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রমাণ করার জন্যেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু হয় তিন দশক আগে। শরীয়াহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালনা করে প্রমাণ করা গেছে যে সুদ ছাড়াও ব্যাংক চলতে পারে। শুধু চলতেই পারে না, সাফল্যের বিচারে এই ব্যাংক সুদী ব্যাংকের বিরুদ্ধে সার্থক চ্যালেঞ্জও বটে। অনুরূপভাবে যাকাত বিলি-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে যে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ লাভ করা গেছে তার আলোকে নির্দিধায় বলা যেতে পারে যে, যাকাত ইসলামী সমাজ তথা অর্থনীতিতে দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সেফটি ভালভ বা রক্ষা কবচ।

সুতরাং, পাইলট প্রজেক্টের সাফল্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগণকে বিশেষ কর্মসূচী বা পদ্ধতির সাফল্য ও কৃতকার্যতা হাতে-কলমে দেখানো যায়, অন্যদিকে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকেও অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে চাপ দেওয়া সহজ হয়। প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রায়োগিক সাফল্যের পাশাপাশি যুগপৎ জনগণের সোচ্চার দাবী সরকারকে বাধ্য করে উপযুক্ত পরিবর্তন বা সংস্কার করতে। এভাবেই ধীরে ধীরে বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই অনেকখানি সাফল্য অর্জন সম্ভব। তবে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের জন্যে অবশ্যই সার্বিক পরিবর্তন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

উপসংহার

শুরুতে একট বিষয়ের উল্লেখ করা হয়নি। এই আলোচনার কোথাও সরকারের কাছে কিছু যেমন প্রার্থনা করা হয়নি, ইসলামী অর্থনীতির অনুকূলে সরকার স্বেচ্ছায় কিছু করবে তেমন কল্পনাও করা হয়নি। বরং সরকারের নেতিবাচক ভূমিকাকে কি করে পরিবর্তন করা যায় সেসব পদক্ষেপেরই আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে ঐসব নীতি ও পদ্ধতি যেগুলো দেশের তৌহিদবাদী জনতা ও জাগ্রত ছাত্রসমাজ অনুসরণ করবে। বিদ্যমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই শুধু এই বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ সত্য। সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হলে এসব পদক্ষেপের আদৌ প্রয়োজন হবে না। তবে সেদিন যেহেতু এখনও দূরে, তাই সেই দিনের লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটা কথা উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশসমূহে আজ চিন্তা চলেছে কিভাবে সত্যিকারের জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড নিশ্চিত করা যায়, কিভাব প্রত্যেকের ভাগ্যের উন্নতি বিধান করা যায়। সেজন্যেই বিশ্বব্যাংক পুরাতন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে নতুন চিন্তা-ভাবনার আমদানী করেছে তাদের গবেষণায়। তাদের নতুন Prescription বা পরামর্শপত্রে বলা হচ্ছে Structural Adjustment বা কাঠামোগত পুর্নবিন্যাসের কথা। এর মূল বক্তব্যই হচ্ছে ধন-বন্টনে বৈষম্য দূরীকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হ্রাস, মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ এবং দুর্নীতির উচ্ছেদ। বিলম্বে হলেও বিশ্বব্যাংক নতুন আঙ্গিকে উন্নয়নের সমস্যা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই কর্মকৌশলে ইসলামের নৈতিক ছাঁকনী না থাকায় এবং ইসলামের বিশ্বদর্শনের সাথে এর কোন সাযুজ্য না থাকায় মুসলিম উম্মাহর এতে কোন উপকার হবে না। তাই এই

উদ্যোগে আত্মতৃপ্ত বা উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এর মধ্যে ইসলামী শরীয়াহর যে উদ্দেশ্য বা *মাক্বাসিদ আল-শরীয়াহ* তা অর্জনের কোন সুযোগ নেই। এরই বিপরীতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। মৌলবাদ প্রতিরোধের জিগির তুলে, সন্ত্রাসবাদের দায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনকেই বানচাল করার অপচেষ্টা চলেছে। পুঁজিবাদের কায়েমী স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্যে ইসলামী আন্দোলন ও মূল্যবোধ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন কৌশল, বিস্তৃত হচ্ছে ষড়যন্ত্রের নতুন জাল।

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই মুসলিম প্রধান। তাদের সচেতন সত্ত্বার বিকাশ এবং পুঁজিবাদের প্রভাব বলয়ের বাইরে উন্নতি লাভ কিছুতেই সহ্য হওয়ার নয় পুঁজিবাদী বিশ্বের। তাদের প্রধান মুরুব্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের দোসর ইহুদী কোটিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যমগুলি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছে তথ্যসন্ত্রাস। বিশ্বব্যাংক, এমনকি খোদ জাতিসংঘও এদের হাতে খেলার পুতুল। তাই বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের দেওয়া প্রেসক্রিপশনের তোয়াক্কা না করে আমাদের নির্ভর করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সা.) শাশ্বত বাণীই হবে আমাদের পথ নির্দেশক, আমাদের সাফল্যের ভিত্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন-

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভিতর প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কারণ নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"
(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২০৮ আয়াত)

একই সঙ্গে তাঁর জলদগম্ভীর ঘোষণা হলো- "আল্লাহ ততক্ষণ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।"
(সূরা রাদ : ১১ আয়াত)

সেজন্যেই আজ এমন মুসলমানের প্রয়োজন যারা শত অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির মুকাবিলাতেও হালালকে অর্জন ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং হারামকে বর্জন ও দূর্নীতি উচ্ছেদের জন্যে সংকল্পবদ্ধ। এ দায়িত্ব সকলের, তবে বিশেষভাবে সচেতন মুসলিম যুবসমাজের। তারা যদি একবার জেগে ওঠে, তৌহিদী বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সত্যিকার সদিচ্ছা ও দুর্জয় মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাহলে ইসলামী অর্থনীতির বৈপ্লবিক কার্যক্রমের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা আজও মোটেই অসম্ভব নয়। সেদিন দূরে নয় যেদিন বিশ্ব যুবমুসলিমের হাতেই ইসলামের ঝাণ্ডা উড়বে পৃথিবীর দিকে দিকে। আল-কুরআনের ভাষাতেই বলতে হয়-

"সত্য সমাগত, মিথ্যা বিদূরিত। নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"
(সূরা বনি ইসরাইল: ৮১ আয়াত)

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী সরকারের ভূমিকা

পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের সেই প্রথম যুগ হতে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দা (Great Depression) সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থনীতি শাস্ত্রে আয় বৈষম্য দূরীকরণ, ধনবন্টনে সাম্য অর্জনের প্রয়াস এবং দারিদ্র্য বিমোচনে প্রয়োজনীয় সরকারী উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গ কোন গুরুত্বই লাভ করেনি। কুইজনের *Tableau Economique* -এর সময় হতে শুরু করে ফিজিওক্রাটদের যুগ পেরিয়ে মার্কেন্ট্যাইলিজমের দোর্দন্ড প্রতাপকাল শেষ করে *Laissez faire* -এর যুগ পর্যন্ত কোথাও সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত ও মন্দভাগ্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ তথা মানুষের মতো জীবন যাপনের গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় ইংল্যান্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মজবুত ভিত্তি অর্জন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বিপর্যয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিতে শুধু কাঁপনই ধরায় নি, বরং তাতে এক গভীর ফাটল সৃষ্টি করে। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতে ধনীদের দ্বারা দরিদ্রদের বেপরোয়া শোষণের অবসান এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও মন্দা দূর করার জন্যে সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ প্রসঙ্গ অর্থনীতির আলোচনায় ক্রমেই গুরুত্ব পেতে থাকে। সরকারী বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই দরিদ্রদের জন্যে আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ তথা সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ বা কৌশল অবলম্বন সম্পর্কে জে. এম. কেইনস ও তাঁর অনুসারীরা আলোচনা শুরু করেন।

কিন্তু এটা যেমন অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁদের নতুন অবদান ছিল না তেমনি সত্যিকার বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ উদ্ভাবনেও তাঁরা সমর্থ হননি। বরং পুঁজিবাদী সভ্যতা বিকাশের বহু শতাব্দী পূর্বে ইসলামই ঘোষণা করেছিল যে সমাজের ভাগ্যবিড়ম্বিত, বঞ্চিত ও দরিদ্ররা যেন তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা দেশের শাসক তথা সরকারেরই অপরিহার্য দায়িত্ব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সময়ের পরিবর্তনে মুসলিম শাসকদের আত্মবিস্মৃতির পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এবং বিদেশী সভ্যতার প্রভাবের ফলে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধ অনুসরণে দারুণ ব্যত্যয় ঘটে। ফলে সমাজে যেমন শোষণ, বঞ্চনা, একচেটিয়া কারবার ও ধনীদের নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি বৃদ্ধি পেতে থাকে দরিদ্র ও বেকার জনতার ভীড়। চৌদ্দশ হিজরীর শেষের দিক হতে এই অবস্থার ধীর পরিবর্তন শুরু হয়। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন করে আত্মোপলব্ধির ফলে নব

জাগরণের সূচনা হয় এবং সামাজিক বিভক্তি রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে শত-সহস্র পরামর্শ বা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরিতাপের বিষয়, সীমিত সময়ের বাইরে এসব পরামর্শ স্থায়ী ও কার্যকর সুফল সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কারণ মুসলিম দেশসমূহের সরকার এসব কর্মকান্ডে কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করেনি। অথচ সরকারের সর্বাত্মক ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পূর্ণ দায়বদ্ধতা ব্যতিরেকে দারিদ্র্য বিমোচনের কোন কর্মসূচীই সার্থকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। উপরন্তু এক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া সার্বিক সাফল্য আশা করা বৃথা।

বস্তুতঃপক্ষে দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং প্রবৃদ্ধির কাম্য হার অর্জনের লক্ষ্য কেবল মাত্র সরকারের কার্যকর ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত সরকারী নীতিমালা ও কর্মসূচী যার দ্বারা এমন সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে জনগণ তাদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সম্পদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে পারে। কোন ইসলামী সরকারের উচিত হবে না বাজারের অনিয়ন্ত্রিত শক্তির উপর সম্পদের বন্টন ছেড়ে দেওয়া। কারণ বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ, বিশেষ করে অভাবী ও অসহায়দের কল্যাণ নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এ জন্যেই সরকারের উচিত ইসলামের দিক-নির্দেশনার আলোকে কার্যকর ও বাস্তবানুগ কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো তৈরীর মাধ্যমে অর্থনীতিতে একটি দৃঢ় ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা।

সমাজের প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন তথা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রতিটি সরকার তথা রাষ্ট্রের নৈতিক ও আবশ্যিক দায়িত্ব। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জনসাধারণের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী সরকারের দায়িত্ব বিপুল। প্রত্যেক নাগরিকই যেন হালাল বা বৈধ উপায়ে উর্পাজন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান যেমন সরকারের দায়িত্ব তেমনি সব ধরনের হারাম বা অবৈধ কর্মকান্ড সমাজ হতে উচ্ছেদও সরকারের পবিত্র ও আবশ্যিক দায়িত্ব। কারণ হারামের রন্ধ্র পথেই সমাজে অকল্যাণ ও সর্বনাশের প্রবেশ ঘটে। সরকারের এই আবশ্যিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আল-কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন-

"তারা এমন লোক যে তাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নিয়মিত নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-হজ্জ্বঃ ৪১ আয়াত)

মানবতার মুক্তিদূত মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) তাঁর বাণীতে বলেছেন- "আল্লাহ্ যাকে মুসলমানদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে শাসক বানিয়েছেন সেই শাসক তাদের দারিদ্র্য মোচন ও প্রয়োজন পূরণের প্রতি উদাসীন রইলো আল্লাহও তার দারিদ্র্য ও প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন রইবেন।" (*সুনান আবু দাউদঃ ২য় খন্ড*, পৃ. ১১২)

তিনি আরও বলেছেন- 'যার কোন সহায় নেই, শাসকই তার সহায়। (*সুনান আবু দাউদ: ২য় খন্ড, পৃ. ৪৮১*)

রাসূলে খোদার (সা.) এসব বাণী গরীব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহান খুলাফায়ে রাশিদূন (রা.) তাঁদের খিলাফত কালে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন সেসবও এই বক্তব্যকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। প্রত্যেক আমীরুল মুমিনীনের গৃহীত পদক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সরকারের আবশ্যিক কর্তব্যই হচ্ছে অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ও বঞ্চিতদের মৌলিক প্রয়োজন এমনভাবে পূরণ করা যেন সমাজ হতে দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়।

প্রখ্যাত ফকীহ ও ইসলামী শাস্ত্রবেত্তাগণ একবাক্যে বলেছেন জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষতঃ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ শাসকেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব তিনি এমনভাবে পালন করবেন যেন তাদেরকে এ ব্যাপারে আর কারও কাছে প্রার্থী না হতে হয়। মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতে জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে রাষ্ট্র উৎপাদন, বন্টন, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং পূর্ত কর্মসূচীর আঞ্জাম দেবে। অনুরূপভাবে ইমাম আবু ইসহাক আল্-শাতিবী বলেন আল্লাহর আইন পাঁচটি বিষয়ের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দেয়-- ধর্ম, জীবন, সন্তান, সম্পদ এবং বুদ্ধিমত্তা। এই নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব সরকার বা রাষ্ট্রেরই।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর এক ভাষণে বলেন-রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের প্রত্যেকেরই সমান অধিকার রয়েছে। এই সম্পদে কারোরই, এমনকি খলীফার নিজেরও অন্যের চেয়ে বেশী দাবীর সুযোগ নেই। প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম আল-গাজ্জালীর মতে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিটি মুসলমানের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয় এবং তা সংরক্ষণেরও নিশ্চয়তা দেয়। এর একটি হচ্ছে প্রত্যেকের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা যার মধ্যে রয়েছে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এবং এমন অন্যান্য অনুষঙ্গী বিষয় যা সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যে অপরিহার্য বলে বিবেচিত।

সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ সমাজে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও ন্যূনতম সামাজিক সাম্য অর্জনের পাশাপাশি ভারসাম্যপূর্ণ আয় ও সম্পদের সুষম বন্টনেরও নিশ্চয়তা দেয়। মৌলিক প্রয়োজন পূরণের প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চালু থাকলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সম্পদ আবর্তিত হতে শুরু করে। এর ফলে চাহিদা উৎপাদন বিনিয়োগ কর্মসংস্থান উপার্জন প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়ের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরিণামে সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিপুলভাবে আলোড়িত হয়ে ধনাত্মক গতিবেগ লাভ করে। এ কারণেই ইসলাম আপামর জনসাধারণের প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা পূরণের গ্যারান্টির প্রসঙ্গটি সরকারের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের মজুত

তহবিল হতে ব্যয় সংকুলান না হলে অবশ্য প্রদেয় যাকাত উশর কর খাজনা এবং সাদাকাহ ছাড়াও সম্পদশালীদের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা ও এখতিয়ার আল-কুরআনের বিধান অনুযায়ীই সরকারের রয়েছে।

ইবনে হাযম সমাজের দুঃস্থদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্যে ধনীদের উপর বাড়তি কর আরোপের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে- "প্রত্যেক এলাকার সম্পদশালী ব্যক্তিগণ তাদের স্ব স্ব এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও নিঃসম্বলদের মৌলিক চাহিদা পূরণে বাধ্য। যদি বায়তুল মালে মজুদ সম্পদ এজন্যে পর্যাপ্ত না হয় তাহলে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে রাষ্ট্রপ্রধান সম্পদশালীদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে তাদের বাধ্য করতে পারেন।" (*আল-মুহাল্লাঃ* ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৬৬)

একেবারে সাম্প্রতিক কালের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে শহীদ সাইয়েদ কুতুব, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইউসুফ আল-কারযাবী, নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী প্রমুখ এই মর্মে ঐক্যমতে পৌঁচেছেন যে, প্রতিটি মুসলিম সরকারের দুটি যৌথ দায়িত্ব রয়েছেঃ (ক) প্রত্যেক নাগরিকের জন্যে ন্যূনতম মানের জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং (খ) মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না দেওয়া।

উপরের আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট যে, দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সমাজে আয় বৈষম্য হ্রাসের জন্যে গৃহীতব্য কর্মসূচীতে সরকারের অংশ গ্রহণ শুধু প্রয়োজনই নয়, বরং অপরিহার্যও। সরকারের সক্রিয় ও কার্যকর অংশ গ্রহণ ছাড়া উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কোন কর্মসূচীই কাংখিত সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে না। কারণ একমাত্র সরকারই একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় বিধি ও নীতিমালা তৈরী এবং জনগণের অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা রাখেন। বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান, তার ক্ষমতা ও আয়তন যত বড়ই হোক না কেন, কোনক্রমেই এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ নয়। তাদের কর্মসূচী কখনই সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে এযাবৎ বেসরকারী পর্যায়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ নানা ধরনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য দূর হয়নি। বরং মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করলে জাতীয় পর্যায়ে দেশের দারিদ্র্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯.৮ শতাংশ। (*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ২০০৪, পৃ. ১৫৬)

ইউএনডিপি প্রকাশিত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯৮-এ পৃথিবীর ১৭৪টি দেশে বিদ্যমান মানব সম্পদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) অনুসারে এই রিপোর্টে বাংলাদেশের স্থান ১৪৭তম, অপরদিকে সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলংকার স্থান ৮৯তম। বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ কুয়েতের (৫১তম) অনেক উপরে স্থান ল্যাটিন আমেরিকার মাঝারি আয়ের দেশ উরুগুয়ের (৩২তম)। অর্থাৎ, ধনী দেশ হলেই জনসাধারণের সার্বিক জীবন যাপনের মান উন্নত হয়ে

যায় না বা মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। তা যদি হতো তাহলে আজ উন্নয়নের চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব (Trickle down theory) মুখ থুবড়ে পড়তো না। এক সময়ে এই তত্ত্বের কথা খুব জোরে-শোরে বলা হতো। বলা হতো শহরের উন্নতি হলে, পুঁজি ও অন্যান্য সম্পদ যুগিয়ে বিত্তবানদের আরও সম্পদশালী করতে পারলে তাদের হাতের ফাঁক দিয়ে যা চুঁইয়ে পড়বে, উপরিকাঠামোর প্রবৃদ্ধি ঘটলে সেখান থেকে যা আপনাআপনিই নিচের দিকে চুঁইয়ে আসবে তাতেই দরিদ্ররা বেঁচে যাবে। কিন্তু বাস্তবে কি তাই ঘটেছে? সত্য হলো এই বাংলাদেশের অর্ধেকের মত লোক বাস করছে দারিদ্র্য সীমার নীচে। সুতরাং, সরকারকে আজ প্রকৃতই কল্যাণমুখী এবং দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

বিদ্যমান অবস্থার মধ্যেই অর্থাৎ দেশে এই মুহূর্তে যে আর্থ-সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থা বর্তমান তার মধ্যে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে এবং প্রশাসন যন্ত্রের উপর কোন বাড়তি বোঝা না চাপিয়ে কিভাবে ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদিত উপায়-উপরকণের পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে নীচে সেই কৌশল আলোচিত হলো। কারণ এক্ষেত্রে সার্বিক অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত কাঠামোর যে পরিবর্তন আনয়ন জরুরী তা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়বদ্ধ সরকার ছাড়া কারোরই পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারের গৃহীতব্য কর্মসূচীকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

ক. ভূমি সংক্রান্ত পদক্ষেপ;
খ. অর্থ সংক্রান্ত পদক্ষেপ; এবং
গ. নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ

ক. ভূমি সংক্রান্ত পদক্ষেপ

১. **ইসলামী মীরাসী আইনের কঠোর প্রয়োগ:** সনাতন অর্থনীতিতে উৎপাদনের জন্যে যে চারটি উপকরণকে বিবেচনা করা হয় জমি বা ভূমি তার মধ্যে প্রথম। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে যে মুসলিম দেশগুলো একেবারে উপরের দিকে রয়েছে সেগুলো প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর। সঙ্গতঃ কারণে কৃষিই এসব দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা। তাই উপার্জনের এই বৃহৎ উপকরণটি যদি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে ধনবন্টনে বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এজন্যেই মীরাসী আইন উৎপাদনের এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি সুষ্ঠু বন্টনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করেছে যেন মাত্র কিছু লোকের হাতে আয় ও সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার সুযোগ না হয়। মীরাসী আইনে শরীয়াহ নির্দেশিত অংশ অনুসারে মৃতের উত্তরাধিকারীগণ তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পাবে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। [*সূরা আন্-নিসা:* ১১-১২ আয়াত দ্রষ্টব্য]

সমাজে ধনবন্টনের ক্ষেত্রে যে কয়টি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় রয়েছে ইসলামের মীরাসী আইন তার অন্যতম। সমাজ হতে দারিদ্র্য হ্রাসেও এই আইন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র.) পর্যন্ত এই আইনের প্রয়োগ হয়েছে যথাযথভাবে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম শাসকবর্গ রাজতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকি পড়ায় এবং আইনের কঠোর ও তাৎক্ষণিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কারণে ধীরে ধীরে মীরাসী আইনের আক্ষরিক প্রয়োগ হ্রাস পেতে থাকে। পরিণামে আদালতে জমে উঠতে থাকে মামলা-মোকদ্দমার ভীড়। এক শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তারা দুর্নীতিপরায়ণ ও অসৎ ব্যক্তিদের মদদ জোগায়। ফলে মীরাসী আইনের প্রয়োগে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতাই হয়ে ওঠে প্রবল বাধা।

একথা সত্য যে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী মীরাসী আইন সরকারীভাবে স্বীকৃত এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এর সুষ্ঠু প্রয়োগের কোন সামাজিক বাধ্য-বাধকতা নেই, বিশেষ করে যখন ইয়াতীম ও মহিলাদের প্রসঙ্গ যুক্ত হয়। মহিলা উত্তরাধিকারীরা দুটি বড় অসুবিধার কারণে জমির উত্তরাধিকারত্ব অর্জনে অসমর্থ হয় : (ক) বিদ্যমান আইনে দেওয়ানী মামলার বিচারে অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রীতা, এবং (খ) বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব অর্থাৎ, হিন্দু ও খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত রীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া। বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত প্রভৃতি দেশে এর নজীর হাজার হাজার।

এই প্রেক্ষিতে যদি সম্পত্তিতে মহিলাদের অংশ বা যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সরকার সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয় তাহলে অর্থনীতিতে ধনবন্টনে বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্র্যও অনেকখানি দূর হবে। প্রথমতঃ এর ফলে পুরুষ সদস্যের অবর্তমানে তারা উপার্জনের অনিশ্চয়তায় ভুগবে না এবং দ্বিতীয়তঃ আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডেও তাদের অধিকতর ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে এখনও মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম শিক্ষিত এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলাদের এই তুলনামূলক পশ্চাৎপদতা শরীয়াহ আদৌ সমর্থন করে না। সুতরাং, মহিলাদের-যারা সমাজের অর্ধাংশ-ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার জন্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ছাড়াও সরকারকে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

২. **ওয়াকফ সম্পত্তিঃ** মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ওয়াকফ সম্পত্তি একাধারে জনকল্যাণে সহায়ক ও সরকারী ভূমি প্রশাসনেও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। দরিদ্র ও অভাবী জনগণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণে সহায়তার উদ্দেশ্যে দানশীল ও বিত্তশালী মুসলিমরা তাদের সম্পত্তি ওয়াকফ করে যান। একদা ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে বিপুল সংখ্যক লোকের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ হতো ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতেই। আমাদের দেশে এর ভুরি ভুরি নজীর রয়েছে। হাজী মুহম্মদ মোহসীন ওয়াকফ এস্টেট ও

নবাব ফয়জুন্নিসা ওয়াকফ এস্টেটের কথা এদেশের কোন্ শিক্ষিত মানুষ না জানে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে তো বটেই, মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশেও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এসব ওয়াকফ সম্পত্তি হয় সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে অথবা এলাকার শক্তিধর ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট লোকেরা জবরদখল করে ভোগ করছে।

প্রসঙ্গত: ওয়াকফ উৎস হতে বাংলাদেশে বার্ষিক কত আয় হয়ে থাকে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল। ওয়াকফ শুমারী ১৯৮৬ অনুসারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে রেজিস্ট্রিকৃত ওয়াকফ এস্টেটের সংখ্যা ৯৭,০৪৬টি, মৌখিকভাবে ও দলিলপত্রে স্বীকৃত ৪৫,৬০৭টি এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় চলে আসছে ৭,৯৪০টি। দেড় লক্ষাধিক এই ওয়াকফ এস্টেটের আওতায় ফলের বাগান, পুকুর ও আবাদী জমি মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ১.২০ লক্ষ একর জমি, সরকারী হিসাব মতেই যার বার্ষিক আয় ৯০.৬৫ কোটি টাকা। এই আয়ের সিংহভাগই চলে যায় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মাসোহারা/ভাতা প্রদানে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহার হলে এই উৎস হতেই যেমন আরও বেশী আয় হতে পারত তেমনি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর কল্যাণমুখী (কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনমূলক) কাজ করাও সম্ভব হতো। ইতিমধ্যে যেসব ওয়াকফ সম্পত্তির পুরোটা বা অংশবিশেষ বেহাত ও জবরদখল হয়ে গেছে সেগুলো উদ্ধারের জন্যে সরকার প্রকৃতই তৎপর হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ, অপুষ্টি দূরীকরণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা ও অভাব-অনটন অনেকখানিই দূর হতে পারতো।

৩. **উশর:** গ্রামাঞ্চলে কৃষি জমির মালিকানাসূত্রে আয়বন্টনজনিত পার্থক্য খুবই প্রকট। বিশেষতঃ বড় জমির মালিকেরা ক্রমশঃই বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে উঠতে পারে। এর প্রতিবিধানের অন্যতম ইসলামী কৌশল হলো ফসলের উশর আদায়। উশর ব্যবস্থা চালু হলে কৃষি আয় বন্টনে বিরাজমান দুস্তর বৈষম্যের অবসান এবং সমাজে শ্রেণী বৈষম্যেরও হ্রাস ঘটবে। রাসুলে করীম (সা.) বলেন-

"যে জমি বৃষ্টিপাত বা নদীর পানিতে আপনা আপনিই সিক্ত হয় সে জমির ফসলের এক-দশমাংশ (১০%) এবং যে জমি পানি সেচের দ্বারা সিক্ত করা হয় তার ফসলের এক-বিংশতি অংশ (৫%) আদায় করে দিতে হবে।" (*সহীহ আল-বুখারী:* কিতাব আল-যাকাত)

শরীয়াহ অনুসারে যারা যাকাতের হকদার উশরেরও তারাই হকদার। উশর আদায়ের ক্ষেত্রে যাকাতের মতোই নিসাব পরিমাণ ফসল উৎপাদন হওয়ার শর্ত রয়েছে। উশরের ক্ষেত্রে এই নিসাবের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক বা ৩০ মণ। ইরাকী পরিমাপ অনুসারে এর পরিমাণ ৯৮৮.৮ কেজি এবং হিযাজী পরিমাপ অনুসারে এর পরিমাণ ৬৫৩.০ কেজি। জমির পরিমাণ কম হলে (যেমন ২/৩ বিঘা) নিসাব পরিমাণ ফসল

হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই উশর আদায়ের ব্যবস্থা হলে ক্ষুদে ও প্রান্তিক কৃষকদেরই সুবিধা হবে। যেহেতু জমির পরিমাণের পরিবর্তে উৎপাদনের পরিমাণের উপর উশর নির্ভরশীল সেহেতু নিসাব পরিমাণ ফসল না হলে উশর দেওয়া হতে তারা রেহাই পাবে। উল্লেখ্য, ধনী কৃষকেরা ঋণ, বিপণন ও অধিক জমির মালিক হওয়ার কারণে ফসলের বহুধাকরণের সুবাদে যে নিশ্চিত ও অধিক আয়ের সুযোগ পায় গরীব কৃষকেরা সে সুযোগ হতে বঞ্চিত। ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষীরা জমির স্বল্পতা, ঋণের দুর্লভতা ও উৎপাদনের অনিশ্চয়তার জন্যে ক্রমেই ভূমিহীন কৃষকের কাতারে গিয়ে যুক্ত হচ্ছে। সুতরাং, উশর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রামীণ পরিমন্ডলে আয় বৈষম্য হ্রাসে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আয় বৈষম্য হ্রাসে জমির মালিকানার সীমা বেধে দেওয়া আর একটি কার্যকর উপায়। বহু মুসলিম দেশেই ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, বৃহৎ ভূস্বামীরা প্রায়ই এই সীমারেখা মানে না। বরং নানা কৌশলে তারা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে চলে। তাই আইনের প্রয়োগ কঠোরতর ও যথাযথ হওয়ার জন্যে সরকারকে অবশ্যই যত্নশীল ও তৎপর হতে হবে। পাশাপাশি জমির বিদ্যমান মালিকানা সীমারও পুনর্মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে মোট চাষযোগ্য জমির ৩৩%-এর মালিক মাত্র ৭% কৃষক যাদের প্রত্যেকেরই জমির পরিমাণ ৯ একর বা তার বেশী। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় এমন অনেক জমির মালিক আছেন যারা তাদের সব জমির উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও নিবিড় চাষাবাদ করতে পারেন না। অপরদিকে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকেরা বর্গায় চাষ করার জন্যে একখন্ড জমি পেতে অনেক সময় প্রতিকূল শর্তও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তাই কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্য সরকারের উচিৎ হবে বৃহৎ জমির মালিকদের আইনের মারপ্যাচে আরও জমির মালিক হওয়ার পথ রুদ্ধ করা এবং একই সঙ্গে ক্ষুদে ও প্রান্তিক চাষীদের যে জমিটুকু এখনও রয়েছে তা বিক্রী বা হস্তান্তর রোধের জন্যে কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা।

খ. অর্থ সংক্রান্ত পদক্ষেপ

১. যাকাত আদায় ও বন্টনঃ দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে সরকার প্রথম যে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে তা হলো যাকাতের সুষ্ঠু আদায় ও পরিকল্পিত ব্যবহার। যাকাত আদায় প্রতিটি সাহেবে নিসাব মুসলিম নর-নারীর জন্যে বাধ্যতামূলক। দুঃখের বিষয়, এদেশের অধিকাংশ সাহেবে নিসাব লোকই যাকাতের অর্থ বিলি-বন্টন করে থাকে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং অপরিকল্পিতভাবে। অথচ সমাজে ধনবৈষম্য হ্রাস এবং দরিদ্রদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে যাকাত আদায় এবং তার পরিকল্পিত ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপায়।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াও যাকাতের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বহুবিধ। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে না দেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। কারণ সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ায় সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য গভীর হয় ইসলাম যার ঘোর বিরোধী। ইসলামের দাবীই হচ্ছে একটা উন্নত ও সুখী সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণে বিত্তশালীরা অবশ্যই শরীয়াহসম্মত উপায়ে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহার করবে। কুরআন শরীফে সূরা আত-তওবায় যাকাত কাদের প্রাপ্য সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এর মধ্যে তিন ধরনের লোক সরাসরি দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর জনগণ যখন যাকাতের অর্থ পায় তখন অর্থনৈতিক কার্যক্রম চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যেহেতু দরিদ্রদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ধনীদের চেয়ে অনেক বেশী সেহেতু তাদের হাতে অর্থ স্থানান্তর হলে কার্যকর চাহিদার পরিমাণ প্রভূত বৃদ্ধি পায়। ফলে বাণিজ্য, উৎপাদন ও নির্মাণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পায়। পরিণামে সমগ্র অর্থনৈতিক পরিমন্ডলেই তেজীভাব সৃষ্টি হয়। [দ্রষ্টব্যঃ *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে যাকাত* শীর্ষক প্রবন্ধ।]

মুসলিম বিশ্বের গুটিকয়েক দেশের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া যাকাতের অর্থ আদায়, বিলি বন্টন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনা বা ব্যাপক পরিকল্পনা নেই। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও উদ্যোগই এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। ফলে যাকাতের সত্যিকার সুফল হতে মুসলিম মিল্লাত বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সরকারের উচিৎ হবে মহান খুলাফায়ে রাশিদূনের (রা.) অনুকরণে রাষ্ট্রীয়ভাবেই যাকাত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার কর্মসূচী গ্রহণ করা। বস্তুতঃ উপযুক্ত পরিকল্পনা, যথাযথ প্রেষণা এবং সঠিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপরেই যাকাত হতে কাংখিত আর্থ-সামজিক কল্যাণলাভ নির্ভরশীল।

আয় পুনর্বন্টন ছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে বলে ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে ইয়াতীম নিরক্ষর অদক্ষ প্রতিবন্ধী পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত শিক্ষা, শারীরিক যোগ্যতা ও চলাফেরার স্বাধীনতার অভাবই এর কারণ। এরাই সরকারের টার্গেট হওয়া উচিৎ এবং এদের জন্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। সমাজ হতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশা দূর করতে হলে মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি এদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। এজন্যে যাকাতের অর্থ সরকারের বড় সহায়ক হতে পারে। যাকাত যারা আদায় করে না সেই অমনোযোগী সাহেবে নিসাবদের সতর্ক করা, প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করাও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

২. **কুরবানীর চামড়া বিক্রয়লব্ধ অর্থঃ** শরীয়াহ অনুসারে কুরবানীকৃত পশুর চামড়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ গরীব-দুঃখীদের হক। সাধারণতঃ যিনি কুরবানী করেন তিনি নিজেই এই

অর্থ নিজস্ব পছন্দ মতো গরীবদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেন। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সমাজসেবী সংগঠন ও মাদ্‌রাসাসমূহের লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনা কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই সম্ভাব্য কুরবানীকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কুরবানীর পুরো চামড়া অথবা বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশবিশেষ সংগ্রহ করছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো এককালীন বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হচ্ছে এবং তাদের প্রয়োজনের কিছুটা হলেও পূরণ হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, বেশীর ভাগ চামড়া বিক্রীর অর্থ কোন পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই অভাবী জনগণের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। এতে সাময়িকভাবে তাদের অভাব কিছুটা পূরণ হলেও তাদের দারিদ্র্য রয়ে যায় স্থায়ীভাবেই। অথচ এলাকাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন করে সেই অনুসারে এই অর্থ ব্যবহার করলে ক্রমে দারিদ্র্যই দূর হতে পারতো।

বাংলাদেশে কুরবানীর চামড়া বিক্রী থেকে কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। এক্ষেত্রে বছরওয়ারী হিসাব দেওয়া সম্ভব না হলেও একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করা যায়। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যুরো অব স্টাটিস্টিকসের বিভিন্ন বর্ষপঞ্জী, কৃষি শুমারী ও ট্যানারী শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের সূত্রে জানা যায়, এদেশে গত এক দশকে প্রতিবছর গড়ে গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়া হতে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পিস চামড়া পাওয়া গেছে । যারা চামড়া ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও আধা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ট্যানারী ও ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করে তাদের কাছ থেকে জানা গেছে তাদের বার্ষিক সংগৃহীত চামড়ার মধ্যে কমপক্ষে ৩০% চামড়া সংগ্রহ হয় শুধুমাত্র ঈদুল আযহার দিনে। তাদের মতে এই দিনে সংগৃহীত গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার চামড়ার অনুপাত দাঁড়ায় সাধারণতঃ ৩:২। এই হিসেব অনুসারে এই দিনে প্রাপ্ত অন্যূন ৪৫ লক্ষ পিস চামড়ার মধ্যে গরুর চামড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ পিস এবং ছাগল-ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ লক্ষ পিস। অন্য এক হিসাবেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এদেশে পরিবারের (Household) সংখ্যা দুই কোটিরও বেশী। এদের মধ্যে যদি অন্ততঃপক্ষে ২০% পরিবার ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করে তাহলেও ৪০ লক্ষ পশু কুরবানী হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, অনেক পরিবারই গরুর পাশাপাশি ছাগল বা ভেড়াও কুরবানী করে থাকে। গরুর কাঁচা চামড়ার দাম আকার নির্বিশেষে প্রতিটি গড়ে টাঃ ১,০০০/- এবং ছাগল-ভেড়ার কাঁচা চামড়ার দাম প্রতিটি গড়ে টাঃ ৭৫/- ধরলে বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় টাঃ ২৮৩.৫০ কোটি। বাস্তবে এই পরিমাণ যে আরও বেশী হবে তা বলাই বাহুল্য।

সকল মুসলিম দেশে তো বটেই, অমুসলিম দেশেও মুসলমানরা কুরবানী করে থাকে। গরীবের হক এই বিপুল অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারেই তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যেই ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দরিদ্র জনসাধারণের হক এই বিপুল অর্থ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ব্যয়িত হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

৩. **সুদবিহীন সরকারী ঋণঃ** বর্তমান যুগে ধনীদের ব্যয় প্রবণতা হ্রাসের মাধ্যমে ধনবন্টনে বৈষম্য দূর করার প্রয়াস চলেছে। এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপের মধ্যে সরকারী ঋণ অন্যতম। যদিও সরকার বাজেট ঘাটতি পূরণ, উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই জাতীয় ঋণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই থাকে বিত্তশালীদের হাতে যে অব্যয়িত সম্পদ রয়েছে তার একটা অংশ বিনিয়োগমূলক কাজে লাগানো এবং একই সঙ্গে তাদের ব্যয় প্রবণতা হ্রাস করা। ফলশ্রুতিতে সমাজে ধনবৈষম্য কিছুটা হলেও হ্রাস পায়, নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ সরকারী উন্নয়নমূলক ব্যয় ও পূর্ত কর্মসূচীর সিংহভাগ অর্থই সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে যায়।

সুদী ব্যাংকগুলোর প্রদত্ত বিপুল ঋণের কারণে সমাজে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় সরকারী ঋণ। অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ, ব্যবহার ও মেয়াদের উপর অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও সামাজিক কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। বিভিন্ন বৃহৎ ও লাভজনক উন্নয়নমুখী প্রকল্পের জন্যে সরকার সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে *মুদারাবা সার্টিফিকেট* বা বন্ড চালু করলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। বিত্তশালীরা এতে অংশ গ্রহণ করে যেমন মেয়াদান্তে লাভের অংশ পেতে পারেন, তেমনি সরকারও সমাজের অব্যয়িত অর্থ শিল্প উন্নয়নসহ বিবিধ উৎপাদনমূলক কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পাশাপাশি বেকার ও অর্ধবেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন। নিরাপদ বিনিয়োগের জন্যে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট বা বন্ড সব সময়েই সকল মহলে সমাদৃত। তাই মুনাফার হার কম হলেও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্যে সমান আগ্রহী থাকবে। এই বন্ড বা সার্টিফিকেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর রেয়াতের সুবিধা প্রগতিশীল হারে বৃদ্ধি করলে সম্পদশালীরা এগুলো ক্রয়ে উৎসাহিত হবে। মুখ্যতঃ দারিদ্র্যও বেকারত্ব নিরসনের জন্যে যে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ জরুরী সেজন্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় বন্ড ব্যবহার করলে কাংখিত ফল লাভ আরও ত্বরান্বিত হবে।

৪. **বাধ্যতামূলক সাদাকাহ ও ঐচ্ছিক দানের ব্যবহারঃ** মুসলিম উম্মাহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকতর কল্যাণের জন্যে যাকাত আদায় ছাড়াও ইসলামে আরও কিছু দান-সাদাকাহ প্রদানের নিয়ম রয়েছে যেগুলো সাধ্যানুসারে সকল সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলমানই পালন করে থাকেন। সাধারণ ধর্মপ্রাণ নর-নারী বিশেষতঃ বিত্তশালী মুসলমানরা আশুরা (১০ মুহাররম), লাইলাতুল বারাআত (১৫ শাবান), লাইলাতুল কদর (২৭ রমাযান), রাসুলুল্লাহর (স.) জন্ম-মৃত্যু দিবস (১২ রবিউল আউয়াল) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং নিজেদের মুরুব্বী ও প্রিয়জনদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে নগদ অর্থ, খাদ্য ও কাপড়-চোপড় বিতরণ করে থাকে। এভাবে ব্যয়িত অর্থ তাদের সাময়িক ও খুবই অস্থায়ী উপকার করতে সমর্থ। কিন্তু তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন দূর করার জন্যে কোন কার্যকর ও স্থায়ী সমাধান দিতে সমর্থ নয়।

ঈদুল ফিতরের দিন যে মুসলমানের ঘরে যাকাতের নিসাব-পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকবে তাকে তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। ফিতরার এই অর্থ পুরোপুরি গরীবের হক। ফিতরার পরিমাণ সাধারণতঃ ১.৭০ কেজি গম বা তার বাজারমূল্য ধরা হয়। পরিবারের সদস্য সংখ্যা হিসাবে ঐ পরিমাণ গম বা তার মূল্য দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হয়। মুসলিম উম্মাহর এসব ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যবহ দিনে দানের অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ করে যদি তহবিল গঠন করা যেতো এবং তা থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে কার্যকর স্থায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যেতো তবে হতভাগ্য বনি আদমদের ধারাবাহিক ও স্থিতিশীল উপার্জনের ব্যবস্থা হতে পারতো। এই বিরাট দায়িত্বের সুষ্ঠু আনজাম দিতে পারে একমাত্র সরকারই।

৫. **করযে হাসানাঃ** হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময় হতে মুসলিম সমাজে করযে হাসানার বিধান চলে আসছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিত্তশালী ব্যক্তিরা সমাজের দরিদ্র ও অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে করযে হাসানা দিতেন। করযে হাসানা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেন-

"তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আল্লাহকে করযে হাসানা দিতে প্রস্তুত; তাহলে আল্লাহ তাকে কয়েক গুণ বেশী ফিরিয়ে দেবেন। হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহর হাতে নিহিত।" (সূরা আল বাকারাহ : ২৪৫ আয়াত)

করযে হাসানার এই বিধান সমাজে ইসলামী উপায়ে প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থ লেনদেনের এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। করযে হাসানা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। যথাঃ-

ক. বেসরকারী খাতে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ কার্যক্রমে সহায়তা;

খ. বিত্তশালীদের ব্যয় প্রবণতার সাময়িক হ্রাস; এবং

গ. সুদভিত্তিক ঋণের উচ্ছেদসহ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়ন।

এর ফলে সমাজে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে তেমনি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা স্থির রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব করযে হাসানার অর্থ পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী এবং একই সঙ্গে বিত্তশালীদের এক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে করযে হাসানা হিসেবে প্রদত্ত অর্থ আয়কর রেয়াতের সুবিধা পাবে সরকারের এমন উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে বিত্তহীন বর্গাচাষী ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উপকরণ সংগ্রহ এবং যোগ্য ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের (ফেরিওয়ালাসহ) উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধার্থে করযে হাসানা প্রদান কৃষিখাতসহ পল্লী কর্মসংস্থানে শুভ প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

৬. **সুদের উচ্ছেদঃ** ইসলামে সুদকে তার সব রকম অবয়বে চিরকালের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের জন্যে যা অকল্যাণকর তা আল্লাহ নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন এবং যা কল্যাণকর তা বৈধ বা হালাল করেছেন। ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে সুদের উচ্ছেদ এবং তার পরিবর্তে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা সম্পদের আরও যুক্তিপূর্ণ বন্টন নিশ্চিত করে। পরিণামে অধিকতর ইনসাফভিত্তিক আয় বন্টন ও কর্মসংস্থানেরই ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়।

কোন দেশের অর্থনীতি ও সমাজে সুদ যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করে তা বলে শেষ করা যায় না। পুঁজিবাদের দার্শনিকগণও সুদের উপযোগিতা সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুদের ভয়াবহ কুফল ও মারাত্মক আর্থ-সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে এই বইয়ের অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনার আলোকে নিঃশংকচিত্তে বলা যায় যে, শোষণ ও নিপীড়নের এই বিষবৃক্ষকে যদি সমূলে উৎপাটন করা যায় তাহলে সমাজের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীই শুধু প্রভূত কল্যাণ লাভ করবে তাই না, সমগ্র আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলেই এক সুস্থ ও কল্যাণময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই মুহূর্তে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম হতে সুদ উচ্ছেদ কিছুটা দুরূহ মনে হলেও একাজ অসম্ভব নয়। প্রয়োজন আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের। পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্যে পৃথক আইন কাঠামো তৈরী করলে ব্যাংকিং লেনদেন সহজ হবে এবং আমানত সংগ্রহ ও শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ তৎপরতা-বৃদ্ধি পাবে।

সমাজ হতে কার্যকরভাবে সুদ উচ্ছেদের জন্যে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থার আরও প্রসার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতিমালা গ্রহণ আবশ্যক। এদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সুদী ব্যাংকের অনুকূলে বিদ্যমান আইনের আওতায় দারুণ প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। এর প্রতিবিধানের জন্যে সরকারকে বাস্তবসম্মত ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ, একেবারে গ্রামাঞ্চলেও যেন ইসলামী ব্যাংকের সেবা পৌঁছায় সেজন্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সম্পদ সমাবেশ ও সঞ্চালনের জন্যে মুদারাবা মুশারাকা ইত্যাদি পদ্ধতি চালু করা ও সেজন্যে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্যে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বস্তুতঃপক্ষে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঈমানী চেতনা ও ইসলামী জীবন যাপনের সুপ্ত আকাংখার পরিপোষণ ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। দারিদ্র্য বিমোচন ও আপামর জনসাধারণের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান এই দায়িত্ববোধের প্রতিফলন।

গৃহীতব্য কর্মসূচী

বেকার ও দুঃস্থ শ্রেণীর লোকদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যে সংগৃহীত যাকাত দিয়ে গঠিত তহবিল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সরকার নীচের

কর্মকৌশল অনুসরণ করতে পারে। শুরুতে বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে প্রতিটি এলাকায় ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে টার্গেট গ্রুপ তৈরী করাই হবে উচিৎ কাজ। বিত্তহীন বর্গাচাষী ও প্রান্তিক কৃষকদের নিয়েও অনুরূপ গ্রুপ তৈরী করা যায়। প্রতিটি গ্রুপে ১৮-৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩০ জন পর্যন্ত লোক অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। শারীরিক যোগ্যতা, মানসিক প্রবণতা, শিক্ষার মান, সামাজিক পটভূমি ও উদ্যোগ, উদ্যম ও সততার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে একটি সাধারণ মিল বা সাদৃশ্য থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপ বা দল অপেক্ষা সমজাতীয় মানুষ সমন্বয়ে গঠিত দল সাফল্য অর্জনের জন্যে অধিকতর উপযোগী। এসব গ্রুপে একজন নেতা, একাধিক উপনেতা ও একজন সম্পাদক থাকবে। এদের প্রয়োজনীয় প্রেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই ধরনের দল নিয়মিত পাক্ষিক সভায় মিলিত হবে এবং তাদের কার্যক্রম যথারীতি মনিটর করা হবে। দলের প্রত্যেকে পরস্পরের জন্যে গ্যারান্টি দেবে।

এসব টার্গেট গ্রুপকে কোন রকম সার্ভিস চার্জ ছাড়াই উৎপাদনমুখী বা অ-ভোগ্য ঋণ সরবরাহ করা যেতে পারে। বিশেষ জরুরী ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ভোগধর্মী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। কৃষকেরা ফসল বা কৃষিপণ্য ওঠার পরপরই এই ঋণ শোধ করে দেবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদেরকে বর্ধিত সময় মনজুর করা যেতে পারে। এর পরেও যদি তারা নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে যাকাত হতে এই উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখা অর্থ হতেই তা মওকুফ করে দেওয়া হবে। এ ধরনের কৃষিভিত্তিক গ্রুপকে বিনামূল্যে অথবা যথেষ্ট ভর্তুকী দিয়ে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক সামগ্রী ও সেচ সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এমন কি তাদেরকে গুদামঘর হিমাগার পরিবহন ও বিপণনের সুবিধাও বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে দেওয়া উচিৎ। এর ফলে তারা ভিক্ষুক হওয়ার পরিবর্তে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে।

অ-কৃষি শ্রেণীর লোকদের জন্যেও টার্গেট গ্রুপ তৈরা করা জরুরী। এই ধরনের গ্রুপ বা দলকে তাদের যোগ্যতা, শিক্ষার মান ও মানসিক গঠন অনুযায়ী উপযুক্ত পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে এই ধরনের গ্রুপকে তাঁতের কাজ, দর্জির কাজ, ছুতার মিস্ত্রি, কামার, সাইকেল ও রিক্সা মেরামত, পাওয়ার পাম্প মেরামত, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী পালন, মৌমাছি ও মাছের চাষ প্রভৃতি কর্মসংস্থানমুখী ও উৎপাদনধর্মী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষিত বেকার যুবকদের নানা ধরনের পেশা বা বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে এই তহবিল হতেই। পরিণামে তারা গ্রামাঞ্চল ছাড়া শহরেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ক্রমবর্ধিষ্ণু শহর ও মহানগরীতে তো বটেই ইউনিয়ন ও থানা সদরেও ক্রমেই নানা পেশার লোকের চাহিদা বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে উলের কাজ ও এম্ব্রয়ডারী রাজমিস্ত্রি, ছুতার মিস্ত্রি

দর্জি ওয়েলডার কনফেকশনার বুক বাইন্ডার ইলেকট্রিশিয়ান লেদ অপারেটর রেডিও-টেলিভিশন মেকানিক, মোটর সাইকেল মেকানিক মোটর গাড়ী ও ট্রাক ড্রাইভার, ক্রমবর্ধমান ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের জন্যে দক্ষ ও কুশলী শ্রমিক এবং একেবারে সাম্প্রতিককালে প্যারামেডিক এবং ফটোকপিয়ার/ফটোষ্ট্যাট ও কম্পিউটার অপারেটর। বিশেষ করে শেষোক্ত যন্ত্রটির জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা বলা যায় অফুরন্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ ভিত্তিতে এই সমস্ত পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্যেও যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

বেকার যুবক-যুবতীদের জন্যে গৃহীতব্য এসব প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচীর, যা পরিণামে আয়বর্ধক ও কর্মসংস্থানমূলক, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের পুরোটাই যেমন বহন করতে হবে তেমনি প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ভার বহন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাকাত বা এই ধরনের অর্থ দিয়ে তৈরী তহবিল হতেই। প্রশিক্ষণ শেষে 'আয় থেকে দায় শোধ' নীতির ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণও সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে তারা যে বেকার ছিল সেই বেকারই রয়ে যাবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতা নিয়ে এই কর্মসূচী গ্রহণ করলে বিপুল সংখ্যক বেকার ও আধাবেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের যেমন উপায় হবে তেমনি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ পাওয়ার ফলে স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রায় সকল মুসলিম দেশে ঘুর্ণিঝড় বন্যা ভূমিকম্প খরা জলোচ্ছ্বাস নিয়মিতই দেখা দিচ্ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শত শত পরিবার, যারা গতকালও ছিল সম্পদশালী গৃহস্থ, রাতারাতি গৃহহীন কপর্দকহীন সহায়-সম্বলহীন পথের মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত এবং সময়োচিত মনোযোগ ও সহযোগিতার অভাবে এরা শামিল হয়ে যায় ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুরদের দলে। কেবলমাত্র কার্যকর ও পরিকল্পিত পুনর্বাসন কর্মসূচীই পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এই মানুষগুলোকে পুনরায় তাদের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে সাহায্য করতে। এজন্যে যাকাতের অর্থ অবশ্যই ব্যবহার করা যায়। ব্যবহার করা যায় অন্যান্য বাধ্যতামূলক দানের অর্থ ও উশরের ফসল। সরকারকে এদিকেও মনোযোগী হতে হবে।

একটি মুসলিম সরকার দরিদ্র ও অভাবীদের দারিদ্র্য মোচন ও কর্মসংস্থানের জন্যে করযে হাসানার অর্থও ব্যবহার করতে পারে। টার্গেট গ্রুপের লোকদের জন্যে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমাজের বিত্তশালীদের সরকারের করযে হাসানা তহবিলে অর্থ প্রদানে উৎসাহিত করা সম্ভব। ব্যক্তির মর্জি ও অভিরুচির উপর এই কাজ ছেড়ে না দিয়ে সরকারী পর্যায়েই তহবিল সংগৃহীত হতে পারে। অবশ্য এই তহবিলে কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করবে জনগণের আন্তরিকতা এবং সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার উপর।

বাধ্যতামূলক অন্যান্য দানের অর্থ (যথা সাদাকাতুল ফিতর, কাফফারা) দিয়েও সরকার কল্যাণ তহবিল গঠন করতে পারে। এই তহবিলের অর্থ থেকে দরিদ্র বৃদ্ধ অন্ধ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ সহায়-সম্বলহীন বিধবা ও ইয়াতীম গরীব পরিবারের শিশু প্রভৃতিদের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। এদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য, শীতকালে গরম কাপড় ও জ্বালানী সরবরাহ প্রভৃতি নিত্যদিনের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা কোন সমাজকল্যাণ কর্মসূচীই ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে না যদি শত সহস্র বনি আদম ক্ষুধাতুর ও অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় ভীড় জমায় এবং ইয়াতীম ও রুগ্নরা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিরাট এই কর্মোদ্যোগের জন্যে যে বিপুল জনবল দরকার তা কি সরকারের রয়েছে? এজন্যে যে বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তার সংস্থান হবে কিভাবে? উত্তরে বলা যায়, যাকাত ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক দানের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার দেশের দুই লক্ষাধিক মসজিদের ইমামসাহেবদের সাহায্য নিতে পারেন। বিশেষতঃ সরকারের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও বাংলাদেশ মসজিদ মিশন পরিচালিত ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইমামদের একাজে লাগানো যেতে পারে। এর ফলে অর্থ সংগ্রহ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের যেমন আলাদা দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান তৈরীর প্রয়োজন হবে না তেমনি বেতন-ভাতা বাবদ আলাদা অর্থ ব্যয়েরও প্রয়োজন হবে না। আমাদের দেশের ইমামদের একটা অংশ তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক অবহিত না হলেও ধর্মীয় নেতা হিসাবে তারা সমাজের শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত। সমাজে তাদের প্রভাবও যথেষ্ট। জনগণের সাথে তারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং জুম'আর খুতবার মাধ্যমে স্ব স্ব এলাকার বিত্তশালী লোকদেরকে তাদেরই মন্দভাগ্য প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক দানের অর্থ একটা নির্দিষ্ট তহবিলে জমা দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৯ সাল হতে ইমামদের জন্যে ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক ছয় সপ্তাহের আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সাফল্যের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ষাট হাজারের অধিক ইমাম এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই ইমামদের যদি যথাযথ দায়িত্ব দেওয়া যায় এবং সংগৃহীত অর্থের নির্দিষ্ট একটা অংশ (১০%-১২%) সম্মানী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দিয়ে বাকী অর্থ কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকটবর্তী শাখায় নির্দিষ্ট এ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার বিধান করা যায় তাহলে তারা যে শুধু আগ্রহান্বিত হবেন তাই না, দেশব্যাপী যাকাতের অর্থ সংগ্রহের মত সুকঠিন ও ব্যয়বহুল একটা কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যে এ পর্যন্ত যে সমস্ত নীতি-নির্ধারণমূলক কৌশলের কথা বলা হলো তার বাইরেও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা, সার্বজনীন স্বাক্ষরতা, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, স্বল্প ভাড়ায় আবাসন সুবিধা, স্বল্প ব্যয়ে শৌচাগার তৈরী প্রভৃতির ব্যবস্থা করে সরকার দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করতে পারে। উপরন্তু গরমৌসুমে পর্যাপ্ত পূর্ত কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে বেকার লোকদের কর্মসংস্থান করাও সরকারেরই দায়িত্ব। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলের ইসলামী সরকারসমূহ ব্যাপক পূর্ত কর্মসূচী গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রভূত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে যার ফলে তখন বেকার সমস্যার কথা শোনা যায়নি।

গ. নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে সমাজে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। একই সঙ্গে *আমর বিল মারুফ* ও *নেহী আনিল মুনকারের* বাস্তবায়ন জরুরী। তাই এ পর্যন্ত যে সমস্ত উপায় ও কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে সে সবের বাইরেও সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। অবশ্য এসব ব্যবস্থা শরীয়াহ নির্ধারিত সীমার মধ্যেই থাকতে হবে। সাম্প্রতিক ও অতীত কালের সকল ফিকাহবিদ এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সরকারকে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে; প্রয়োজনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও চূড়ান্ত প্রতিরোধমূলক পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সরকারকে এই দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই দিয়েছেন। রাসুলে করীমের (সা.) বহু হাদীসেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন ইবনে তাইমিয়া তাঁর *আল-হিসবাহ ফি আল-ইসলাম* গ্রন্থে, ইবনে হাযম আলোচনা করেছেন তাঁর *আল-মুহাল্লায়* এবং আবু ইউসুফ তাঁর *কিতাবুল খারাজ* বইয়ে। আল-শাতিবী, ইবনে খালদূন এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের পাশাপাশি নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

> "তাদের (সম্পদশালীদের) ধনসম্পদে হক রয়েছে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।"
> [সূরা আল-যারিয়াত: ১৯ আয়াত]

এই নির্ধারিত অংশ ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয় করতে হলে সরকারকে এমন সব কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় যা প্রকৃতিতে নিবর্তনমূলক। নীতি বা কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনেক সময়েই কঠোর সন্দেহ নেই, তবে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে তা মেনে নিতেই হয়। এক্ষেত্রে শরীয়াহ মুতাবিক যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো:

১. ব্যক্তিবিশেষের কাজের স্বাধীনতা খর্ব;
২. ব্যবসায়িক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ;
৩. ক্ষেত্র ও সময়বিশেষে মূল্য, মজুরী, খাজনা ও মুনাফার হার নির্ধারণ;
৪. সুবিচারপূর্ণ কর আরোপ ও কর ফাঁকি প্রতিরোধ;
৫. ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ;
৬. সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ
৭. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৮. সম্পদ বা শিল্পবিশেষের আংশিক বা পূর্ণ জাতীয়করণ;
৯. আর্থিক জরিমানা আরোপ; এবং
১০. সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ধন-বন্টনে বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি দরিদ্র ও অভাবী জনগণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্যেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। কারণ আদল ও ইহসানের বাস্তবায়ন ছাড়া সহায়-সম্বলহীন মানুষের দুর্দশা লাঘব হয় না বরং উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলে।

উপসংহার

একথা বলা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক হবে না যে, দু-একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ মুসলিম দেশের সরকারই প্রশাসনিক, আর্থিক ও সাংবিধানিক দিক থেকে ইসলামী শরীয়াহ হতে বহু দূরে। সেসব দেশের অধিকাংশই পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশসমূহের অন্ধ অনুকরণে সচেষ্ট। সউদী আরব ও কুয়েতের মতো ধনী দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় দরিদ্র মুসলিম দেশের সরকারসমূহের প্রশাসনিক, আর্থিক ও সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধানের অনুসারী আইন ও নীতি-পদ্ধতি প্রয়োগের কোন স্বাধীনতা নেই। উপরন্তু যদিই বা কখনও কোন মুসলিম সরকার ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে কোন আইন বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হয় তাহলে গোটা পাশ্চাত্যের মিডিয়া জগৎ, যার প্রায় পুরোটাই ইহুদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয়, শুরু করে জঘন্য অপপ্রচার। ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্যের কৃপাভিখারী ঐ সরকার প্রস্তাবিত পদক্ষেপটি হয় বাতিল করে নতুবা পরবর্তীতে করার আশ্বাস দিয়ে ফাইলবন্দী করে রাখে।

এখানেই শেষ নয়। অনেক সময়ে ঐসব দেশের অভ্যন্তর হতেও তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। কারণ প্রায় সব মুসলিম দেশেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার বিরোধী। এর প্রধান কারণ দুটো: (ক) প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অভাব, এবং (খ) সরকারের সকল ধরনের উচুঁপদে সমাসীন ব্যক্তিরা পুঁজিবাদ বা সমাজবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত। কিন্তু কৌশলগত কারণে অধিকাংশই সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দেয়। ইসলামের নাম শুনলেই এদের

এ্যালার্জি দেখা দেয় এবং কিভাবে তার প্রতিরোধ করা যায় তার উপায় খুঁজতে শুরু করে। সুতরাং, যদি কখনও কোন মুসলিম সরকার শরীয়াহ আইন প্রবর্তন বা ইসলামী বিধানের আলোকে বিদ্যমান আইন ও বিধির সংস্কার করতে উদ্যোগ নেয় তাহলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হবে এদের কাছে থেকেই। কারণ এসব বিধি-বিধান যেমন মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক জীবনকে ইসলামীকরণের দিকে এগিয়ে নেবে তেমনি কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে কুঠারাঘাত হানবে। ইতিহাস সাক্ষী, কায়েমী স্বার্থবাদীরা কখনই সামাজিক সাম্য ও সুবিচার, আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা চায়নি। কারণ তাহলে তাদের নির্দয় শোষণ ও নির্মম অবিচারের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এই সংকট হতে উত্তরণের জন্যে দুটি পথ খোলা রয়েছে। প্রথমতঃ দারিদ্র্য বিমোচনসহ সকলের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক কল্যাণধর্মী পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের প্রকাশ ঘটাতে হবে, এবং দ্বিতীয়তঃ মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ উদ্ধারে সক্ষম এমন সব প্রতিষ্ঠানের উপর অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্যে নির্ভর করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে সরকারকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কর্মসূচী শুরু করতে হবে যথোচিত দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে। তাহলেই দারিদ্র্য ও হতাশামুক্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা

বার কোটি তৌহিদী জনতার দেশ বাংলাদেশ। ভারত বিভাগের সময় হতেই এদেশের আপামর মুসলিম জনসাধারণের ইচ্ছা-আকাংখা ছিল দেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম হোক। এমন কি দেশের শাসকগোষ্ঠীও পর্যন্ত মাঝে-মধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন এদেশে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোন আইন পাশ হবে না। কিন্তু মুসলিম জনতার অন্তরের প্রকৃত আকাংখা বাস্তবায়নের জন্যে তাদের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা তো ছিলই না, বরং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলে এদেশে সেক্যুলার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সকল পদক্ষেপ গৃহীত হতে থাকে সরকারীভাবেই। স্বাধীনতার পরেও বৃটিশের রেখে যাওয়া শিক্ষানীতির তেমন কোন পরিবর্তন হলো না। না পাকিস্তান আমলে, না বাংলাদেশ আমলে। ফলে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করা কোটি কোটি বনি আদম বেড়ে উঠতে থাকলো দিকভ্রান্ত মানুষ হিসাবে। তার সামনে জীবনের কোন আদর্শবাদী লক্ষ্য রইলো না, বরং পাশ্চাত্যের Eat, drink and be merry-এর ভোগবাদী দর্শনের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়লো। তার জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য হয়ে গেল শংকর; ধর্মীয় জীবনে সে ইসলামের অনুসারী রইলেও কর্মজীবন হয়ে গেল পাশ্চাত্যের তথাকথিত সেক্যুলারধর্মী তথা আকণ্ঠ ভোগের দাসানুদাস। ফলে তার জীবনে আল্লাহ ও তার রাসূলের (স.) শিক্ষা রয়ে গেল ক্রমঅপসৃয়মান।

এরই বিপরীতে মুষ্টিমেয় মুসলমান ইসলামের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রইলো। তারা সকলেই যে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এমন নয়। বরং পাশ্চাত্যের ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বেশ কিছু মুসলমান ইসলামী জীবন আদর্শের অনুসারী তো রইলই, উপরন্তু তারা সমাজজীবনে পরিবর্তন আনার জন্যে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। মূলত: এই ধারার প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম সম্পর্কে জনগণের, বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে জানবার ও এর জীবন-আচরণ পালনের প্রতি লক্ষ্যণীয় আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। এদেরই প্রচেষ্টার ফলে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকেই নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে হলেও বলতে শুরু করেছে- *Islam is the complete code of life* -ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের প্রতি এদেশের জনগণের আগ্রহ আরও সক্রিয়ভাবে তীব্রতা অর্জন করে আফ্রো-এশিয়ায় মুসলমানদের নবজাগরণের ফলে। পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শনের প্রতি সেসব দেশের বহুলোকের বিতৃষ্ণা

ও বীতরাগ ইসলাম সম্বন্ধে নতুন করে জানার ও বোঝার জন্যে কৌতূহলী করে তোলে এদেশের শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে।

উপরন্তু একদা পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেল এবং স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মতো লোকেরা শ্রেণী সংগ্রামের চাইতে সভ্যতার দ্বন্দ্ব, Class Struggle -এর চাইতে Clash of Civilization -এর কথা স্বীকার করে নিয়ে ইসলামই পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের প্রতি আগামী দিনে অমোঘ চ্যালেঞ্জ হিসাবে স্বীকার করে নেন তখন মুসলিম যুবমানস এক অজানা আনন্দ ও সাফল্যের গর্বে আবেগতাড়িত হয়। কিন্তু নিজের দেশের দিকে, সমাজের দিকে তাকিয়ে সে যুগপৎ হতাশ ও বিচ্ছিন্ন বোধ করে। সে দেখে তার শিক্ষা, জীবিকা, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিরাট অংশেই ইসলাম নেই, বরং রয়েছে ইসলামের প্রতি প্রবল বিরোধিতা। তার তখন মনে হয় সে যেন আপন গৃহেই পরবাসী। এই দোদুল্যমান অবস্থা, চিত্তের এই শংকা কাটিয়ে উঠতে সে খোঁজে শিকড়ের সন্ধান। সে তখন জানতে চায় ইসলামকেই আমূলাগ্র। এভাবেই ধীরে ধীরে জনে জনে সৃষ্টি হয় বিশাল জনতার। তাদের চাপের কাছে, তাদের দাবীর মুখে দেশের সরকারকেও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মৌখিকভাবে হলেও নমনীয় হতে হয়। এরই পথ ধরে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার পথও কিছুটা খুলে যায়।

এক্ষেত্রে অবশ্য দেশের মাদরাসাগুলোর চাইতে বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির সাফল্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানে ইসলামের মৌলিক কর্মকৌশলের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা এই উদ্যোগকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করে। দীর্ঘ দুই দশকের চেষ্টার ফলে বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অর্থনীতি, যা ইসলামী জীবন বিধানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, পাঠদানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এতে উল্লসিত হবার কিছু নেই। বরং এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা ও প্রয়োগের পথে রয়েছে হিমালয়সম প্রতিবন্ধকতা। সেসব প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করা ও তা অপসারণের উপায় সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো এদেশের শিক্ষানীতি। এদেশের শিক্ষানীতিতে ইসলামী জীবনদর্শনকে ভালভাবে অনুধাবন করারই কোন সুযোগ নেই, ইসলামী অর্থনীতি তো দূরের কথা। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ড. কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে যেমন এদেশে সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের বিরোধিতা করা হয়েছে তেমনি বিরোধিতা করা হয়েছে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও। অবশ্য জনমতের প্রবল চাপে শেখ মুজিবুর রহমান যেমন শেষ পর্যন্ত কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে পারেননি, তেমনি শেখ হাসিনা

ওয়াজেদও শামসুল হক কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে পারেননি। যাদের নিয়ে এই দুটো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন সেক্যুলার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। ইসলাম বাস্তবায়নের জন্যে তাঁদের কোন কমিটমেন্ট ছিল না। তাই তাদের রিপোর্ট ছিল প্রবলভাবে ইসলামবিরোধী। পক্ষান্তরে এদেশের তৌহিদী জনতা প্রবলভাবেই ইসলামী শিক্ষা তথা জীবনদর্শনের প্রতি অনুরাগী। সেজন্যেই কোন সরকারের আমলেই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা তথা ইসলামী অর্থনীতি পঠন-পাঠনের সুযোগকেও অবারিত করা যায়নি। শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই বলেই এমনটি হতে পেরেছে।

এর প্রতিবিধানের জন্যে শিক্ষা কমিশন নতুন করে গঠন করে কিভাবে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তি ইসলামকে জানা ও বোঝা যায় তার পদক্ষেপ নিতে হবে। কমপক্ষে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এ বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তির পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এ জন্যে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারেঃ বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? এজন্যে অবশ্যই আগ্রহী গোষ্ঠীকে জনমত গঠনের জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেসব পদক্ষেপের মাধ্যমেই সরকারের উপর অব্যাহত চাপ দিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনার্স ও মাষ্টার্স পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে যেটুকু পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপূর্ণাংগ ও অসম্পূর্ণ। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্সের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও সামঞ্জস্যহীনতাও বিদ্যমান। উদাহরণতঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির যে কোর্স রয়েছে তার সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কোনভাবেই তুলনীয় নয়। একইভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান চতুর্থ বর্ষে ইসলামী অর্থনীতি ঐচ্ছিক পত্র হিসেবে থাকলেও ঐ পর্যায়ের কোর্স আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। অর্থনীতি চিন্তার বিকাশে মুসলিম অর্থনীতিবিদদের অবদান সম্পর্কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যতটুকু রয়েছে দেশের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তা নেই। তবুও বলতেই হবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেই ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণাংগ পাঠ নেই। এই অভাব পূরণ ও সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা ও সমন্বিত সিলেবাস তৈরী নিতান্তই জরুরী। উল্লেখ্য, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কোন শ্রেণী বা বর্ষেই ইসলামী অর্থনীতিবিষয়ক কোন পাঠই নেই।

তৃতীয়তঃ এদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়, যা অনেকের কাছেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত, ইসলামী অর্থনীতির পাঠদান শুরু হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু তারপরেও সেই পাঠ যথার্থ অর্থে ইসলামী অর্থনীতির পাঠ নয়, বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিবিষয়ক পাঠ। এটা খুবই দুঃখের বিষয় (খানিকটা আশ্চর্যের বিষয়ও বটে)

মাদরাসা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বহু পন্ডিতজনেরই ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে আদৌ কোন সুষ্ঠু ধারণা নেই। যে সিলেবাস অনুসারে মাদ্‌রাসার বই লেখা হয়েছে সে সিলেবাসেও ইসলামী অর্থনীতির প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অনুপস্থিত। এজন্যে ঐ পাঠ্যবইও সেই দাবী পূরণে ব্যর্থ। আরও দুঃখের বিষয়, ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি মৌলিক বিষয় মাদরাসায় পড়ানো হলেও সেসবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা হয় না বললেই চলে। উদাহরণতঃ সুদ, যাকাত ও ব্যবসায় পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আল-কুরআনে সুদ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই সুদের আর্থ-সামাজিক কুফলগুলো কি এবং কিভাবে মুসলমানরা সুদ ব্যতিরেকে তাদের আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে পারে তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে না ফাজিল বা কামিল পাস ছাত্রদের কাছ থেকে। একইভাবে যাকাত বিষয়ে দীর্ঘ উল্লেখ রয়েছে সহীহ আল-বুখারীতে। কিন্তু কিভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে সমাজ হতে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব মোচন সম্ভব সে সম্বন্ধেও কোন আলোচনা হয় না।

হেদায়া নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ইসলামী রীতি-পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের কৌশল সম্বন্ধে ফতওয়া ও মাসায়েল থাকলেও সেগুলো যে আজকের যুগে প্রয়োগযোগ্য সে ব্যাপারেও কোন দিক্ নির্দেশনা পাওয়া যায় না। অবশ্য দেশে বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। এদের বাদ দিলে দেশের প্রচলিত নিউস্কীম বা আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষিত হাজার হাজার ছাত্রদের সাথে ইসলামী অর্থনীতির ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে কোনই পার্থক্য নেই। এই সমস্যা দূর করার জন্যে যথোচিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে দুই ধারার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন সমন্বয় হবে না। ফলশ্রুতিতে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ বা ব্যবহার পিছিয়ে যাবে আরও বহুকালের জন্যে।

চতুর্থ যে সমস্যাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে সেটি হলো যথার্থ পাঠ্যপুস্তকের অভাব। এদেশে কলেজ পর্যায়ে সম্মান শ্রেণীতে ইসলামী অর্থনীতিতে যতটুকু পাঠদানের সুযোগ রয়েছে সেটুকুও ছাত্র/ছাত্রীরা গ্রহণ করতে পারছেনা শুধুমাত্র মানসম্মত টেক্সট বইয়ের অভাবে। সম্প্রতি দু-তিনটি বই লিখিত হয়েছে এই অভাব পূরণের জন্যে। কিন্তু সেগুলি হয় বাজারে সহজলভ্য নয়, নয়তো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসকে সামনে রেখে লেখা বলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাজে আসছে না। ইসলামী অর্থনীতির বই বলতে দেশে এখনও ইসলামের অর্থনৈতিক দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে আল-কুরআন ও সুন্নাহ হতে বাছাই করা আয়াত ও হাদিসের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার সংকলনকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রথম যিনি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন তিনি এদেশের ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণায় শুধু দিকপালই নন, বরং প্রবাদপুরুষ মাওলানা মুহম্মদ আব্দুর রহীম। তাঁর বই ***ইসলামের অর্থনীতি*** এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই বইয়ে তিনি আধুনিক অর্থনীতির ব্যবহার্য টেকনিক ও টার্ম প্রয়োগ করেই আল-কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে বর্তমান সময়ের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে তুলে ধরেছেন।

ইসলামী অর্থনীতি চর্চায় বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর এই বইটি মাইলফলক হিসেবে গণ্য হবে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো আধুনিক অর্থনীতি বইয়ের মাপকাঠিতে ধোপে টেকে না। ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ইংরেজিতে পূর্ণাংগ টেক্সট বই লিখেছেন প্রফেসর এম. এ. হামিদ পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহৃত টেকনিক অনুসরণ করে। বইটি বাংলায় অনুবাদও হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উপযোগী হলেও কলেজের উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রী পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী নয়। এই স্তরের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর কথা মনে রেখে যথার্থ মানসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক বই প্রকাশ খুবই জরুরী। এই উদ্যোগ না নিতে পারলে ইসলামী অর্থনীতির পঠন-পাঠন প্রসারে কাংখিত সাফল্য আসা অসম্ভব।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চম যে বাধাটি গুরুত্বসহ উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো আমাদের আরবী ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব। ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতার এটি অন্যতম কারণ। ইসলামী অর্থনীতির উপর আরবী ও ইংরেজী ভাষায় গত ত্রিশ বছরে শত শত বই রচিত হয়েছে। উর্দু ভাষাতেও রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই। আরবী ভাষাতে ইসলামী অর্থনীতির উপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে বহু গুরুত্বপূর্ণ বই রচিত হলেও সেসব বই আধুনিক রচনাশৈলী ও বিশ্লেষণাত্মক ধরনের নয়। কিন্তু আকর গ্রন্থ হিসেবে সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী অর্থনীতির উপর হাল আমলে রচিত বইসমূহের মধ্য থেকে বাছাই করা আড়াইশ বইয়ের উল্লেখ রয়েছে বর্তমান বইয়ের *ইসলামী অর্থনীতির পাঠসহায়ক বইপত্র* অধ্যায়ে। এসব বই হতে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয়বিধ প্রসঙ্গেই সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এ দেশের ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যেমন সচরাচর আরবীতে পারঙ্গম নন, তেমনি আরবী ভাষায় শিক্ষিত লোকদের অনেকে ইংরেজীতে বেশ কাঁচা। এজন্যে এই দুই ভাষাতে যেসব বই ও গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলো ব্যবহার করে বাংলায় মানসম্পন্ন বই রচিত হচ্ছে না। অথচ উঁচু মানের বই রচনার জন্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরী। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যাপকদের মধ্যে যারা বই লিখতে পারেন তাদেরকে ইংরেজী বইয়ের পাশাপাশি আরবী বইগুলোও ব্যবহার করতে হবে। তাহলে ঐসব বইয়ের মান যেমন উন্নত হবে তেমনি যুগ জিজ্ঞাসার জবাবেরও সন্নিবেশ ঘটবে। আরবী ভাষায় বইগুলিতে আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে সেগুলি এদেশের মুসলমানদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু শরীয়াহর বিধি-বিধান মান্য করেই প্রয়োগ ও ব্যবহার হবে সেহেতু এই সম্মিলন অপরিহার্য। অথচ আমাদের দেশে এই উদ্যোগের বড়ই অভাব।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা হলো উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। উদাহরণতঃ বারো কোটি

মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলামের অন্যতম বিধান যাকাতের প্রায়োগিক চর্চা খুবই অবহেলিত। বহু লোক রয়েছে যারা সাহেবে নিসাব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করে না। এজন্যে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব ও সরকারী অবিমৃষ্যকারিতাই দায়ী। উশর তো এদেশে আদায় হয়ই না বলা চলে। অঞ্চল বিশেষে কেউ কেউ উশর আদায় করলেও সারা দেশে এর কোন প্রভাব পড়ে না। তাই যাকাত ও উশর সূত্রে যে বিপুল অর্থ আদায় হতে পারতো তার উপকার হতে সমগ্র দারিদ্র জনগোষ্ঠিই, যারা বাংলাদেশের জনগণের ৮০%, বঞ্চিত। এ ব্যাপারে সরকার যেমন নির্লিপ্ত, তেমনি শিক্ষিতরাও উদাসীন। এদেশে ইসলামী অর্থনীতির সঠিক প্রায়োগিক চর্চা হলে এর প্রতিবিধান হতো এবং বিপুল সাফল্য বয়ে আনতো।

ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সপ্তম প্রতিবন্ধকতা হলো উপযুক্ত ব্যক্তি, মানসিকতা ও প্রতিষ্ঠানের তীব্র সংকট। ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে হালাল-হারামের বাছ-বিচার তেমনি রয়েছে বৈধ পন্থায় উপার্জন ও ব্যয়ের প্রসঙ্গ। উপরন্তু কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের জন্যে যেসব ইসলামী কর্মপদ্ধতি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সেসবের মধ্যে মুদারাবা, মুশারাকা ও করযে হাসানা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে শুধু অভাবী লোকের সাময়িক প্রয়োজন পূরণ হয় না, উদ্যোগী ও কর্মী লোকদের কর্মসংস্থানের উপায় হয় হালাল পদ্ধতিতেই। ইসলামের সোনালী যুগে তো বটেই, আইয়ামে জাহেলিয়ায়ও মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি চালু ছিল। বর্তমানে সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব এবং ব্যক্তি চরিত্রের নিদারুণ অবনতির কারণে না করযে হাসানা প্রদান করা যায়, না মুদারাবা ও মুশারাকার উদ্যোগ নেওয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া খুবই জরুরী। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করার জন্যে চাই ইসলামী জীবনাচরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও তা পালনের জন্যে আন্তরিক আকাংখা। নইলে শুধুমাত্র মৌখিক সহানুভূতির দ্বারা ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে প্রতিবন্ধকতা উল্লেখযোগ্য সেটি হলো এদেশের লোকের আবেগপ্রবণতা এবং বাহ্যিক আচরণেই সন্তুষ্টি। এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি খুবই তীব্র। কিন্তু প্রকৃত দ্বীনি শিক্ষার অভাবে এই অনুভূতি বহুলাংশে আবেগবহুল এবং ইসলামের বহিরঙ্গ নিয়েই তৃপ্ত। জীবন ও সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রঙীন করার লক্ষ্য তার কাছে গৌণ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই চেতনার অভাবে ইসলামের প্রতি তাদের আবেগতাড়িত অনুভূতিকে সুসংহতভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ ইসলামী অর্থনীতি চর্চার জন্যে সেটাই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠিকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা গ্রহণ ও ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংহত করে সুগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার বড়ই অভাব। এই প্রয়োজন পূরণই বর্তমান সময়ে এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিরাট চালেঞ্জ। এর যথোচিত মুকাবিলা করতে পারলে কাংখিত মনযিলে মকসুদে পৌছানো সম্ভব।

ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার ক্রমবিকাশ

ইসলামী জ্ঞানের বিকাশ ও সমকালীন যুগ জিজ্ঞাসার উত্তরের সর্বশেষ উৎস *ইজতিহাদ* । অর্থনীতিও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান শতাব্দীতে ইসলামী অর্থনীতি যে রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত তা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ইজতিহাদেরই ফসল। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) আমল হতেই ইজতিহাদের শুরু। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বিজিত এলাকার জমি বন্টনের রীতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিই তাঁকে এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করেছিলো। উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মুসলিম দার্শনিক, ফকীহ ও মুজাদ্দিদগণের চেষ্টা ছিলো নতুন নতুন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রদান। ক্ষেত্রবিশেষে সমস্যার যথার্থ বিশ্লেষণও ছিলো প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ। এই পথ ধরেই বিংশ শতাব্দীতে সুদ উচ্ছেদের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় মুসলিম ফকীহ ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বিত প্রয়াসে ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা পদ্ধতি। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সময়ের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাড়া। স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তাধারা আল-কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা অনুপ্রাণিত। 'অর্থনৈতিক চিন্তাধারা' বলতে যা বোঝায় তা হলো দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য, উৎপাদন ও বন্টন, বিনিময় ও ভোগ, দাম ও অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারা। এর আওতায় আসে অর্থনৈতিক বিষয়াদির বিবরণ, অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের ব্যাখ্যা ও সুপারিশ এবং কোন সুনির্দিষ্ট নীতির সম্ভাব্য ফলাফল নিরূপণ ও বিশ্লেষণ।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যখন যে সমস্যা দেখা দিতো ফকীহরা সে ব্যাপারে আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে সে সবের ভাল-মন্দ দিকগুলো তুলে ধরতেন এবং তাঁদের মতামত দিতেন । মানুষ যাতে শুধুমাত্র জাগতিক ব্যাপারেই নিজেদের ব্যাপৃত না রাখে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন সুফীগণ। মুসলিম দার্শনিক-অর্থনীতিবিদগণ তাঁদের মতামত মূলতঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ, বিদ্যমান সমস্যার সমাধান এবং ভবিষ্যতের জন্যে গৃহীতব্য কর্মসূচী প্রসঙ্গে তাঁদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মহান খুলাফায়ে রাশিদূনের সময় হতে মোঘল শাসন আমলের শেষ পর্যন্ত অসংখ্য ফকীহ ও দার্শনিকের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় অবদান রেখেছেন। নিচে এদের মধ্যে কালক্রম অনুসারে পনেরো জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অবদানের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

কালক্রম অনুসারে প্রথমেই আসে **আবু ইউসুফ**-এর কথা। তাঁর পুরো নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন হাবীব ইবন হুবাইশ ইবন সা'দ ইবন বুজায়ের ইবন মুয়াবিয়া আল-আনসারী আল-কুফী (১১৩-১৮২ হি./৭৩১-৭৯৮ খ্রী.)। জন্ম কুফায়। তিনি ইমাম হিসাবেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর *কিতাব-আল-খারাজ* ইসলামী অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এ বিষয়ে পরে অন্যান্য ফকীহরাও লিখেছেন। তবে তাঁর মত যুক্তিপূর্ণ ও দৃঢ় বক্তব্য আর কারো লেখায় পাওয়া যায় না। আবু ইউসুফ যেসব বিষয়ে তৎকালীন শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার মধ্যে রয়েছে: জনগণের প্রয়োজন পূরণের উপর তাগিদ এবং করের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষার উপর জোর। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় প্রায় বারো শত বছর পূর্বে তাঁর লেখায় আধুনিককালের Cannons of Taxation-এর মতই তিনি করের তিনটি কানুনের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো : (১) কর প্রদানের সামর্থ্য, (২) কর প্রদানের উপযোগী পদ্ধতি এবং (৩) কর প্রদানকারীদের কর প্রদানের জন্যে সুবিধাজনক সময় নির্ধারণ। তিনি কর প্রশাসন বিষয়ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই যৌক্তিক বিবেচনা করেছেন।

তিনি কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি ভূমির উপর কর আরোপের সুপারিশ করেন। বিস্ময়ের বিষয়, প্রগতিশীল করের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়েও তিনি সুচিন্তিত ও দৃঢ় বক্তব্য রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার দ্বারা দেখিয়েছেন ভূমির উপর আনুপাতিক বা স্থির হারে খাজনা নির্ধারণ অপেক্ষা প্রগতিশীল হারে কর আরোপের ফলে আদায়কৃত করের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সামাজিক সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রগতিশীল কর আরোপের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিপূর্ণ আলোচনার জন্যে নিঃসন্দেহে তিনি পথিকৃত চিন্তাবিদ হিসেবে গণ্য হবেন। তিনি পূর্ত কর্মসূচী, বিশেষতঃ সেচ ব্যবস্থা ও সড়ক নির্মাণ রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক দায়িত্ব বলে সাব্যস্ত করেন। এ সবের ব্যয় কিভাবে মেটানো যায় সে ব্যাপারেও সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করেছেন। আবু ইউসুফের মৌলিক অবদান সরকারী অর্থায়ন প্রসঙ্গে, কিন্তু দাম নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, বিভিন্ন রকম কর দামের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাও আলোচনা করেন। কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে তিনি শাসকের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন।

আল-শায়বানীর পুরো নাম ইমাম মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান আল-শায়বানী (১৩২-১৮৯ হি./৭৫০-৮০৪ খ্রী.)। *কিতাব আল-ইকতিসাব ফিল রিযক আল-মুসতাতব* বইয়ের জন্যেই তাঁর খ্যাতি। এই বইয়ে কিভাবে সৎ উপায়ে উপার্জন করা যায় তার বিবরণ পাওয়া যায়। সৎ উপার্জনের জন্যে তিনি যেসব পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন সে সবের মধ্যে *ইজারাহ্* (ভাড়া), *তিজারাহ* (ব্যবসা), *যিরাআহ্* (কৃষি) এবং *সিনাআহ* (শিল্প) উল্লেখযোগ্য। একজন ভাল মুসলমান তার আয় ব্যয় করার ক্ষেত্রে পরহিতপরায়ণ হবে এবং সে যাতে ভিক্ষা না করে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল-শায়বানী কৃষিকাজকে সকল পেশার মধ্যে মহত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সমগ্র সমাজের জন্যে এটি সবচেয়ে অপরিহার্য ও উপকারী। তাঁর এই মত সমকালীন অন্যান্য ইমাম ও ফকীহদের থেকে তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কারণ অন্যান্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যকেই কৃষিকাজের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবু ইউসুফের যোগ্য শিষ্য ও উত্তরসূরী।

যেসব সূফী শরীয়াহর বিধান ত্যাগ করে অন্যের খাদ্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না তিনি তাদের সমালোচনা করেন। আল-শায়বানী সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে যতটুকু আয় করা প্রয়োজন অন্ততঃ ততটুকু আয় করার জন্যে সবাইকে পরামর্শ দেন। তাঁর *কিতাব-আল-আসল* এবং অন্যান্য রচনার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *সালাম* (অগ্রিম ক্রয়), *শিরকাত* (অংশীদারিত্ব) ও *মুদারাবাহ* (মুনাফার অংশীদারিত্ব) ইত্যাদি।

আবু উবায়দ-এর পুরো নাম আবু উবায়দ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম (১৫৪-২২৪ হি./ ৭৬৬-৮৩৮ খ্রী.)। ইমাম হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। তাঁর *কিতাব-আল-আমওয়াল* সরকারী অর্থব্যবস্থার একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই বইয়ে প্রজাদের উপর শাসকদের অধিকার এবং শাসকদের উপর প্রজাদের অধিকার ছাড়াও যাকাত ও উশর, খুমস্ এবং ফাই (খারাজ ও জিজিয়াসহ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইসলামের প্রথম দু'শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস হিসাবেও বইটির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ইয়াহিয়া বিন আদম-এর পুরো নাম আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবন আদম ইবন সুলাইমান আল-কুরাইশী আল-উমায়ী আল কুফী (১৩৪-২০২ হি./৭৫২-৮১৮ খ্রী.)। তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে *কিতাব আল-খারাজ* ইসলামী ভূমি রাজস্বের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত। এর প্রধান কারণ এটি তাঁর উস্তাদ আবু ইউসুফের *কিতাব আল-খারাজ*-এ উপস্থাপিত বক্তব্যের জবাব বা বিতর্কমূলক উত্তর। ভূমি কর সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকদের বক্তব্য খণ্ডন করে হাদীসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাযুরী তাঁর রচনায় এই বইটি বহুল ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র খারাজের প্রসঙ্গে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে ইয়াহিয়া বিন আদম অন্যান্য ভূমি কর ও উশর বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। স্থাবর সম্পত্তির উপরও উশর আদায় করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন।

আল-মুহাসিবির পুরো নাম আবু আবদ আল্লাহ হারিস ইবন আসাদ আল-আনাযী আল-মুহাসিবি (১৬৫-২৪৩ হি./৭৮১-৮৫৭ খ্রী.)। তাঁর জন্ম বসরায়। মূলতঃ সূফী হলেও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর মতে সম্পদ কারোরই অণ্বেষার বিষয় হওয়া উচিত নয়। বরং অল্পে তৃপ্ত হওয়াতেই কল্যাণ নিহিত। উপরন্তু যা শরীয়াহতে নিষিদ্ধ তা থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি *যুহদ* বা মিতাচারের

প্রবক্তা ছিলেন। ভোগের জন্যে লালায়িত হলে হালালের সীমা লংঘনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। তাই ব্যক্তির সাথে তার সম্পদের সম্পর্ক হবে খুবই নিয়ন্ত্রিত ও সতর্কতামূলক। ভোগ-লালসাকে তিনি মহাপাপ বলে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা ও করযে হাসানা না দেওয়া বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহকে তার প্রাপ্য প্রদানে অস্বীকারতুল্য। এসব প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা রয়েছে তাঁর *রিসালাহ আল-মাকাসিব ওয়াল ওয়ারা ওয়াল শুবুহাহ* বইয়ে।

কুদামা বিন জাফর-এর পুরো নাম কুদামা ইবন জাফর আবুল ফারাজ আল-কাতিব আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৩৩৭ হি./৯৪৮ খ্রী.)। এক খৃষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম। খলীফা আল-মুকতাফীর রাজত্বকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কালের ধ্বংস হতে তাঁর যে তিনটি বই রক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুই খণ্ডে সমাপ্ত *কিতাব আল-খারাজ*। এই বইয়ে তিনি তৎকালীন খলীফার শাসনাধীন এলাকার প্রদেশসমূহের বিবরণের পাশাপাশি সরকারী ডাক ব্যবস্থা ও আদায়কৃত করের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর আলোচনা থেকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ফাইন্যান্সিয়াল পদ্ধতি, করের শ্রেণী, কর হতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়। প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে কর আদায়ের সম্পর্ক বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে **আল-মাওয়ার্দীর** জন্ম। তাঁর পুরো নাম আবুল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-বসরী আল-বাগদাদী (৩৬৪-৪৫০ হি./৯৭৪-১০৫৮ খ্রী.) । তিনি ইরাকের বসরা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জীবনের দীর্ঘ সময় বাগদাদে অতিবাহিত করেন। তিনি বাগদাদের প্রধান কাযীর পদও অলংকৃত করেন। তাঁর *আল-আহকাম-আল-সুলতানিয়া* সরকার ও প্রশাসন সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে একজন শাসকের কর্তব্য, সরকারী আয় ও ব্যয়, সরকারী জমি, খাস জমি ইত্যাদি সর্ম্পকে আলোচনা রয়েছে। একজন আদর্শ শাসক বাজার তদারকী করবে, সঠিক ওজন ও মাপ নিশ্চিত করবে, প্রতারণা রোধ করবে এবং ব্যবসায়ী ও কারিগরেরা যাতে তাদের লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়াহর নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে সে দিকে নজর দেবে। তাঁর *কিতাব আদাব আল-দ্বীন ওয়াল দুনইয়া* বইয়ে একজন মুসলমানের অর্থনৈতিক আচরণ কেমন হবে সে বিষয়ে শরীয়াহর আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন সৎ উপার্জনের জন্যে চারটি পথ খোলা রয়েছে- কৃষি কাজ, পশু পালন, ব্যবসা এবং শিল্প।

ইবন হাযমের পুরো নাম আবু মুহাম্মদ আলী ইবন আবু উমার আহমদ ইবন সাঈদ ইবন হাযম আল-কুরতুবী আল-আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি./৯৯৪-১০৬৪ খ্রী.)। স্পেনের কর্ডোভার এক ধনী ও বিখ্যাত পরিবারে তাঁর জন্ম। ইমাম হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিলো। তাঁর রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে *আল-মুহাল্লা শারহ আলা মিনহাজ আল-তালিবীন*। তাঁর লেখায় মানুষের মৌলিক চাহিদা ও দারিদ্র্য,

ভূমিসত্ত্ব ব্যবস্থা, কর ও যাকাতের প্রসঙ্গই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। মানুষের বিশেষতঃ সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব স্ব স্ব এলাকার ধনীদের। তারা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে বা এড়িয়ে যেতে চাইলে তাদের সম্পদ হতে অংশবিশেষ এই কাজে প্রদানে বাধ্য করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ভূমিসত্ত্ব প্রসঙ্গে ইবনে হাযম *মুযারাআহ*-কে ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ বলেছেন। তাঁর মতে বর্গাচাষীদের বেলায় মালিকদের নির্দিষ্ট হিস্যা-ফসলের অংশ, অর্থ বা অন্য যে কোন কিছু- পূর্বেই নির্ধারিত করে নেওয়া ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ। কর প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে উদ্বেগ ছিলো কর আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে। তিনি পীড়নমূলক ও শোষণধর্মী করের বিরুদ্ধে ছিলেন। কর সংগ্রহের পদ্ধতি বিষয়েও তাঁর উদ্বিগ্নতা লক্ষ্যণীয়। কর আদায়ের অন্যায় ও জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি প্রসঙ্গে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে শরীয়াহর বিধান লংঘন করে কর আদায় করা যাবে না। যাকাত আদায়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে বলেছেন। উপরন্তু কেউ যাকাত আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ হতে যাকাত আদায় করে নেওয়ার পক্ষে তিনি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে মানুষের প্রাপ্য যদি মৃত্যুর পরেও পরিশোধযোগ্য হয় তাহলে আল্লাহর প্রাপ্য কেন পরিশোধযোগ্য হবে না?

আল-গাযালীর পুরো নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-তুসী আল-শাফিঈ আল-গাযালী (৪৫১-৫০৫ হি./১০৫৫-১১১১ খ্রী.)। খোরাসানে তাঁর জন্ম। ইমাম হিসেবেই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি। *ইহইয়া উলূম আল-দীন* তাঁর অবিস্মরণীয় ও কালজয়ী গ্রন্থ। মানুষ যে সময়ে জাগতিক সুবিধাদির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল সে সময়েই আল-গাযালীর আবির্ভাব। যে সময় ইসলামে নানা শিরক ও বিদয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, নানা সংশয় ঘিরে ধরেছিল মুসলমানদেরকে সে সময়ে তাঁর আবির্ভাব।

তাঁর লেখায় সুফী মতবাদের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি সৎ নিয়্যাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যজনিত কাজকর্মের উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন একজন ব্যবসায়ী এমনভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে যাতে তার সামাজিক বাধ্যতামূলক কর্তব্যও (*ফরয-ই-কিফাইয়া*) পালিত হয়। একজন ব্যক্তির সাধারণভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যতটুকু আয় করা দরকার তার বেশী বা কম আয় করার চেষ্টা করা উচিত নয়। মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে থাকবে আসবাবপত্র, বিবাহ ও সন্তানাদি পালন এবং কিছু সম্পত্তি। তিনি কখনও খুব উচুঁ মানের জীবন যাপনের পক্ষে ছিলেন না। রাসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীরা যেরূপ জীবন যাপন করতেন সেটিই ছিলো তাঁর পছন্দ। যারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করে এবং তা মজুত করে রাখে এবং তার গরীব ভাইদের সহায়তা করে না তাদেরকে তিনি অত্যাচারী হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

প্রজাদের সাহায্য করা, তাদের প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া, দুর্নীতি বন্ধ করা এবং শরীয়াহবিরোধী কর আরোপ না করার জন্যে তৎকালীন শাসকদের তিনি পরামর্শ

দিয়েছেন। জনগণ যখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে নিপতিত হয় তাদের সে সময় খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়াও সরকারী কোষাগার হতে আর্থিক সাহায্য দেবারও পরামর্শ দেন। শ্রম বিভাগ ও মুদ্রার ক্রমবিকাশের উপরও গাযালীর অবদান রয়েছে। *রিবা আল-ফদল* নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে তিনি বলেন এটা মুদ্রার প্রকৃতি ও কার্যাদিকে লঙ্ঘন করে। মুদ্রা গচ্ছিত করে রাখা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে তিনি যুক্তি দেখান যে মুদ্রা আবিষ্কৃতই হয়েছে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করার জন্যে, কিন্তু গচ্ছিত মুদ্রা সেই প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে।

ইবনে তাইমিয়ার পুরো নাম তাকিয়্যুদ-দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শিহাবিদদীন আবদিল হালীম ইবন মাজদিদ-দীন আবদিস সালাম ইবন আবদিল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবনিল খাদর ইবন মুহাম্মদ ইবনিল খাদর ইবন আলী ইবন আবদিল্লাহ ইবন তায়মিয়া আল-হাররানী আল-হাম্বলী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রী.)। মুজাদ্দিদ ও ইমাম হিসাবে তাঁর খ্যাতি দুনিয়াজোড়া। তিনি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিবারে মানুষ হন। তাঁর মৌলিক অবদান ফিকহ্ শাস্ত্র ও সমাজকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে। সমাজই ছিল তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই *আল-হিসবাহ ফী আল-ইসলাম*। এ বইয়ের আলোচনায় যেসব বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সামাজিক বিষয়াদি যেমন চুক্তি ও তার বাস্তবায়ন, দাম ও কোন্ কোন্ অবস্থায় তা ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন হিসাবে গণ্য করা যায়, বাজার তদারকীতে মুহতাসিবের দায়িত্ব, সরকারী অর্থব্যবস্থা ও জনগণের প্রয়োজন পূরণে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি।

তিনি দুর্নীতিবাজ সরকার ও শুধুমাত্র জাগতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ জন্যেই সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার উপর জোর দিয়েছেন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সীমানা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ শরীয়াহর নিয়মের মধ্যে চলবে ততক্ষণ সমাজে অনৈতিক কর্মকান্ড হতে পারে না। ইবনে তাইমিয়া এমন সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে চলবে এবং ব্যক্তিগত সম্পদ নৈতিক বিবেচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্ত চুক্তি ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সম্পাদন করার পরামর্শ দেন। এটা তখনই সম্ভব যখন চুক্তিতে আবদ্ধ অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় সব শর্ত মেনে নেয়। এক্ষেত্রে কোন রকম জোর-যুলুম বা অত্যাচার থাকবে না। ইবনে তাইমিয়াই প্রথম ইসলামী অর্থনীতিবিদ যিনি ন্যায্য দামের উপর বিস্তারিত অবদান রাখেন। ইসলামী অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাঁর আরও একটি অবদান হলো বিভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্বের উপর জোর।

ইবনে তাইমিয়া যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন সে সবের মধ্যে রয়েছেঃ

১. নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য,
২. রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ও তার সীমারেখা,

৩. বাজার তদারকি তথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য মুনাফা,
৪. সম্পদের মালিকানার ধরন এবং
৫. প্রতিষ্ঠান হিসাবে *আল-হিসবাহ*-এর প্রতিষ্ঠা।

প্রসঙ্গতঃ বলা ভালো এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তিরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হতে পারে, সমাজবিরোধী কাজের মাধ্যমে জনগণ ও দেশের অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে। এর প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যেই ইসলামী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় *আল-হিসবাহর* প্রতিষ্ঠা। আরবী শব্দ *হিসবা*-র ধাতুগত অর্থ গণনা। এ থেকে উৎপন্ন শব্দ *ইহতাসাবার* অর্থ কোন বিষয় বিবেচনায় আনা। ব্যবহারগত দিক থেকে হিসবাহর অর্থ এমন এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যার দায়িত্ব সৎ কাজে মানুষকে সহায়তা করা বা নির্দেশ দেওয়া (*আমর বিল মারুফ*) এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়া বা নিরস্ত করা (*নেহী আনিল মুনকার*)। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রের দায়িত্বই হচ্ছে এমন ব্যবস্থার আয়োজন করা যার দ্বারা অপরিহার্যভাবেই সুনীতির (মারুফ) প্রতিষ্ঠা হবে এবং দুর্নীতির (মুনকার) উচ্ছেদ হবে।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসূলে করীম (স.) প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় এই দায়িত্ব পালনের ভার নিজের কাঁধেই তুলে নেন। বহু প্রসিদ্ধ হাদীছ হতে দেখা যায়, তিনি নিজেই বাজার পরিদর্শন করেছেন, ব্যবসায়ীদের ওজনে কারচুপি ও দ্রব্যসামগ্রীতে ভেজাল দিতে নিষেধ করেছেন, মজুতদারীর (*ইহতিকার*) বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যখনই কাউকে জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত দেখেছেন তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করেছেন। পানির নহরের ব্যবস্থাপনা, খেজুর বাগানের তত্ত্বাবধান, ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বিষয়েও তিনি প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করেছেন। এ জন্যেই ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে প্রথম *মুহতাসিব* (*আল-হিসবার* দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত ব্যক্তি) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলে তিনি মদীনায় হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এবং মক্কায় হযরত সাঈদ বিন আল-আসবিন আল-আসকে (রা.) মুহতাসিব নিয়োগ করেন।

খুলাফায়ে রাশিদূনের আমলে মুহতাসিবের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু যে সময়ে ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব সে সময়ে আল-হিসবাহর কার্যক্রমে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়, মুসলিম শাসকবর্গও এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগী ছিলেন না। সে জন্যেই তিনি তাঁর বইয়ে এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে আল-হিসবাহকে স্বমর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত করার উপর জোর দেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ইসলামী শাসন ক্ষমতা পতনের পূর্ব পর্যন্ত

বিস্তীর্ণ মুসলিম এলাকায় নানা নামে মুহতাসিবের পদটি চালু ছিল। বাগদাদের উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহের দায়িত্বশীলের পদবী ছিল *মুহতাসিব*, উত্তর আফ্রিকায় এটি ছিল *সাহিব আল-সুউক*, তুরস্কে ছিল *মুহতাসিব আগাজী* এবং ভারতবর্ষে কোতোয়াল।

আল-হিসবাহর আওতায় মুহতাসিবের দায়িত্ব কি কি সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ইবনে তাইমিয়া। তাঁর মতে মুহতাসিবের কাজের মূলনীতি হবে আমর বিন মারুফ এবং নেহী আনিল মুনকারের যথাযথ প্রয়োগ। তার কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে :

১. দ্বীনি আহকাম বাস্তবায়ন
২. জুয়া ও সুদের কারবার উচ্ছেদ
৩. দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ
৪. মূল্য নিয়ন্ত্রণ
৫. ঋণ প্রদান ও ঋণ গ্রহণ
৬. সম্পদের মালিকানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ
৭. জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার
৮. সরকারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান
৯. পৌর সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান
১০. আদল ও ইহসানের প্রতিষ্ঠা।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত এবং ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কার্যকলাপ রোধ প্রসঙ্গে মুহতাসিবের দশটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে *আল-হিসবাহ ফী আল-ইসলাম* গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নীচে এগুলো উল্লেখ করা হলো। এ থেকেই বোঝা যাবে বাজার সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল কত বিস্তৃত ও গভীর। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়গুলো বর্তমানেও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচ্য। এ সবের মধ্যে রয়েছে :

১. ইসলামী শরীয়াহতে যা সুস্পষ্টভাবে হারাম তেমন কোন কিছুর উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের জন্যে রাষ্ট্র বা ব্যক্তির সহায়-সম্পদ কোনক্রমেই যেন ব্যবহৃত হতে না পারে তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা;

২. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা;

৩. সকল প্রকার বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পন্ন হবে প্রকাশ্যে। কারণ গোপন লেনদেন শুধু সরবরাহের পরিমাণ ও সময়ই বিঘ্নিত করে না, স্বাভাবিক মূল্যস্তর প্রতিষ্ঠায়ও বাধা দেয়;

৪. ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে যেন আপোষে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস না করতে পারে; কারণ এতে ক্রেতা সাধারণ বা নতুন বিক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

৫. নতুন ব্যবসায়ীকে বাজারে প্রবেশ করতে তথা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংঘ বা গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হতে না দেওয়া;

৬. শহুরে ব্যবসায়ীরা পথিমধ্যেই পল্লীর সরবরাহকারীর সাথে যেন মিলিত হতে না পারে, কারণ এর ফলে তারা ঐ সব সরবরাহকারীকে শহরে বিদ্যমান মূল্যস্তর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে নেবে এবং শহরবাসীর কাছে তা চড়া মূল্যে বিক্রী করে প্রভূত মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবে;

৭. পল্লী অঞ্চলের সরবরাহকারীদের বাজারের সন্নিকটেই পণ্যসামগ্রী মজুত, বিশ্রাম ও অবস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যেন তারা নিজেরাই বাজারের হাল-হকীকত বুঝতে পারে এবং সুবিধামত সময়ে ও দরে তাদের পণ্য বিক্রয় করতে পারে;

৮. বেচাকেনার সকল পর্যায় হতে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল, বেপারী ও ফড়িয়া শ্রেণীর উৎখাত করা; কারণ এরাই পণ্যসামগ্রীর কোনো গুণবাচক পরিবর্তন না ঘটিয়েই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই মুনাফা লুটে নেয়, এরাই বাজারে সরবরাহ বিঘ্নিত করে। বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে এই শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ করতে হবে কঠোর হাতে;

৯. বাজার দখল বা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীকে ঘায়েলের উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রীর ডামপিং প্রতিহত করা; এবং

১০. ব্যবসায়ী ও কারিগরদের পণ্য সামগ্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খুঁত প্রকাশে বাধ্য করবেন। ক্রেতাদের সামনে যেন মিথ্যা শপথ নিতে না পারে সেই নিশ্চয়তা বিধানও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর মতে রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। বায়তুল মাল হতেই এই উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাপ্ত যাকাত ও আদায়কৃত কর ও শুল্ক হতে যদি দরিদ্র জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ না হয় তাহলে সরকার ধনীদের উপর আরো কর আরোপ করবে। তাতেও ব্যয় সংকুলান না হলে তাদের কাছ থেকে ঋণ নেবে। তারপরও ঘাটতি রয়ে গেলে ধনীদের উদ্বৃত্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কারণ আল্লাহই সরকারকে এই অধিকার দিয়েছে (সূরা আল-যারিয়াত : ১৯ আয়াত)।

তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করতে না পারলে বেকারত্ব দূর হবে না। এজন্যে সরকারকে যথোচিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। একচেটিয়া কারবার মজুতদারী মুনাফাখোরী ফটকাবাজারী কালোবাজারী ওজনে কারচুপি সবই জনস্বার্থবিরোধী। তাই এসব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিয়েছেন। তবে ব্যবসায়ীরা যেন ন্যায্য মুনাফা হতে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও নজর রাখতে বলেছেন। বাজারে যেন ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তা দেখার দায়িত্ব মুহতাসিব তথা সরকারেরই।

তাঁর মতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সরকার জনস্বার্থেই ব্যক্তির অধিকারবিশেষ খর্ব ও বাতিল করারও এখতিয়ার রাখে।

নাসিরউদ্দীন তুসীর (৫৯৭-৬৭২হি./১২০১-১২৭৪খ্রী.) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সরকারী অর্থব্যবস্থা। তাঁর *রিসালা-ই-মালিয়াত*-এ তিনি করের বোঝা হ্রাসের পরামর্শের পাশাপাশি শরীয়াহর অনুমোদন নেই এমন সব করেরও বিরোধিতা করেছেন। কৃষিকাজকে তিনি সর্বাগ্রগণ্য হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং ব্যবসা ও অন্যান্য পেশাকে গৌণ বিবেচনা করেছেন। সঞ্চয়ের উপর জোর দিয়েছেন এবং স্বর্ণালঙ্কার ও আবাদ অযোগ্য জমি ক্রয়ের বিরোধিতা করেছেন। আড়ম্বরপূর্ণ ভোগব্যয়কে তিনি জোরালো ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন কৃষিই যে সমগ্র অর্থনীতির ভিত্তি এবং প্রজাদের মঙ্গলের মধ্যেই যে সমৃদ্ধি নিহিত এই সত্য যেন তৎকালীন মোঙ্গোল শাসকেরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।

ইবনুল কাইয়্যিমের পুরো নাম শামস আল-দ্বীন আবু আবদ আল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (৬৯১-৭৫১ হি./১২৯২-১৩৫০ খ্রী.) । তাঁর বিখ্যাত বই *আল-তুরুক্ব আল-হুকমিয়্যাহ*। তাঁর মতে ব্যক্তি যদি তার সম্পদ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তাহলে রাষ্ট্র অবশ্যই তাতে হস্তক্ষেপ করবে। তিনি ন্যায়সঙ্গত মূল্য, যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ, উপযুক্ত মজুরী এবং সঙ্গত মুনাফার পক্ষপাতি ছিলেন। একচেটিয়া কারবার অথবা বাজারে অপূর্ণতা থাকলে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি বিস্তারিত নীতিমালাও তিনি নির্ধারণ করেছিলেন। বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে কারিগরদের মজুরী নির্ধারণের উপর জোর দিয়েছেন। উপরন্তু নাগরিকদের প্রয়োজনে পণ্য আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারেরও পরামর্শ দিয়েছেন। ইবনে তাইমিয়ার মতো তিনিও প্রতিষ্ঠান হিসাবে *আল-হিসবাহর* কার্যক্রমের সমর্থক ছিলেন। তাঁর অর্থনীতি চিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিলো সুবিচার (*আদল*) প্রতিষ্ঠা, জনস্বার্থ সংরক্ষণ (*আল-মাসলাহাহ আল-আমমাহ*) এবং সে সব কাজের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ (*সাদ আল-যারিয়াহ*) যেগুলো জনস্বার্থ ও সুবিচারের মূল লক্ষ্যকেই নস্যাৎ করতে পারে।

আল-শাতিবীর পুরো নাম আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন মুসা আল-লাখমী আল-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি./১৩৮৮ খ্রী.)। ইমাম হিসেবেও তিনি বহুল পরিচিত। তাঁর সর্বাধিক আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *আল-মুয়াফীক্বাত ফী উসূল আল-শারীআহ*। যে শরীয়াহর দ্বারা মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত সেই শরীয়াহর প্রকৃত উদ্দেশ্য (*মাক্বাসিদ আল-শারীয়াহ*) অর্জন কৌশল তাঁর আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর মতে রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো হলো :

১. যাকাত প্রতিষ্ঠা,
২. জীবনের মৌলিক পাঁচটি চাহিদা পূরণ,

৩. সম্পত্তি সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয়রোধ এবং অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস থেকে বিরত রাখা এবং

৪. যাবতীয় নেশার সামগ্রী ও বিচারশক্তিকে কলুষিত করে এমন সব দ্রব্যের উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ নিষিদ্ধকরণ।

মানবজীবনের প্রয়োজনকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা : অপরিহার্য (*জরুরীয়াহ*), প্রয়োজনীয় (*হাজিয়াহ*) এবং উৎকর্ষমূলক (*তাহসানীয়াহ*)। জরুরীয়াহর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি বিষয় যেগুলোর অবশ্যই নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও ভূমিকা রয়েছে। কারণ এর মধ্যে যেমন পার্থিব জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে তেমনি রয়েছে আখিরাতেরও । এগুলো হলো : (১) বিশ্বাস (*আল-দ্বীন*), (২) জীবন (*আল-নফস*), (৩) বংশধর (*আল-নসল*), (৪) সম্পত্তি (*আল-মা'ল*) এবং (৫) বুদ্ধিমত্তা (*আল-আক্বল*)।

ইবনে খালদূনের পুরো নাম ওয়ালী আল-দীন আবদ আল-রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবী বকর মুহাম্মদ ইবন আল-হাসান ইবন খালদূন (৭৩২-৮০৮ হি./১৩৩২-১৪০৬ খ্রী.)। তাঁর জন্ম তিউনিসে, মৃত্যু কায়রোয়। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী হলেও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কেও তিনি অগাধ জ্ঞান রাখতেন। *কিতাব আল-ইবার* বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলেও এই বইয়ের ভূমিকা বা *আল-মুকাদ্দামা* তাঁর বহুল পরিচিত ও প্রশংসিত গ্রন্থ। এই বইয়ে তিনি অর্থনীতির যেসব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন সে সবের মধ্যে রয়েছে : (১) শ্রম বিভাজন, (২) মূল্য পদ্ধতি, (৩) উৎপাদন ও বন্টন, (৪) মূলধন সংগঠন, (৫) চাহিদা ও যোগান, (৬) মুদ্রা, (৭) জনসংখ্যা, (৮) বাণিজ্যচক্র, (৯) সরকারী অর্থব্যবস্থা এবং (১০) উন্নয়নের স্তর। তাঁর সময়কালে যেসব বিষয় তাঁকে নাড়া দেয় তা হলো রাজবংশের উত্থান ও পতন এবং দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য। এগুলোতে তিনি বেশ কিছু প্যাটার্ন চিহ্নিত করেন।

এ্যাডাম স্মিথেরও চার শত বছর পূর্বে *আল-মুকাদ্দামায়* তিনি শ্রম বিভাজন এবং এর ইতিবাচক ফল সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। একদল মানুষ পারস্পারিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত শক্তির ভিত্তিতে যা উৎপন্ন করে তা এককভাবে একজনের উৎপাদনের চেয়ে ঢের বেশী। ফলে প্রয়োজন পূরণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা বিক্রি করা সম্ভব। তিনি বলেন শ্রমবিভাজনের ফলেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়। শ্রমের বিশেষীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের পক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর মতে একমাত্র বিশেষীকরণের ফলেই উঁচু হারে উৎপাদন সম্ভব যা পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের জন্যে অপরিহার্য। ইবনে খালদূন উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মানবীয় শ্রমের সবিশেষ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। নানা ধরনের পেশা ও সেসবের সামাজিক উপযোগিতার কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। দারিদ্র্যের ভিত্তি এবং তার কারণ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার জন্যে ইবন আল-সাবিল তাঁকে প্রুঁধো, মার্ক্স ও

এঙ্গেলসের পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করেন। তাহাবী দেখিয়েছেন ইবনে খালদূনের মডেলে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্ষা বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজন সম্পর্কে তাঁর ধারণার প্রশংসা করেছেন বৌলাকিয়া। ধনী ও গরীব দেশসমূহের মধ্যে বিনিময়ের হার, আমদানী ও রপ্তানীর প্রবণতা, উন্নয়নের উপর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রভাব প্রভৃতি বিশ্লেষণসহ তিনি যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন তা আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের ভ্রূণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। ইবনে খালদূন বিশ্লেষণ করে দেখাতে সক্ষম হন যেসব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত সেসব দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় ধনী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বেশী হলে শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ সহজ হয় এবং এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এরূপ উন্নয়নে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে এবং শিল্পে বৈচিত্র্য আসে। তাঁকে বাণিজ্যবাদীদের পূর্বসূরী হিসাবেও গণ্য করা হয়। কারণ সোনা ও রূপাকে তিনি যে অর্থে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন ও তার ব্যবহারের কথা বলেছেন তার সাথে পরবর্তী যুগের বাণিজ্যবাদীদের চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে।

তিনি ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বিচারে পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ঘন জনবসতির কারণের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেন চরম উষ্ণ অঞ্চলে জনবসতি কম, কারণ এ সকল অঞ্চলে জীবনযাত্রা কঠোর। পক্ষান্তরে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকেরা হয় সংযমী, মিতাচারী ও কৃষ্টিবান। এ সকল এলাকার লোকেরা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদে স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়।

মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধেও ইবনে খালদূনের মূল্যায়ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন সোনা ও রূপা যেহেতু সবদেশে সকলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে সেহেতু মুদ্রার মান হিসেবে এই দুই ধাতু ব্যবহার করা সমীচিন। এর দ্বারা মুদ্রার মূল্যও সংরক্ষিত হয়। যেহেতু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের সময়ে মুদ্রার ওজন দেখা সম্ভব নয় সেহেতু টাকশালে মুদ্রা তৈরীর সময়ে সোনা ও রূপার ধাতুগত মান ও প্রতিটি মুদ্রার ওজন যেন একই রকম হয় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। কারণ মুদ্রা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত সেই গ্যারান্টি বহন করে যে এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা বা রূপা রয়েছে। ইবনে খালদূন বলেন সকল দ্রব্যই বাজারে নানা ধরনের উঠা-নামার শিকার, কিন্তু মুদ্রা হবে তার ব্যতিক্রম। এজন্যে টাকশালকে তিনি সরাসরি খলীফার নিয়ন্ত্রণাধীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানতুল্য গণ্য করেছেন।

তাঁর রচনায় শ্রমের মূল্যতত্ত্বের সন্ধান মেলে। কারো কারো মতে তাঁর শ্রমের মূল্যতত্ত্বে শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে যে জন্যে তাঁকে মার্ক্সের পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সভেংলানার মতে তিনিই অতীতকালের প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি মূল্যের রহস্য ভেদে সক্ষম হন। তিনি আবিষ্কার করেন মূল্যের ভিত্তি

হচ্ছে শ্রম। তাঁর মতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে তিনটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে : (১) বেতন, (২) মুনাফা এবং (৩) কর। বেতন উৎপাদনকারীর প্রাপ্য, মুনাফা ব্যবসায়ীর প্রাপ্য এবং কর সরকারের প্রাপ্য যা দিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন ও সরকারী সেবাসমূহের ব্যয় নির্বাহ হবে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত। ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। ইবনে খালদূনের সভ্যতার চক্রতত্ত্বকে অর্থনীতিবিদ জে.আর. হিকসের বাণিজ্য চক্রতত্ত্বের সাথে তুলনা করেছেন স্পেঙ্গলার। তবে তাঁর তত্ত্বটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের সঙ্গে তুলনা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

কর ও সরকারী ব্যয় সম্পর্কে তিনি বিশদ বক্তব্য রাখেন। তাঁর মতে করের পরিমাণ যতদূর সম্ভব নীচু রাখলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যেহেতু জনগণ তখন উন্নয়নের সুবিধাদি ভোগ করার সুযোগ পায় সেহেতু তারা এতে উৎসাহিত বোধ করে। করের হার নীচু রাখার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন করের উচুঁ হার প্রকৃতপক্ষে সরকারের আয় কমিয়ে দেয়। কম কর প্রাচুর্য আনয়নে ও করের ভিত্তি সম্প্রসারণে সহায়তা করে। এতে সরকারেরও আয় বৃদ্ধি ঘটে। কর প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন আদায়কৃত করের পরিমাণ যদি খুব স্বল্প হয় তাহলে সরকার তার দায়িত্ব যথাযথ পালনে সক্ষম হবে না। অথচ যে কোন সভ্যতায় জনগণের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সরকারের মত একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে খুব উঁচু হারের করের পরিণাম খারাপ। কেননা তখন উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা হ্রাস পায় এবং কাজের উৎসাহ উবে যায়।

তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীল রাখার স্বার্থে সরকারী ব্যয় অব্যাহত রাখার সুস্পষ্ট সুপারিশ রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বছর পরে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা কেইনসের প্রদত্ত তত্ত্বের সাথে তাঁর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্যে যেমন সরকারী ব্যয় অপরিহার্য গণ্য করেছেন তেমনি সরকারী ব্যয়ের ফলে বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা অব্যাহত থাকে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সরকার প্রশাসন ও সেনাবাহিনীসহ যথোপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে না তুললে জনগণের প্রয়োজন পূরণ যেমন সম্ভব নয় তেমনি তারা নিরাপত্তাহীনতায়ও ভোগে। শহরগুলোতে সমৃদ্ধির কারণই হলো সরকারী ব্যয়। তাঁর মতে শাসক এবং অমাত্যবর্গ ব্যয় বন্ধ করলে ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়ে, মুনাফা হ্রাস পায় এবং মূলধনেরও স্বল্পতা দেখা দেয়। তাই সরকার যতই ব্যয় করেন ততই মঙ্গল।

অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে শূম্পীটারই প্রথম ইবনে খালদূনের কথা উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক কালে ব্যারি গর্ডন তার *Economic Analysis Before Adam Smith - Hesiod to Lessius* বইয়ে ইবনে খালদূনের অর্থনৈতিক

বিশ্লেষণের গুরুত্বের কথা খুব জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনার জন্যে জে. স্পেঙ্গলার, ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল, টি.বি. আরভিং, জে.ডি. বৌলাকিয়া প্রমুখ ইউরোপীয় গবেষকরা তাঁকে আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা হিসেবে বিবেচনা করেন। বৌলাকিয়া বলেন-

> "Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official birth. He discovered the virtue and necessity of a division of labour before (Adam) Smith and the principle of labour value before (David) Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. .... But much more than that, Ibn Khaldun used these concepts to build a coherent dynamic system in which the economic mechanism inexorably lead economic activity to long-term fluctuations. Without tools, without preexisting concepts he elaborated a genial economic explanation of the world. .... His name should figure among the fathers of economic science." – Jean David Boulakia, "Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist", *Journal of Political Economy,* Vol. 79 No. 5, September-October 1971, pp. 1105-1118.

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০২-১৭৬৩ খ্রী.) তাঁর *হুজ্জাতুল্লাহ্ আল-বালিগা* বইয়ে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি বিষয়ে শরীয়াহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব সেহেতু তাদের সার্বিক কল্যাণ পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যেই নিহিত। বিনিময় চুক্তি মুনাফার অংশীদারীত্ব ভাগচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে এই সহযোগিতা বিকশিত হয়। যেসব কাজ সহযোগিতার মূলনীতি ধ্বংস করে সেগুলি প্রকৃতপক্ষেই শরীয়াহবিরোধী। উদাহরণস্বরূপ সুদ ও জুয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। জুয়া থেকে আয় আসলে জনগণের অজ্ঞতা, লোভ এবং আশার ভিত্তিতেই অর্জিত হয়। এর সাথে সহযোগিতা বা সভ্যতার কোন সংস্পর্শ নেই। সুদ নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে তিনি একই রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

তাঁর মতে সহযোগিতার কাঠামোয় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে জমি সমভাবে ভাগ করা উচিত। মসজিদের মত সমস্ত জমিও ভ্রমণকারীদের আশ্রয় স্থল। 'আগে আসলে আগে পাবে' নীতির ভিত্তিতে সবাইকে এসব সম্পদ শেয়ার করতে হবে। জমির মালিকানার ক্ষেত্রে তাঁর মতামত হলো: মালিকানার অর্থ হলো সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া। তিনি কতিপয় প্রাকৃতিক সম্পদকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। মজুতদারী ও মুনাফাখোরীকে তিনি কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন।

সরকারী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা ছিল: প্রতিটি সভ্য সমাজের জন্যে একটি সরকার থাকবে, দেশরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে এবং জনগণের স্বার্থে দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করবে। এই

ধরনের কাজ করার জন্যে সরকারকে অবশ্যই কর আরোপ করতে হবে। তবে কর আরোপের ক্ষেত্রে যাদের সামর্থ্য আছে কেবল তাদের উপরই কর আরোপ করা হবে এই নীতি অনুসৃত হতে হবে।

দেহলভী মনে করেন বিলাসবহুল জীবন যাপনে নিমগ্ন হলে সমাজে ধ্বংস অনিবার্য। অন্যান্যদের মত তিনিও প্রয়োজনের শ্রেণী বিভাগ করেন। যথাঃ প্রয়োজন, আরামদায়ক ও বিলাস। তৎকালীন বৃটিশ শাসনের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন এক শ্রেণীর কর্মকর্তার বিলাসবহুল জীবন যাপনের সামগ্রী যোগান দেবার জন্যে সীমিত সম্পদ বিলাসজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এতে সাধারণ জনগণের চাহিদা উপেক্ষিত হয়। তাঁর নিজ দেশ ভারতবর্ষের অধঃপতনের জন্যে দুটো বিষয়কে দায়ী করেন। প্রথমতঃ কবি ও সাধু ধরনের লোকদের কার্য সম্পাদনের জন্যে অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় এবং দ্বিতীয়তঃ চাষী, ব্যবসায়ী ও কারিগরের উপর এত উঁচু হারে কর আরোপ করা হয় যে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাদের উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণের সাথে শত বছর পরের কার্ল মার্ক্সের বিশ্লেষণের সাদৃশ্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

ইসলামী অর্থনীতি আলোচনায় এর পর দীর্ঘদিনের স্থবিরতা দেখা দেয়। মুসলিম মিল্লাত জড়বাদী সভ্যতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়, তার ধ্যান-ধারণা পুঁজিবাদী চিন্তাধারার নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে মুসলমানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। ইসলামকে নতুনভাবে জানা এবং ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রতিষ্ঠার জন্যে শুরু হয় বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন। সেই আন্দোলনে নতুন নতুন কর্মসূচী ও ইজতেহাদের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যা ইসলামী সমাধান নিয়ে এগিয়ে এসেছেন অনেক ফকীহ, গবেষক-অধ্যাপক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁদের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ও যুক্তিপূর্ণ রচনা বিশাল ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে।

এই পর্বে যার নাম সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে হয় তিনি আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার জবাবে ইসলামকে নতুন অবয়বে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। তার নাম **সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী**। অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামই যে একমাত্র সমাধান সেটি তিনি ক্ষুরধার যুক্তির আলোকে তুলে ধরেছেন। তাঁর *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ* এবং *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং* ইসলামী অর্থনীতির স্বরূপ উপলব্ধি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। সুদ ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি হলো সুদ। এই সুদের ভয়ংকর সব ক্ষতিকর দিক তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুদবিহীন ব্যাংকিং-এর তাত্ত্বিক মডেল প্রদান করেছেন।

তাঁরই পথ ধরে **নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী** তাঁর *Banking Without Interest* বইয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রায়োগিক মডেলের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। ইসলামে

একটি গ্রহণযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে **উমার চাপরা** আলোচনা করেছেন তাঁর *Towards a Just Monetary System* বইয়ে। তাঁর *Islam and the Economic Challenge* বইয়ে তিনি পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা, সমাজতন্ত্রের পশ্চাদাপসরণ, কল্যাণ রাষ্ট্রের সংকট, উন্নয়ন অর্থনীতির অসঙ্গতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত করেছেন। উপরন্তু ইসলামী বিশ্বদর্শন ও কর্মকৌশল, অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং মানবসম্পদ উজ্জীবন ও উন্নয়ন সম্বন্ধেও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সকল আলোচনার মূল সুর হলো মানবজীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান ইসলামেই নিহিত রয়েছে।

ইউসুফ কারযাবী তাঁর *ফিকহ আল-যাকাহ* বইয়ে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে কিভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা উচিত তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যাকাত বিষয়ে তিনি যেমন কতিপয় পুরাতন প্রশ্নের বিশ্লেষণ করেছেন এবং সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন তেমনি নতুন কিছু প্রসঙ্গেরও অবতারণা করেছেন।

বাক্বীর আল-সদর তাঁর *ইকতিসাদুনা* বইয়ে যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ বিলাস সামগ্রী উৎপাদনে সম্পদ ব্যবহার না করার উপর জোর দিয়েছেন। এজন্যে রাষ্ট্রকেই ভূমিকা রাখতে হবে। উপরন্তু প্রত্যেক নাগরিকের প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি জীবন-যাপনের মানেরও ভারসাম্য বজায় রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তারও গ্যারান্টি দেবে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপরেও তাঁর আলোচনা রয়েছে।

সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ কেমন হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন **মুহম্মদ হিফযুর রহমান** তাঁর *ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম* বইয়ে। খারাজ নিয়ে দীর্ঘ দিনের বিতর্ক রয়েছে ফকীহদের মধ্যে। পাক-ভারত উপমহাদেশেও এ বিতর্ক ছিল। এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ ও সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা করেছেন **মুফতী মুহাম্মদ শফী** তাঁর *ইসলাম কা নিযাম-ই আরায* গ্রন্থে। ইসলামী কাঠামোয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে সংঘটিত হবে, কেমন হবে তার গতি-প্রকৃতি ইত্যাকার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন **খুরশীদ আহমদ** তাঁর বই *Islamic Approach to Development : Some Policy Implications*-এ, **উমার চাপরা** তাঁর বই *Islam and Economic Development*-এ এবং **আবুলহাসান এম. সাদেক** তার *Economic Development in Islam* বইয়ে।

উল্লেখ্য, ইসলামী অর্থনীতির নানা বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনামূলক লেখার সংখ্যা বর্তমান সময়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য সকলেই যে নতুন চিন্তা বা বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট এমন নয়। তবু এসব লেখার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণা হচ্ছে। ফলে ইসলামী অর্থনীতি চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটছে যার বাস্তবায়ন হলে পৃথিবী একটি শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজব্যবস্থা উপহার পেতে পারে।

ইসলামী অর্থনীতি পাঠসহায়ক বইপত্র

ইসলামী অর্থনীতি এবং এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্যে অনেকেই এখন বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং পড়াশুনার জন্যে বই-পত্রের খোঁজ-খবর করছেন। অনেকে গবেষণার জন্যে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত জীবন-নির্দেশিকা আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদী বিষয়ের। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে বেশ কিছু কালজয়ী দিক-নির্দেশনা রয়েছে হাদীস শরীফে। সে সবের উপর ভিত্তি করে আলোচনা ও বিশ্লেষণের সূত্রপাত হয়েছিল ইসলামের সোনালী যুগে। সে আলোচনার ভাষা ছিল আরবী। সাম্প্রতিককালে ফার্সী, তুর্কী, ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। মনে রাখা দরকার আধুনিককালে অর্থনীতির আলোচনা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং ক্রমাগত গাণিতিক, ইকোনমেট্রিক ও পরিসংখ্যাননির্ভর জটিল রূপ পরিগ্রহ করছে। সেই আলোকে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও চিন্তার জন্যে প্রয়োজন দস্তুরমতো ভাল বই, পত্র-পত্রিকা ও গবেষণামূলক জার্নাল। এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করাই বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর যুক্তিপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগাতে ও বিপুল আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হন। তিনি প্রধানতঃ উর্দূতে লিখেছেন। সাম্প্রতিককালে যাঁরা আরবীতে এই বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ ও বই রচনা করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ আনাস জারকা, ইউসুফ আল-কারযাবী, সুলতান আবু আলী, মুস্তাফা আল-জারকা, মুহাম্মদ আহমদ সাকর, আহমদ আল-নাজ্জার, রফিক ইউনুস আল-মিসরী, আবদুর রহমান ইউসরী, বাকীর আল-সদর, আবু সউদ, কাউসার আবদুল ফাতাহ আল-আবজী, মাবিদ আল-জারহী এবং ইউসুফ কামালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ইসলামী অর্থনীতি বিশেষ করে এর ব্যষ্টি ও সমষ্টি অর্থনীতি, মুদ্রা বাজার, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা, ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, কর কাঠামো, সুদের বিলোপ ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, পুঁজি বিনিয়োগ, দারিদ্র্য বিমোচন, যাকাতের ভূমিকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রতিপাদ্য ও বিতর্কের অবতারণা হয়েছে ও হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজীতে এখন প্রচুর বই, পুস্তিকা ও গবেষণা জার্নাল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে প্রভূত উৎসাহ নিয়ে লিখে চলেছেন মুসলিম অধ্যাপক ও গবেষকগণ। সেই সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন বেশ কিছু আগ্রহী অমুসলিম অর্থনীতিবিদও।

বিগত তিন দশক ধরে ইংরেজী ভাষায় যেসব খ্যাতনামা মুসলিম গবেষক-অধ্যাপক বই ও প্রবন্ধ লিখছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন খুরশীদ আহমদ, এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, এম. উমার চাপরা, মনযের কা'ফ, সাবাহউদ্দীন যাইম, সাইয়েদ নওয়াব হায়দার নকভী, মুহাম্মদ আরিফ, এম. আবদুল মান্নান, ফাহীম খান, মুনাওয়ার ইকবাল, মাসুদুল আলম চৌধুরী, আব্বাস মিরাখর, মোহসীন এস. খান, জিয়াউদ্দিন আহমদ, আউসাফ আহমদ, আকরাম খান, আবুল হাসান এম সাদেক, যুবায়ের ইকবাল, সাইয়েদ তাহির, বু'আলীম বিন জিলালী, আবদুল আযিম ইসলাহী, তরিকুল্লাহ খান প্রমুখ। এদের মধ্যে কেউ কেউ উর্দূতেও লিখে থাকেন।

অমুসলিমদের মধ্যে যাঁরা গবেষণা করছেন এবং লেখালেখি করছেন তাঁদের মধ্যে ভোলকার নিয়েনহাউস (বখুম বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানী), জন আর. প্রেসলি (লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য), ফ্রাংক ই. ভোগেল (হার্ভার্ড ল স্কুল, যুক্তরাষ্ট্র), রডনি উইলসন (ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য), বাদল মুখার্জী (দিল্লী স্কুল অব ইকোনমিকস, ভারত) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজী ভাষায় রচিত এসব বই/পুস্তিকা ও গবেষণা জার্নাল প্রকাশ এবং ইসলামী অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী চর্চা ও গবেষণায় আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে এখানে সেগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এদের মধ্যে সবার শীর্ষে রয়েছে জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অঙ্গসংস্থা ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার সংকলন, গবেষণাপত্র ও অনুবাদ মিলিয়ে শতাধিক বই প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরবী ও ফারসী ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও প্রায় সমসংখ্যক। এরপরেই যে প্রতিষ্ঠানটির অবদান উল্লেখযোগ্য সেটি হলো জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আযীয ইউনিভারসিটির সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিকস। ইসলামী অর্থনীতির নানা শাখায় গবেষণার জন্যে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতনামা গবেষক-পন্ডিতদের সমাবেশ ও সম্মিলন ঘটানোর অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত এই সেন্টারটি এযাবৎ চল্লিশটির বেশী গবেষণা প্রবন্ধ, বই ও সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের সম্পাদিত সংকলন প্রকাশ করেছে।

এরপরেই যুক্তরাজ্যের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্থান। দাওয়াধর্মী এই প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী অর্থনীতির উপর ইতিমধ্যে কুড়িটির বেশী মূল্যবান বই প্রকাশ করেছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ইনস্টিটিউট অব পলিসি ষ্টাডিজ (ইসলামাবাদ), ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (কুয়ালালামপুর), শেখ মুহম্মদ আশরাফ পাবলিকেশনস (লাহোর), পেলানদুক পাবলিকেশনস (কুয়ালালামপুর), লংম্যান মালয়েশিয়া প্রভৃতি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে বিদেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রীও প্রদান করা হচ্ছে। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে ইতিমধ্যেই এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত ডক্টরেট ডিগ্রীর সংখ্যা তিন শতাধিক। এশিয়াতেও পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ছাড়া সউদী আরব ইরান জর্দান ও ভারতের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অর্থনীতির উপর নিয়মিত গবেষণা চলছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের লাফবরো ইউনিভারসিটি অব টেকনোলজি ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এর উপর প্রাতিষ্ঠানিক গ্রাজুয়েশন ও ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহী প্রধান ও কর্মকর্তাদের জন্যে Intensive training course চালু করেছে। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টি পাঁচটি কোর্স সম্পন্ন করেছে। উপরন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Harvard University Forum on Islamic Finance।

বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতির চর্চা অর্থাৎ, এবিষয়ে বইপত্র লেখার কাজ শুরু হয় ১৯৫০ এর দশকে মূলতঃ অনুবাদকর্মের মধ্যে দিয়ে। এদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ-গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বিশ্ববরেণ্য পন্ডিত ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর উর্দূ বইয়ের অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি নিজেও ***ইসলামের অর্থনীতি*** নামে কুরআন-হাদীসের আলোকে ও আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষা ও বিশ্লেষণের নিরিখে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখেন। বইটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরপর ধীরে ধীরে মওদুদীর আরও কিছু বই অনুবাদের পাশাপাশি তিনি নিজেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন।

ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বই রচনার ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের অনুবর্তী ছিলেন হাসান জামান, এ. জেড. এম. শামসুল আলম, শাহ আবদুল হান্নান, রায়হান শরীফ প্রমুখ। ১৯৭০-এর দশকের শেষে বেশ কিছু অধ্যাপক-গবেষক একযোগে লিখতে শুরু করেন পত্র-পত্রিকায়। তাদের বইও প্রকাশিত হতে শুরু করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল হাসান এম. সাদেক, আলী আহমদ রুশদী, আতাউল হক প্রামানিক, এম.এ. হামিদ, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, জহুরুল ইসলাম, কাজী মর্তুজা আলী। তরুণদের মধ্যে যারা এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন তারা হলেন এম. কবির হাসান, মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম, এস.এম. আলী আক্কাস, আবদুল আউয়াল সরকার, মাহমুদ আহমদ, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ। ইসলাম অর্থনীতির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ এদেশে এই বিষয়ের চর্চাকে এগিয়ে নিয়েছে। যারা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল মান্নান

তালিব, ফরীদউদ্দিন মাসউদ, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব প্রমুখ। উল্লেখ্য, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বাংলায় সবচেয়ে বেশী অনুদিত হয়েছে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, উমার চাপরা, নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ইউসুফ আল-কারযাবী ও মুফতী মুহাম্মদ শফীর বই। এতো কিছুর পরেও বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান শ্রেণী পর্যায়ে মানসম্মত টেক্সট বইয়ের অভাব ছিল প্রকট। গত শতাব্দীর একেবারে শেষে এসে এই অভাব অনেকখানি পূরণ হয় প্রথমে আবদুল মান্নান চৌধুরী ও পরে এম. এ. হামিদের প্রচেষ্টায়। শেষোক্ত জনের বইটি ইংরেজীতে রচিত। বাংলায় এটির অনুবাদ-সম্পাদনা করেছেন শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান। বিপুল চাহিদার কারণে ইতিমধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির চর্চা এদেশে বেগবান হয় ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো প্রতিষ্ঠার পর হতে। আধুনিক অর্থনীতিতে উচ্চ শিক্ষিত ও একই সঙ্গে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী বেশ কিছু তরুণের নিরলস প্রচেষ্টার সফল ফসল এই ব্যুরো। ইসলামী অর্থনীতির নানা বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা ছাড়াও বই ও জার্নাল প্রকাশের ব্যাপারে ব্যুরো শুরু হতেই বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেয়। প্রায় সমসাময়িক সময়ে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও। প্রতিষ্ঠানটি বিগত তিন দশকে কুড়িটির মত বই প্রকাশ করেছে ইসলামী অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গে। এসব বইয়ের মধ্যে যেমন রয়েছে মৌলিক রচনা তেমনি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী ও উর্দূ বইয়ের অনুবাদ।

এই নিবন্ধের শেষে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বই/পুস্তিকার মধ্যে থেকে বাছাইকৃত ২৫০টির নাম উল্লেখ করা হলো। এর মধ্যে বাংলায় ৫০টি ও ইংরেজীতে ২০০টি বই রয়েছে। বইগুলির নামের সাথে সাথে লেখক ও অনুবাদক, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও স্থান এবং প্রকাশনার বছরও উল্লেখ করা হলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলা বইয়ের অর্ধেকই ইংরেজী ও উর্দূতে রচিত বই অথবা বড় প্রবন্ধের অনুবাদ।

এছাড়া রয়েছে দুইশয়ের বেশী মূল্যবান প্রবন্ধ যার অধিকাংশই বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ঐসব প্রবন্ধ সংশোধিত আকারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই ইংরেজী ও আরবী ভাষায়। পাঠক-পাঠিকা এবং গবেষকদের অবগতির জন্যে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক এসব আন্তর্জাতিক জার্নালসহ ইসলামী অর্থনীতির বিবিধ বিষয়ে মোটামুটি নিয়মিতই নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে এমন জার্নাল ও মাসিক পত্রিকার নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

ক. ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংক ও ফাইন্যান্স সংক্রান্ত নিয়মিত আন্তর্জাতিক জার্নাল

১. জার্নাল অব রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিকস (সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিকস, জেদ্দা) [ইংরেজী ও আরবী]

২. জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স (ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ব্যাংকস, এশিয়া অঞ্চল; করাচী) [ইংরেজী]

৩. থটস অন ইকোনমিকস (ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ বুরো, ঢাকা) [ইংরেজী ও বাংলা]

৪. রিভিউ অব ইসলামিক ইকোনমিকস (ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব ইসলামিক ইকোনমিকস, লেইচেষ্টার, যুক্তরাজ্য) [ইংরেজী ও আরবী]

৫. জার্নাল অব ইকোনমিকস এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভারসিটি, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া) [ইংরেজী ও আরবী]

৬. ইসলামিক ইকোনমিক স্টাডিজ (ইসলামিক রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, জেদ্দা) [ইংরেজী ও আরবী]

৭. এ্যারাব ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স (লন্ডন) [ইংরেজী]

৮. ইসলামী ব্যাংকিং (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা) [বাংলা]

খ. ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এমন জার্নাল

১. দি এ্যারাবিয়া (লন্ডন)

২. দি মিডল ঈস্ট (লন্ডন)

৩. দি ভয়েস অব ইসলাম (করাচী)

৪. দি আমেরিকান জার্নাল অব ইসলামিক সোশ্যাল সায়েন্সেস (ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট এবং আমেরিকান মুসলিম সোস্যাল সায়েন্টিস্ট-এর গবেষণা পত্রিকা, ওয়াশিংটন. ডি.সি.)

৫. দি জার্নাল অব দি ইসলামিক রিসার্চ ইসস্টিটিউট (ইসলামাবাদ)

৬. ইসলামিক কোয়ার্টারলি (লন্ডন)

৭. হামদর্দ ইসলামিকাস (করাচী)

৮. ক্রাইটেরিয়ান (করাচী)

৯. জার্নাল অব ইকোনমিক কোঅপারেশন এমং ইসলামিক কান্ট্রিজ (এস.ই.এস.আর.টি.সি.আই.সি., আনকারা)

১০. ইসলামিক রিভিউ (লন্ডন)
১১. ইসলামিক লিটারেচার (লাহোর)
১২. ইসলামিক স্টাডিজ (ইসলামাবাদ)
১৩. ইসলামিক থট (আলীগড়)
১৪. ইসলামিক কালচার (হায়দারাবাদ)
১৫. আল্-নাহ্দাহ (কুয়ালালামপুর)
১৬. ইকতিসাদ (যোগজাকার্তা)
১৭. আল্-তাওহীদ (তেহরান)
১৮. আল-ইত্তিহাদ (ইন্ডিয়ানা)
১৯. এ্যারাব ইকোনমিস্ট (বৈরুত)
২০. আল-ইসলাম (সিঙ্গাপুর)
২১. আল-মীযান (জাকার্তা)
২২. আল-আযহার (কায়রো)
২৩. নিউ হরাইজন (লন্ডন)
২৪. দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ জার্নাল (মক্কা)।

এছাড়া দি পাকিস্তান জার্নাল অব এ্যাপ্লায়েড ইকোনমিকস (করাচী বিশ্ববিদ্যালয়), এ্যারাব ব্যাংকারস (লন্ডন), আল-ইকতিসাদ ওয়া আল-আমল (দুবাই), আহলান ওয়া সাহলান (জেদ্দা), ব্যাংক পরিক্রমা (বি.আই.বি.এম., ঢাকা) প্রভৃতি জার্নালে অনিয়মিতভাবে হলেও ইসলামী অর্থনীতির নানা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে।

উপরন্তু ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল ইসলামী ব্যাংক নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। তারা তাদের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড ও সাফল্যের উপর নানা পুস্তিকা ও গবেষণাপত্রও প্রকাশ করে থাকে। এসব পুস্তিকা, গবেষণাপত্র ও বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে ইসলামী ব্যাংক ও তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতি ও কর্মকান্ডের সাথে সম্যক পরিচিতি লাভ করা সম্ভব।

নির্বাচিত বই-পুস্তিকার তালিকা

বাংলা

সাধারণ

আলম, এ. জেড. এম. শামসুল, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং ২০০৩)

আহমদ, শেখ মাহমুদ, *ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান,* অনু. গুলশান মুহম্মদ আব্দুল হাই (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৬)

ইউসুফুদ্দীন, মুহাম্মদ, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ* (১ম ও ২য় খন্ড), অনু. আবদুল মতীন জালালাবাদী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং ২০০৩)

চাপরা, এম. উমার, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন,* অনু. মাহমুদ আহমদ, সম্পাঃ এম. জহুরুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০০)

মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা, *ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি,* অনু. আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৬)

মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা, *অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান,* অনু. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১১শ সং, ২০০২)

মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা, *ইসলামী অর্থনীতি,* অনু. আব্বাস আলী খান, আবদুস শহীদ নাসিম ও আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ২য় সং, ১৯৯৭)

সম্পাদকমণ্ডলী, *আল-কুরআনে অর্থনীতি* (১ম ও ২য় খণ্ড), (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং ২০০৩)

রহমান, হিফজুর মুহাম্মদ, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* অনু. আব্দুল আউয়াল (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং ২০০০)

রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, *অর্থনীতিতে রাসুলের (স.) দশ দফা,* (রাজশাহী: রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউণ্ডেশন, ২০০৩)

রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব,* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশান, ৩য় সং, ২০০৪)।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি অর্থনীতি

চৌধুরী, মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা: তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (চট্টগ্রাম: গাউছিয়া হক মঞ্জিল, ১৯৯৮)

মান্নান, এম. আবদুল, *ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* অনু. আলী আহমদ রুশদী (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩)

মাসউদ, ফরীদ উদ্দীন, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২)

রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, *ইসলামের অর্থনীতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, ১৯৯৮)

হক, মোহাম্মদ জিয়াউল, *আল-কোরআনের আলোকে অর্থনীতি* (ঢাকা: প্রিয়বই প্রকাশনী, ২০০২)

হামিদ, এম. এ., *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ,* অনু. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সং, ২০০২)

সামাদ, এম. এ., (সম্পা.), *ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা,* (ফরিদপুর: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮২)

সিদ্দিকী, এম. নেজাতুল্লাহ, *শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার,* অনু. কারামত আলী নিযামী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং ২০০০)

সিদ্দিকী, এম. নেজাতুলাহ, *ইসলামে মালিকানার রূপরেখা,* অনু. সিকান্দার মোমতাজী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০)

শফী, মুফতী মুহম্মদ, *ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা,* অনু. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং, ১৯৯৫)

শফী, মুফতী মুহম্মদ, *ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা,* অনু. ফরীদউদ্দীন মাসউদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সং ২০০৪)

সুদ

মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং,* অনু. আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সং, ১৯৯৪)

রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, *সুদমুক্ত অর্থনীতি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫)

হুসাইন, মুহম্মদ শরীফ, *সুদ সমাজ অর্থনীতি* (ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২)

মুদ্রা ও ব্যাংক

আশরাফী, ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং: কি, কেন, কিভাবে?* (ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশান্স, ১৯৯৮)

ইসলাম, তাজুল এবং আবু তাহের মুহাঃ সালেহ, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৪)

চাপরা, এম. উমার, *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা,* অনু. মুহম্মদ শরীফ হুসাইন (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৯)

জব্বার, মো. আবদুল, (সম্পা.), *বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক অফিসার কল্যাণ সমিতি, ১৯৯৪)

আল-নাজ্জার, আবদুল আজীজ, *ইসলামী ব্যাংক কী ও কেন?* অনু. ও সম্পা. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান এবং মুহম্মদ শরীফ হুসাইন (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২য় সং ১৯৮৪)

রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, *ইসলামী ব্যাংকিং: পেছনে ফিরে দেখা* (ঢাকা: বিক্রম পাবলিকেশনস্, ২০০৪)

রকীব, আবদুর ও শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং: তত্ত্ব, প্রয়োগ, পদ্ধতি* (ঢাকা: আল আমীন প্রকাশন, ২০০৪)।

শামসুদ্দোহা, মুহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা* (ঢাকা: ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ ফাউণ্ডেশন, ২০০৪)

হক, এম. আযীযুল, *ইসলামী ব্যাংক: কতিপয় ভ্রান্তিমোচন,* অনু. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬)

হুসাইন, মুহম্মদ শরীফ, *ইসলামী ব্যাংকিং: একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ১৯৯৬।

বীমা

আলম, এ. জেড. এম. শামসুল, *ইসলামী ইন্সুরেন্স (তাকাফুল)* (ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০১)

রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭)

সিদ্দিকী, এম. নেজাতুল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতিতে বীমা,* অনু. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭)

হক, এ.বি.এম., *ইসলামী বীমা (তাকাফুল)* (ঢাকা: পশ্চিম রামপুরা, ২০০২)।

যাকাত ও উশর

আমীন, মুহম্মদ রুহুল, *ইসলামের দৃষ্টিতে উশরঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯৯)

যায়াস, ফারিশতা জ.দ., *যাকাতের আইন ও দর্শন*, অনু. হুমায়ুন খান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪)

সরকারী অর্থব্যবস্থা

আল-কারযাভী, ইউসুফ, *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*, অনু. আবদুল কাদের (ঢাকা: সুজন প্রকাশনী, ১৯৯১)

ইবন সালাম, আবু উবায়দ আল কাসিম, *কিতাবুল আমওয়াল* (১ম খন্ড), অনু. ফরীদউদ্দীন মাসউদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭)

মুশাহিদ, মুহাম্মদ, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার*, অনু. আবু সাঈদ মুহা. ওমর আলী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮)

রানা, ইরফান মাহমুদ, *হযরত উমার (রা.) -এর শাসনামলে অর্থব্যবস্থা*, অনু. জয়নুল আবেদীন মজুমদার (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০)

হান্নান, শাহ আবদুল, *ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৭)

তুলনামূলক অর্থব্যবস্থা

উসমানী, মুহাম্মদ তাকী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা*, অনু. আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০০৩)

চাপরা, এম. উমার, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনু. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও অন্যান্য, সম্পাঃ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০০)

মওদুদী, সাইয়্যেদ আবুল আলা, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*, অনু. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম সং, ১৯৯৭)

রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, *অর্থনীতি, পুঁজিবাদ ও ইসলাম* (ঢাকা: গ্রন্থমেলা, বাংলাবাজার, ২০০৩)

ENGLISH

General

Ahmad, Khurshid, (ed), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981)

Ahmed, Ausaf and Kazim Raza Awan, (eds.), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992)

Al-Lababidi, *Islamic Economics: A Comparative Study* (Lahore: Islamic Publications, 1980)

Awan, Akhtar A., *Equality, Efficiency and Property Ownership in the Islamic Economic System* (New York: Lanham for University Press of America, 1983)

Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992)

Chapra, M. Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

Chowdhury, Masudul Alam and Uzir Abdul Malik, *The Foundations of Islamic Political Economy* (London: Macmillan Press, 1992)

Esposito, John L., (ed.), *Islam and Modern Economic Change* (Syracuse: Syracuse University Press, 1980)

Faridi, F. (ed.), *Essays in Islamic Economic Analysis* (New Delhi: Genuine Publications, 1991)

Ghazali, Aidit bin and Omar Syed Agil, (eds.) *Readings in the Concept and Methodology of Islamic Economics* (Selangor: Pelanduk Publications, 1989)

Haq, Irfan-ul, *Economic Doctrines of Islam* (Herndon, VA: IIIT, 1996)

Iwai, Satoshi, *A New Approach to Human Economics: A Case Study of an Islamic Economy* (Tokyo: International Universitry of Japan, 1985)

Kahf, Monzer, (ed.) *Lessons in Islamic Economics,* Vol. I & 2 (Jeddah: IRTI/IDB, 1998)

Kahf, Monzer, *The Islamic Economy* (Plainfield, Indiana: The Muslim Student's Association of the United States and Canada, 1978)

Khan, M. Akram, *An Introduction to Islamic Economics* (Herndon, VA: IIIT, 1994)

Khan, M. Fahim, (ed.), *Essays in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1995)

Mannan, M. Abdul, *The Making of Islamic Economic Society* (Cairo: International Association of Islamic Banks, 1984)

Mawdoodi, Syed Abul Ala, *Economic Problems of Man and its Islamic Solution* (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1977)

Mawdoodi, Syed Abul Ala, *Economic System of Islam, Tr:* Riaz Hussain, ed. Khurshid Ahmad (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1984)

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Individual Freedom, Social Welfare and Islamic Economic Order* (Islamabad: PIDE, 1981)

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Islam, Economics and Society* (London: Kegan Paul, 1994)

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Principles of Islamic Economic Reform* (Islamabad: PIDE, 1981)

Nomani, Farhad and Ali Rahnema, *Islamic Economic Systems* (London: Zed Books Ltd., 1994)

Patel, Zainal Abedin, *Small Kindnesses: Islamic Viewpoint on the Cause and Solution of Global Poverty* (Nuneaton, U.K.: Muslim Venture Publications, 1990)

Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam* (3 vols.) (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1974)

Sharif, M. Raihan, *Guidelines to Islamic Economics: Nature, Concepts and Principles* (Dhaka: BIIT, 1996)

Micro Economics

Ahmed, Ausaf, *Income Determination in an Islamic Economy* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University; 1987)

Ahmed, Habib (ed.), *Theoretical Foundations of Islamic Economics* (Jeddah: IRTI/IDB, 2002)

Ahmed, Ziauddin, *Islam, Poverty and Income Distribution* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991)

Bendijilali, Boualem, *On the Demand for Consumer Credit: An Islamic Setting* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Chowdhury, Masudul Alam, *Contribution to Islamic Economic Theory: A Study in Social Economics* (London: Macmillan Press, 1986)

Mannan, M. Abdul, *Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1982)

Mannan, M. Abdul, *Islamic Economics: Theroy and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, Rev. 2nd ed., 1986)

Mohsin, Mohammad, *Economics of Small Business in Islam* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Mukherji, Badal, *Theory of Growth of a Firm in a Zero Interest Rate Economy* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1984)

Tahir, Sayyid, et al., (eds.), *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective* (Selangor: Longman Malaysia, 1992)

Macro Economics

Anwar, Muhammad, *Modelling an Interest-free Economy: A Study in Macroeconomics and Development* (Herndon, V.A.: IIIT, 1987)

Khan, M. Fahim, (ed.), *Distribution in Macro Economic Framework: An Islamic Perspective* (Islamabad: IIIE, IIU 1989)

Metwalley, Mokhtar M., *Macroeconomic Models of Islamic Doctrines* (London: J.K. Publishers, 1981)

Money

Ahmed, Ziauddin, et at., (eds.), *Money and Banking in Islam* (Islamabad: IPS, 1983)

Ariff, Mohammad, (ed.), *Monetary and Fiscal Economics of Islam* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1982)

Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)

Chowdhury, Masudul Alam, *Money in Islam* (London & New York: Routledge; 1997)

El-Hiraika, Adam, *On the Design and Effects of Monetary Policy in an Islamic Framework* (Jeddah: IRTI/IDB, 2003)

Interest (Riba)

Ahmad, Khurshid (ed), *Elimination of Riba from the Economy* (Islamabad: IPS; 1995)

El-Ghazali, Abdul Hamid, *Profit Versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994)

Government of Pakistan, *Report of the Council of Islamic Ideology on the Elimination of Interest from the Economy* (Islamabad: Council of Islamic Ideology, 1980)

Khan, Tariqullah, *Interest-free Alternatives for External Resource Mobilization* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997)

Khan, Waqar Masood, *Towards an Interest-free Islamic Economic System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)

Lawson, Ibrahim, (ed.), *Usuary: The Root Cause of the Injustices of Our Time* (Norwich: People Against Interest Debt, 1989)

Naqvi, Syed Nawab Haider, *On Replacing the Institution of Interest in a Dynamic Islamic Economy* (Islamabad: PIDE, 1981)

Pakistan Federal Shariah Court, *Judgement on Interest (Riba)* ed. Khurshid Ahmad (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam and the Theory of Interest* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1961)

Saleh, Nabil A., *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition* (Jeddah: IRTI/IDB, 2003)

Banking

Ahmed, Ausaf, *Development and Problems of Islamic Banks* (Jeddah: IRTI/IDB, 1987)

Ahmed, Ausaf, *Instruments of Regulation and Control of Islamic Banks by the Central Banks* (Jeddah: IRTI/IDB, 1993)

Ahmed, Ziauddin, *Some Misgivings About Islamic Interest Free Banking* (Islamabad: IIIE, 1985)

Ali, Muazzam, (ed), *Islamic Banks and Strategies of Economic Co-operation* (London: New Century Books, 1982)

Amin, S.H., *Islamic Banking and Finance: The Experience of Iran* (Tehran: Vahid Publications, 1986).

Ariff, Mohammad, (ed.), *Islamic Banking in Southeast Asia* (Singapore: Institute of South-East Asian Studies, 1988)

Board of Editors, *Islamic Banking and Insurance* (Dhaka: Islami Bank Bangladesh Ltd., 1990)

Board of Editors, *Text Book on Islamic Banking,* (Dhaka: IERB, 2003)

Buckmaster, Daphene, *Islamic Banking: An Overview* (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1996)

Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan, *Regulations and Supervision of Islamic Banks,* (Jeddah: IRTI/IDB, 2000)

Cunningham, Andrew, *Islamic Banking and Finance: Prospects for the 1990s* (London: Middle East Economic Digest, 1990)

Faruqi, Jalees Ahmed and Shahid Habibullah, *Islamisation of Banking in Pakistan* (Karachi: Research Department, United Bank Ltd., 1984).

Hammad, Alan E., *Islamic Banking: Theory and Practice* (Cincinati, Ohio: Zakat and Research Foundation, 1989)

Huq, Ataul (ed.), *Readings in Islamic Banking* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987)

Institute of Islamic Banking and Insurance, *Accounting Issues in Islamic Banking* (London: IIBI, ICIS House, 1994)

Iqbal, Munawar and Llewellyn, David T. (eds.), *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk* (Cheltenham: Edward Elgar, 2002)

Iqbal, Munawar et al, *Challenges Facing Islamic Banking* (Jeddah: IRTI/IDB, 1998)

Iqbal, Munawar *Islamic Banking and Finance: Current Development in Theory and Practice* (Leicester: The Islamic Foundation, 2001)

Iqbal, Zubair and Abbas Mirakhor, *Islamic Banking* (Washington D.C.: International Monetary Fund, 1987)

Kamel, Saleh, *Development of Islamic Banking Activity: Problems and Prospects* (Jeddah: IRTI/IDB, 1998)

Kazarian, Elias and Ari Kokko, *Islamic Banking and Development* (Sweden: Dept. of Economics, University of Lund, 1987)

Khan, Mohsin S. and Abbas Mirakhor (eds.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston, Texas: Institute for Research and Islamic Studies, 1987)

Mahdi, Mahmoud Ahmad (ed.), *Islamic Banking Modes for House Building Financing* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Meenai, S.A., *The Islamic Development Bank: A Case Study of Islamic Cooperation* (London: Kegan Paul, 1989)

Muslehuddin, Muhammad, *Banking and Islamic Law* (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1974)

Shirazi, Habib, *Islamic Banking* (London : Butterworths, 1990)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Banking Without Interest* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Issues in Islamic Banking: Selected Papers* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983)

Siddiqui, Shahid Hassan, *Islamic Banking* (Karachi: Royal Book Co., 1994)

Task Force Report, *Experiences in Islamic Banking: A Case Study of IBBL* (Islamabad: IPS, 2002)

Wohlers-Scharf, Traute, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries* (Paris: O.E.C.D., 1983)

Zineldin, Mosad, *The Economics of Money and Banking: A Theoretical and Empirical Study of Islamic Interest Free Banking* (Stockholm: Almqvist and Wicksell International, 1990)

Finance

Abod, Sheikh Ghazali Shaikh et al., (eds.), *An Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992)

Ahmed, Ausaf and Tariqullah Khan, *Islamic Financial Instruments for Public Sector Resource Mobilization* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997)

Ahmed, Ausaf, *Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques* (Jeddah: IRTI/IDB, 1993)

Ahmed, Ausaf, *Towards an Islamic Financial Market* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997)

Ahmed, Osman Babikir, *Islamic Financial Instruments to Manage Short Term Excess Liquidity* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997)

Al-Harran, Saad Abdul Sattar, *Islamic Finance: Partnership Financing* (Selangor: Pelanduk Publications, 1993)

Al-Kaff, Syed Hamed Abdul Rehman, *Al-Murabaha in Theory and Practice* (Karachi: Islamic Research Academy, 1986)

Ariff, Mohammad (eds.), *Islamic Finance and Banking: Theory, Practice and Prospects* (Lahore: Progressive Publishers, 1988)

Ariff, Mohammad and M.A. Mannan (eds.), *Developing a System of Financial Instruments* (Jeddah: IRTI/IDB, 1990)

Bendijilali, Boualem, and Tariqullah Khan, *Economics of Diminishing Musharakah* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Bendijilali, Boualem, *Assessment of the Practice of Islamic Financial Instruments* (Jeddah: IRTI/IDB, 1998)

Gafour, A.L.M. Abdul, *Participatory Financing Through Investment Banks and Commercial Banks* (The Netherlands: Apptec, 1996).

Henry, Clement M. and Rodeny Wilson (eds.), *The Politics of Islamic Finance* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004)

Kahf, Monzer and Tariqullah Khan, *Principles of Islamic Financing: A Survey* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992)

Khan, M. Fahim, *Comparative Economics of Some Islamic Financing Techniques* (Jeddah: IRTI/IDB, 1991)

Khan, M. Fahim, *Human Resource Mobilization Through Profit-Loss Sharing Based Financial System* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992)

Khan, M. Fahim, *Profit and Loss Sharing Firm Behaviour and Taxation* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992)

Khan, Tariqullah, *Practices and Performance of Modaraba Companies: A Case Study of Pakistani Experience* (Jeddah: IRTI/IDB, 1996)

Khan, Tariqullah, *Redeemable Islamic Financial Instruments and Capital Participation in Enterprises* (Jeddah: IRTI/IDB, 1998)

Khan, Tariqullah and Habib Ahmed, *Risk Managment : An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry* (Jeddah: IRTI/IDB, 2001)

Laliwala, Jaffer Hussein, *An Outline of Islamic Economic and Financial System* (New Delhi: The Indian Institute of Islamic Studies, 1989)

Mallat, Chibli (ed.), *Islamic Law and Finance* (London: School of Oriental and African Studies, 1988)

Mannan, M. Abdul, *Understanding Islamic Finance: A Study of the Securities Market in an Islamic Framework* (Jeddah: IRTI/IDB, 1993)

Mohsin, Mohammad, *Assessment of Corporate Securities in Terms of Islamic Investment Requirements* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1983)

Nuti, Dominico Mario, *The Economics of Profit Sharing* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Sattar, Azidi, (ed.), *Resource Mobilisation and Investment in an Islamic Framework* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)

Udovitch, Abraham L., *Partnership and Profit in Medieval Islam* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1970)

Umar, M. Abdul Halim, *Shariah, Economic and Accounting Framework of Bay al-Salam in the Light of Contemporary Application* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Vogel, Frank E. and Sammuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return* (The Hague: Kluwer Law International, 1998)

Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000)

Wilson, Rodney (ed.), *Islamic Finance* (London: Pearson Professional Ltd., 1997)

Wilson, Rodney, *Islamic Business: Theory and Practice* (London: The Economist Intelligence Unit, 1985)

Zaman, Hasanuz S.M., (ed.), *Indexation of Financial Assets: An Islamic Evaluation* (Herndon, V.A: IIIT, 1994)

Insurance (Takaful)

Billah, Mohd. Masum, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, (Kuala Lumpur: IIUM, 2001)

BIMB Institute of Research and Training, *Takaful: Concept and Operational System from the Practitioner's, Perspective* (Kuala Lumpur: BIRT, 1996)

Board of Editors, *Some Aspects of Islamic Insurance* (Dhaka: Islamic Takaful Co, (proposed) 1991)

Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law* (Lahore: Islamic Publications, 1969).

Rahman, Afzalur, *Banking and Insurance in Islam* (London: Islamic School Trust, 1979)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Insurance in an Islamic Economy* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)

Zakah & Usher

Ahmed, Habib, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation* (Jeddah: IRTI/IDB, 2004)

Board of Editors, *Zakat and Poverty Alleviation,* (Dhaka: IERB, 2003)

El-Ashker, Ahmed Abdel Fattah and Muhammad Sirajul Huq, *Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Hasan, Nazmul, *Social Security System of Islam with Special Reference to Zakah* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1984)

Imtiazi, I.A. et al. (eds.), *Management of Zakah in Modern Muslim Society* (Jeddah: IRTI/IDB, 2nd ed., 2000)

Islam, M. Zohurul, *Al-Zakah: A Handbook of Zakah Administration* (Dhaka: BIIT, 1999)

Kahf, Monzer, (ed.) *Economics of Zakah* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997)

Kahf, Monzer, *Zakah Management In Some Muslim Societies* (Jeddah: IRTI/IDB, 1998)

Sato, H., *Understanding Zakat: An Inquiry into the Methodological Problems of the Science of Economics* (Niigata: Institute of Middle Eastern Studies, 1987)

Shad, Abdul Rahman, *Zakat and Usher* (Lahore: Kazi Publications, 1986)

Zaman, M. Raquibuz, *Some Administrative Aspects of the Collection and Distribution of Zakah and the Distributive Effects of the Introduction of Zakah into Modern Economics* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1987)

Zayas, Farishta G. de, *The Law and Philosophy of Zakat* (Damascus: Al-Jadidah Press, 1960)

Public Finance

Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim, *Taxation in Islam,* tr: Ben Shemesh (Leiden: E.J. Brill, 1969).

Ahmed, Ziauddin, et at., (eds.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Islamabad: IPS, 1983)

Al-Sa'adi, Abdullah Juma'an Saeed, *Fiscal Policy in the Islamic State,* tr. Ahmad al-Anani (UK: Lyme Books, 1986)

Gulaid, Mahmoud Awaleh *and* Aden Abdullah Mohammad (ed.), *Readings in Public Finance in Islam* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994)

Gulaid, Mahmoud Awaleh, *Public Sector Resource Mobilization in Islam* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992)

Iqbal, Zubair, *Public Finance in Islam* (Lahore: Readers' Publishers, 1990)

Kahf, Monzer, *Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997)

Lokkegaard, Frede, *Islamic Taxation in the Classical Period with Special Reference to Iraq* (Copenhegen: Branner and Korch, 1950)

Qureshi, Anwar Iqbal, *Fiscal System of Islam* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1978)

Siddiqi, S.A., *Public Finance in Islam* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1975)

International Economics

Azzam, Salem (ed.), *The Muslim World and the Future Economic Order* (London: Islamic Council of Europe, 1979)

Bendijilali, Boualem, *An Intra-Trade Econometric Model for OIC Member Countries: A Cross Country Analysis* (Jeddah: IRTI/IDB, 2000)

Bendijilali, Boualem, *Profit-Loss Sharing Model for External Financing* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994)

Bhuyan, Ayubur Rahman et al., (eds.), *Towards an Islamic Common Market* (Dhaka: IERB, 1996)

Billah, Mohd. Masum, *Islamic Law of Trade and Finance: Some Contemporary Issues* (Kuala Lumpur: IIUM, 2001)

Gul, Abdullah, *A Study of the Economic Co-operation Organization (ECO)* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994)

International Institute of Labour Studies, *Islam and a New International Economic Order: The Social Dimension* (Geneva: IILS, 1980)

Mannan, M. Abdul et. al., (eds.), *International Economic Relations from Islamic Perspective* (Jeddah: IRTI/IDB, 1992)

Nienhaus, Volker, *Economic Cooperation and Integration Among Islamic Countries: International Framework and Economic Problems* (Jeddah: IRTI/IDB, 1997)

Development Economics

Ahmad, Khurshid, *Islamic Approach to Development: Some Policy Implications* (Islamabad: IPS; 1994)

Ahmed, Ehsan (ed.), *Economic Growth and Human Resource Development in an Islamic Perspective* (Herndon, V.A.: IIIT, 1993)

Ahmed, Salahuddin, et al. (eds.), *Dimension of Development in Islam* (Dhaka: IERB, 1991)

Azam, Khan Muhammad, *Economics and Politics of Development : An Islamic Perspective.* (Karachi: Royal Book Co., 1988)

Chapra, M. Umer, *Islam and Economic Development* (Islamabad: IIIT, 1993)

El-Ghazali, Abdul Hamid, *Man is the Basis of the Islamic Strategy for Economic Analysis and Islamic Law* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994)

Ghazali, Aidit bin, *Development: An Islamic Perspective* (Selangor: Pelanduk Publications 1990).

Huq, Ataul, *Development and Distribution in Islam* (Selangor: Pelanduk Publications, 1993)

Kahf, Monzer, *Sustainable Development in the Muslim Countries* (Jeddah: IRTI/IDB, 2002)

Khan, M. Akram, *Rural Development Through Islamic Banks* (Leicester: The Islamic Foundation, 1994)

Mannan, M. Abdul, *Financing Development in Islam* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Sadeq, Abul Hasan, M. *Economic Development in Islam* (Selangor: Pelanduk Publications, 1991)

Sadeq, Abul Hasan, M. et al., (eds.), *Development and Finance in Islam* (Selangor: IIUM, 1991)

Sadeq, Abul Hasan, M. *Financing Economic Development: Islamic and Mainstream Approaches* (Selangor: Longman Malaysia, 1992)

Salih, Siddig Abdelmageed, *The Challenges of Poverty Alleviation in IDB Member Countries* (Jeddah: IDB, 1999)

Economic Thought

Ghaznafar, S.M., *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics* (London: Routledge Curzon, 2003)

Islahi, Abdul Azim, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988)

Islahi, Abdul Azim, *Economic Thought of Ibn Al-Qayyim* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1984)

Khan, M. Akram, *Economic Teachings of Prophet Muhammad (s.m.)* (Islamabad: IIIE & IPS, 1989)

Oreibi, Misbah (ed.), *Contribution of Islamic Thought to Modern Economics* (Herndon, V. A: IIIT, 1998)

Rana, Irfan Mahmud, *Economic System under Omar the Great* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1970)

Sadeq, Abul Hasan, *M.* and Aidit bin Ghazali, (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor: Longman Malaysia, 1992)

Government

Ahmed, Ehsan (ed.), *Role of Private and Public Sectors in Economic Development in an Islamic Perspective* (Herndon, V.A.: IIIT, 1996)

Chowdhury, Masudul Alam, *The Principles of Islamic Political Economy* (London: Macmillan Press, 1992).

Gulaid, Mahmoud Awaleh, *Effects of Islamic Laws and Institutions on Land Tenure with Special Reference to Some Muslim Countries* (Jeddah: IRTI/IDB, 1990)

Iqbal, Munawar (ed.) *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Leicester: The Islamic Foundation, 1988)

Iqbal, Munawar and Tariqullah Khan, *Financing Public Expenditure: An Islamic Perspective* (Jeddah: IRTI/IDB, 2002)

Ibn Taimiya, *Public Duties in Islam,* tr: Muhtar Holland (Leicester: The Islamic Foundation, 1982)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 1996)

Zaman, Hasanuz S.M., *Economic Function of an Islamic State: the Early Experience* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991)

Ziadeh, Nicola, *Al-Hisba and al-Muhasib in Islam* (Beirut: Catholic Press, 1962)

Miscellaneous

Gambling, Trevor and Rifat Ahmed Abdul Karim, *Business and Accounting Ethics in Islam* (London: Mansell Publishing, 1991).

Iqbal, Munawar (ed.) *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty* (Leicester: The Islamic Foundation, 2002).

Johansen, Baber, *The Islamic Law on Land Tax and Rent* (London: Croom Helm, 1988)

Mannan, M. Abdul, *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1984)

Mannan, M. Abdul, *Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Awqaf in Bangladesh* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995)

Molla, Rafiqul Islam et al., (eds.), *Frontiers and Mechanics of Islamic Economics* (Sokoto, Nigera: University of Sokoto, 1988)

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981)

Panahi, M. Hossain, *Theory and Application of Islamic Economy: A Case Study of Iran* (Madison: The University of Wisconsin, 1987)

Royal Academy for Islamic Civilization Research, *Problems of Research in Islamic Economics* (Amman: Al-Albait Foundation, 1987)

Siddiqi, M. Nejatullah, *Teaching Economics in Islamic Perspective* (Jeddah: CRIE, King Abdulaziz University, 1996)

Taleghani, Ayatallah Syyid Mahmud, *Islam and Ownership,* tr.: Ahmad Jabbari and Furhang Rajnee, (Lexington: Mazda Publishers, 1985)

Abbreviations

AMSS = American Muslim Social Scientists
BIIT = Bangladesh Institute of Islamic Thought
CRIE = Centre for Research in Islamic Economics
IDB = Islamic Development Bank
IERB = Islamic Economics Research Bureau
IIIE = International Institute of Islamic Economics
IIIT = International Institute of Islamic Thought
IIUM = International Islamic University Malaysia
IPS = Institute of Policy Studies
IRTI = Islamic Research and Training Institute
PIDE = Pakistan Institute of Development Economics

ইসলামী ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান

বিগত চার দশকের বেশী সময় ধরে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী চেতনা ও জীবনবোধের যে পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সেসব দেশে সুদের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রত্যক্ষ ও কার্যকর তৎপরতার বহি:প্রকাশের মাধ্যমে। ঐসব দেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান। এর ফলে ইসলামী জীবনাদর্শের কালজয়ী রূপেরই বহিঃপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক অব্যাহতভাবে আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণের পথিকৃৎ ছিলেন সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী। এর জন্যে উপযুক্ত কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও সনাতনী ব্যাংকের বিপরীতে সাফল্যের সম্ভাবনা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. এম. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী ও ড. এম. উমার চাপরা। এছাড়া কয়েকজন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বও তাঁদের মেধা, শ্রম ও প্রভাব দিয়ে সহযোগিতা করে আসছেন বলিষ্ঠভাবে। এঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় মিশরের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ড. আহমদ আবদুল আজীজ আল-নাজ্জারের। তাঁর পরেই রয়েছেন ড. যাকী বাদাউয়ী ও ড. সামী হাসান হামুদ। তাছাড়া রয়েছেন সউদী আরবের রাজপরিবারের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য প্রিন্স মুহাম্মদ আল-ফয়সাল আল-সউদ এবং দাল্লাহ আল-বারাকা গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ সালেহ আবদুল্লাহ কামেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিশ্বের অন্ততঃ পঁচিশটিরও বেশী দেশে আলাদাভাবে অথবা যুগপৎ প্রিন্স ফয়সাল ও শেখ সালেহ কামেলের প্রচেষ্টায় ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠানের সাফল্য দেখে উৎসাহিত হয়েছেন অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমরাও। তাদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় সেসব দেশেও ধীরে ধীরে একটি দুটি করে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দুঃখের বিষয়, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানের নাম অধিকাংশেরই অজানা। সেই সীমাবদ্ধতা দূর করার উদ্দেশ্যে মুসলিম ও অমুসলিম মিলিয়ে ৪৭টি দেশের প্রায় তিন শয়ের মতো ইসলামী ব্যাংক, বীমা ও অনুরূপ

ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানের একটা তালিকা এখানে সন্নিবেশ করা হলো। [দ্রষ্টব্যঃ সারণী-৩] তবে এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। কারণ এই তালিকা তৈরীর পরও বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে যেগুলোর তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

একই সাথে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্যেরও একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। সারণী -১ হতে আরব বিশ্বে যতগুলো সুদী ও ইসলামী ব্যাংক চালু রয়েছে সেগুলোর শীর্ষস্থানীয় একশত ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পেরেছে তা সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

সারণী-১

একশটি শীর্ষ আরব ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান, ১৯৯১

[মোট সম্পদ (র‍্যাংক-১) ও মূলধনের (র‍্যাংক-২) বিচারে]

দেশ	ব্যাংক	র‍্যাংক-১	র‍্যাংক-২
সউদী আরব	আল-রাজহী ব্যাংকিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন	১১	৭
মিশর	ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক	৩৪	৪০
ইউ.এ.ই	দুবাই ইসলামী ব্যাংক	৪৭	৫১
তিউনিসিয়া	বাইত এত-তামওয়ীল আল-সাউদী আল-তিউনিসি	-	৬৩
কাতার	কাতার ইসলামী ব্যাংক	৬৩	৫৭
জর্দান	জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট	৭০	৯২

উৎস : Top 100 Arab Banks, *Al- Iktissad wa Al-Aamal*, দুবাই, সেপ্টেম্বর ১৯৯২

উপরের সারণী হতে দেখা যাচ্ছে সউদী আরবের আল-রাজহী ব্যাংকিং এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন মোট সম্পদের বিচারে (র‍্যাংক-১) ১১শ ও মোট মূলধনের (র‍্যাংক-২) বিচারে ৭ম স্থান অধিকার করেছে। এরপরেই রয়েছে মিশরের ফয়সল ইসলামী ব্যাংক। র‍্যাংক-১ অনুসারে এর অবস্থান ৩৪তম এবং র‍্যাংক-২ অনুসারে ৪০তম।

অনুরূপভাবে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় গুরুত্ব বিচারে সুদী ও ইসলামী ব্যাংকগুলো কি অবস্থানে রয়েছে তারও একটা আকর্ষণীয় চিত্র পাওয়া যাবে সারণী-২ হতে।

এই সারণী হতে দেখা যাচ্ছে মোট সম্পদ ও মূলধনের বিচারে কাতারে সে দেশের সকল ধরনের ব্যাংকের মধ্যে কাতার ইসলামী ব্যাংক শীর্ষ স্থানটির প্রায় কাছাকাছি রয়েছে। এর পরেই রয়েছে জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট। এই ব্যাংকটি জর্দানের সকল ধরনের ব্যাংকের মধ্যে র‍্যাংক-১ অনুসারে ৩য় এবং র‍্যাংক-২ অনুসারে ৪র্থ স্থানে রয়েছে। সুদী ব্যাংকগুলোর মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের এই অবস্থান নিঃসন্দেহে মর্যাদাপূর্ণ ও গৌরবময়।

সারণী-২

ইসলামী ব্যাংকের জাতীয় গুরুত্ব, ১৯৯১

[মোট সম্পদ (র‍্যাংক-১) ও মূলধনের (র‍্যাংক-২) বিচারে]

দেশ	ব্যাংক	র‍্যাংক-১	র‍্যাংক-২
কাতার	কাতার ইসলামী ব্যাংক	৩	২
জর্দান	জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট	৩	৪
সউদী আরব	আল-রাজহী ব্যাংকিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন	৪	২
মিশর	ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক	৬	৭
তিউনিসিয়া	বাইত এত-তামওয়ীল আল-সউদী আল-তিউনিসি		
ইউ.এ.ই	দুবাই ইসলামী ব্যাংক	৭	৯

উৎস : Top 100 Arab Banks, *Al- Iktissad wa Al-Aamal*, দুবাই, সেপ্টেম্বর ১৯৯২

পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই পর্যায়ক্রমে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু হয়। প্রথম পর্যয়ে ১৯৭৯ সালে দেশের উন্নয়নধর্মী ও বিশেষ ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটিশানগুলো এর আওতায় আনা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দেশীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ জানুয়ারী, ১৯৮১ হতে ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সালের মধ্যে সুদমুক্তকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় আসে। ১৯৮৫ সালে ৩০শে জুন সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থার সুদমুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অনুসারে প্রথম পর্যায়ের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সারণী ৩-এ ক-গ্রুপভুক্ত করে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাংকগুলোকে খ-গ্রুপভুক্ত, তৃতীয় পর্যায়ের ব্যাংকগুলোকে গ-গ্রুপ এবং পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলোকে ঘ-গ্রুপের আওতায় দেখানো হয়েছে।

ইরানের সামগ্রিক ব্যাংকিং কাঠামোরই ইসলামীকরণ করা হয়েছে ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোরভাবে এর পরিচালনা ও তদারকী করছে। সুদানের ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হচ্ছে প্রধানত: লাভ-লোকসানের অংশীদারী নীতির ভিত্তিতে। ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রধানতঃ গ্রামীণ পর্যায়ের এবং ক্ষুদ্র আকারের। ব্যাংকগুলো সে দেশে ব্যাপক জনসমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছে। সাফল্যের বিচারে মুসলিম দেশসমূহের এসব ব্যাংক নিজ নিজ দেশের সুদী ব্যাংকসমূহের তুলনায় কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। বরং প্রতিযোগিতায় কোন কোন ক্ষেত্রে স্ব স্ব দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে শীর্ষ স্থানটি অধিকার করে রয়েছে। বাংলাদেশ তার অন্যতম উদাহরণ। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড স্বীয় যোগ্যতা বলেই একাধিকবার দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে। (দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং* শীর্ষক প্রবন্ধ।)

সারণী-৩
ইসলামী ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
ক. মুসলিম দেশসমূহ		
১. আফগানিস্তান	ইসলামিক ব্যাংক আফগানিস্তান	১৯৯৩
২. আলজিরিয়া	ব্যাংক আল-বারাকা দ্য আলজেরি	১৯৯১
৩. আলবেনিয়া	আরব ইসলামিক ব্যাংক অব আলবেনিয়া	১৯৯৪
৪. ইরাক	ইসলামিক ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১৯৯৩
৫. ইরান	ব্যাংক মিল্লি ইরান	১৯৭৯
	ব্যাংক কেশাভারজি	১৯৭৯
	ব্যাংক মাছ্কান ইরান	১৯৭৯
	ব্যাংক সাদারাত ইরান (পূর্বের ব্যাংক সাদারাত ভা মাদান)	১৯৭৯
	ব্যাংক সিপাহ	১৯৭৯
	ব্যাংক তিজারাত, তেহরান	
৬. ইন্দোনেশিয়া	ব্যাংক মুয়ামালাত ইন্দোনেশিয়া	১৯৯২
	বিপিআর আমানাহ উম্মাহ	
	বিপিআর আমানাহ রব্বানিয়াহ	-
	বিপিআর আর্থা কারিমাহ ইরসায়াদী	-
	বিপিআর বাবুস সালাম	-
	বিপিআর বায়তু নিয়াজা ইনসানি	-
	বিপিআর বায়তুর বেরকাহ্ জেমাদানা	-
	বিপিআর বাইতুর রিদ্দাহ	-
	বিপিআর রেকাহ আমল সেজাহতেরা	-
	বিপিআর বিনা আমওয়ানুল হাসানাহ	-
	বিপিআর দানা মারধাতিল্লাহ	-
	বিপিআর দানা তিজারাহ	-
	বিপিআর হারেউকাত	-
	বিপিআর হার্তা ইনসান কারিমাহ	-
	বিপিআর ইখওয়ানুল উম্মাহ	-
	বিপিআর ইনতি রাক্কাত	-
	বিপিআর মারজিরিজকি বাহাগিয়া	-
	বিপিআর কিরাদাহ	-
	বিপিআর শরীয়াহ সালেহ আর্থা	-

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	বিপিআর শরীয়াহ্ বানগুন দরাজ্জাত ওয়ারযা বিপিআর শরীয়াহ্ মেনতারি বিপিআর উসওয়াতুন হাসানাহ্	- - -
৭. কাজাখস্তান	আল-বারাকা কাজাখস্তান ইন্টারন্যাশন্যাল কমার্শিয়াল ব্যাংক ন্যাশন্যাল ইসলামিক ব্যাংক	১৯৯১
৮. কাতার	ইসলামিক এক্সচেঞ্জ এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী কাতার কাতার ইসলামিক ব্যাংক কাতার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক আল-জাযিরা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮০ ১৯৮৩ ১৯৮৩ ১৯৯০ -
৯. কিবরিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব কিবরিজ	১৯৮২
১০. কুয়েত	কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, সাফাত ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউস	১৯৭৭ ১৯৮৮
১১. গাম্বিয়া	ইসলামিক ব্যাংক অব গাম্বিয়া	১৯৮৪
১২. গিনি	ব্যাংক ইসলামিক দ্যা গিনি মাছারাফ ফয়সাল আল-ইসলামী ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৩ ১৯৮৪ ১৯৮৪
১৩. জর্দান	জর্দান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ, আম্মান ন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক জর্দান ফাইন্যান্স হাউস, আম্মান বাইত আল্-মাল্ সেভিংস এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৭৮ ১৯৮১ ১৯৮৮ ১৯৮৮ ১৯৮৮
১৪. জিবুতি	ব্যাংক আল-বারাকা জিবুতি	১৯৯০
১৫. তিউনিসিয়া	বাইত এত-তামওয়ীল আল্-সউদী আল্-তিউনিসি	১৯৮৩
১৬. তুরস্ক	ফয়সাল ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন আল-বারাকা টার্কিস ফাইন্যান্স হাউস টার্কিশ-কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস ফয়সাল ফরেন ট্রেড এ্যান্ড মার্কেটিং কোম্পানী ফয়সাল রিয়াল এস্টেট কনস্ট্রাকশান এ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী	১৯৮৫ ১৯৮৯ ১৯৮৯ - -

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
১৭. নাইজার	ব্যাংক ইসলামিক দ্য নাইজার	১৯৮৩
	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব নাইজার	১৯৮৪
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
১৮. পাকিস্তান (ক)	ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট	১৯৭৯
	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান	১৯৭৯
	হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৯৭৯
	স্মল বিজিনেস ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৯৭৯
	দি ব্যাংকার্স ইকুইটি লিমিটেড	১৯৭৯
(খ)	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৯৭৯
	ইসলামিক মুদারাবা কোম্পানী	১৯৮০
	মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৮৩
	ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	এ্যালায়েড ব্যাংক অব পাকিস্তান লিমিটেড	১৯৮৩
	এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৮৩
	আশকারী কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	ব্যাংক অব খাইবার	১৯৮৩
	ব্যাংক অব পাঞ্জাব	১৯৮৩
	দোহা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	ফেডারেল ব্যাংক অব কোঅপারেটিভস	১৯৮৩
	এমিরেটস ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল	১৯৮৩
	হাবিব ক্রেডিট এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	ইনডাজ ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ পাকিস্তান	১৯৮৩
	ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৯৮৩
	মাশরিক ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	মেহরান ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	মেট্রোপলিটান ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কর্পোরেশন	১৯৮৩
	পাক-কুয়েত ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড	১৯৮৩
	পাক-লিবিয়া হোল্ডিং কোম্পানী লিমিটেড	১৯৮৩
	প্রাইম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	প্রুডেন্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩
	পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল কোঅপারেটিভ ব্যাংক লিঃ	১৯৮৩
(গ)	রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৯৮৫
	এ বি এন আমরো ব্যাংক	১৯৮৫
	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক	১৯৮৫
	এ. এন. জেড. গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক	১৯৮৫
	ব্যাংক অব আমেরিকা	১৯৮৫
	ব্যাংক অব টোকিও	১৯৮৫
	ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ	১৯৮৫
	বালোন ব্যাংক	১৯৮৫
	চেজ ম্যানহাট্টান ব্যাংক	১৯৮৫
	সিটি ব্যাংক	১৯৮৫
	ডয়েশ ব্যাংক	১৯৮৫
	হাবিব ব্যাংক এ.জি.জুরিখ	১৯৮৫
	হংকং ক্রেডিট এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন	১৯৮৫
	রূপালী ব্যাংক	১৯৮৫
	ফার্স্ট উওমেনস ব্যাংক লিঃ	১৯৮৫
	প্যান-আফ্রিকান ব্যাংক লিঃ	১৯৮৫
	সোসিয়েট জেনারেল দ্য ফ্রেন্স এ্যান্ড	১৯৮৫
	ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক	১৯৮৫
	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৯৮৫
(ঘ)	আল-তওকিক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯০
	আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, লাহোর	১৯৯০
	সোনেরি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯১
	ব্যাংক আল-হাবিব	১৯৯১
	ইউনিয়ন ব্যাংক, ফয়সালাবাদ	১৯৯১
	আল-ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯১
	ইয়ুথ ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড প্রমোশান সোসাইটি	১৯৯২
১৯. প্যালেস্টাইন	ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্ট ব্যাংক	১৯৯৪
	দি ইসলামিক আরব ব্যাংক, গাজা	১৯৯৫
২০. বাংলাদেশ	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩
	আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (বর্তমানের দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড)	১৯৮৭
	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫
	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক	২০০১
	শামিল ব্যাংক অব বাহরাইন	২০০১
	এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট (এক্সিম) ব্যাংক অব বাংলাদেশ	২০০৪
	প্রাইম ব্যাংক (ইসলামী শাখা)	১৯৯৫
	সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লি. (ইসলামী শাখা)	২০০৩
	ইসলামিক ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	২০০১
	ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড	২০০০
	ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	২০০০
	ফার ইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	২০০১
	তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	২০০২
	প্রাইম লাইফ ইন্স্যুরেন্স (ইসলামী শাখা)	২০০১
	পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স (ইসলামী শাখা)	২০০১
	রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স (ইসলামী শাখা)	২০০২
২১. বাহরাইন	বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, মানামা	১৯৭৯
	ফয়সাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক অব বাহরাইন	১৯৮১
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৩
	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব বাহরাইন	১৯৮৩
	শিরকাত আল-তাকাফুল আল্-ইসলামীয়া	১৯৮৩
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দ্য গালফ	১৯৮৪
	আল-বারাকা ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন	১৯৮৪
	ইসলামিক ট্রেডিং কোম্পানী	-
	গালফ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক	১৯৮৫
	ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স এ্যান্ড রি-ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৭
	আল-আমীন সিকিউরিটিজ কোম্পানী, মানামা	১৯৮৭
	আরব ইসলামী ব্যাংক	১৯৯০
	আল-তৌফিক কোম্পানী ফর ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	১৯৯০
	আল-গোসাইবী ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিঃ, মানামা	১৯৯৫
	ইসলামিক ব্যাংক বাহরাইন	১৯৯৫
	ফয়সাল সিকিউরিটিজ এ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	-
	ইসলামিক লিজিং কোম্পানী	-
২২. ব্রুনাই	পারবাদানন তাবুং আমানাহ ইসলাম ব্রুনাই	-
	ইসলামিক ব্যাংক অব ব্রুনাই বেরহাদ	১৯৯৩
	তাকাফুল (টি. এ. আই. বি.) সেনদিরিন বেরহাদ	-

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	তাকাফুল (আই. বি. বি.) সেনদিরিন বেরহাদ	-
২৩. মরক্কো	ব্যাংক আল-আক্বীদাহ	১৯৮৫
২৪. মালয়েশিয়া	লেমবাগা উরুসান দান তাবুং হাজী	১৯৬৩
	ব্যাংক ইসলাম মালয়েশিয়া বেরহাদ	১৯৮৩
	শিরকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া সেনদিরিন বেরহাদ	১৯৮৪
	দাল্লাহ আল-বারাকা মালয়েশিয়া	১৯৯১
	শিরকাত আল-ইজারা সেনদিরিয়ান বেরহাদ	১৯৯৪
	মালয়ান ব্যাংকিং বেরহাদ	-
	ব্যাংক কেরজাছামা রাকায়াত মালয়েশিয়া	১৯৯৪
	বি.আই. এম.বি. ইউনিট ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট বেরহাদ	-
	বি.আই.এম.বি. সিকিউরিটিজ সেনদিরিন বেরহাদ	-
২৫. মালি	মাছারাফ ফয়সাল আল - ইসলামী	১৯৯৪
২৬. মিশর	নাসের সোস্যাল ব্যাংক	১৯৭১
	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব ইজিপ্ট	১৯৭৭
	আরব ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, কায়রো	-
	ব্যাংক মিশর (ইসলামী শাখাসমূহ)	১৯৮০
	আরব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮০
	ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স	-
	এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, কায়রো	১৯৮০
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং	-
	ইজিপসিয়ান সউদী ফাইন্যান্স ব্যাংক	১৯৮৩
	আল-সালাম ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৮
২৭. মৌরিতানিয়া	ব্যাংক ইসলামিক আল - বারাকা মৌরিতানিয়ান	১৯৮৫
২৮. লেবানন	আল-বারাকা ব্যাংক, বৈরুত	-
২৯. সউদী আরব	ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	১৯৭৫
	ইসলামী আরব ইনস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৭৯
	আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী	১৯৮২
	আল-রাজহী ব্যাংক এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন	১৯৮৪
৩০. সংযুক্ত আরব আমীরাত	দুবাই ইসলামিক ব্যাংক	১৯৭৭
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব দি গালফ, শারজাহ	১৯৮০
	আবু ধাবী ইসলামী ব্যাংক	-
	ইসলামিক আরব ইনসূরেন্স কোম্পানী	-

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
৩১. সেনেগাল	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩
	ব্যাংক ইসলামিক দ্য সেনেগাল	১৯৮৪
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
	মাছারাফ ফয়সাল আল-ইসলামী	-
৩২. সুদান	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সুদান	১৯৭৭
	ইসলামিক ইনস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৭৯
	এগ্রিকালচারাল ব্যাংক অব সুদান	-
	আল-বারাকা ব্যাংক, খার্তুম	১৯৮৩
	সুদানীজ ইসলামিক ব্যাংক	১৯৮৩
	আল-শামিল ইসলামী ব্যাংক	১৯৮৩
	ইসলামিক কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	-
	ইসলামিক ব্যাংক ফর ওয়েস্টার্ন সুদান	১৯৮৩
	ব্যাংক অব খার্তুম গ্রুপ	১৯৮৩
	আল-তাদামন ইসলামিক ব্যাংক	-
	আল-বারাকা ইনস্যুরেন্স কোম্পানী	১৯৮৪
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
	ব্লু নাইল ব্যাংক	-
	সিটি ব্যাংক	-
	কোঅপারেটিভ ইসলামিক ব্যাংক ফর ডেভেলপমেন্ট	-
	এল-নাইল ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	-
	ফারমার্স ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড রুরাল	-
	ডেভেলপমেন্ট	-
	হাবিব ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড রুরাল	-
	ডেভেলপমেন্ট	-
	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	-
	তাদামন ইসলামিক কোম্পানী ফর এগ্রিকালচারাল	-
	ডেভেলপমেন্ট লি:	
	তাদামন ইসলামিক কোম্পানী ফর ট্রেড এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট	-
	তাদামন এক্সচেঞ্জ এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস	-
	ইসলামিক ট্রেডিং সার্ভিসেস কোম্পানী	-
	ফয়সাল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী	-
	ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী	-
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	-
	ন্যাশনাল ব্যাংক অব সুদান	-

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	-
	ওমদুরমান ন্যাশনাল ব্যাংক	-
	আল-সাফা ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ক্রেডিট ব্যাংক	-
	সউদী সুদানীজ ব্যাংক	-
	মাশরিক ব্যাংক	-
	সুদানীজ ফ্রেন্স ব্যাংক	-
	সুদানীজ এস্টেট ব্যাংক	-
	সুদান কমার্শিয়াল ব্যাংক	-
	সুদানীজ সেভিংস ব্যাংক	-
	ওয়ার্কারস ন্যাশনাল ব্যাংক	-
খ. অমুসলিম দেশসমূহ		
১. আর্জেন্টিনা	ইসলামিক প্যান আমেরিকান ব্যাংক	-
২. জার্মানী	আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, ফ্রাংকফুর্ট	-
৩. ডেনমার্ক	ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক অব ডেনমার্ক	১৯৮৩
৪. থাইল্যান্ড	এ্যারাবিয়ান-থাই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী	১৯৮৩
৫. দক্ষিণ আফ্রিকা	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৮
	আল-বারাকা ব্যাংক লিমিটেড, ডারবান	১৯৮৮
৬. ফিলিপাইন	আমানাহ ব্যাংক, জামবোয়াংগো	১৯৮২
৭. বাহামা	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী অব গালফ	১৯৭৭
	দার আল-মাল আল্-ইসলামী	১৯৮০
	আফ্রিকান-আমেরিকান ইসলামিক ব্যাংক	-
	ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেডিং লিমিটেড	-
	ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক, বাহামা	১৯৮৩
	ইসলামিক তাকাফুল এ্যান্ড রি-তাকাফুল কোম্পানী	১৯৮৩
৮. ভারত	আল-আমীন ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট কোম্পনী	১৯৮৬
	আল-বারাকা ফাইন্যান্স হাউজ, মুম্বাই	১৯৯১
	ইত্তেফাক ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, মুম্বাই	-
	ফালাহ্ ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, মুম্বাই	-
	আমানাহ ব্যাংক, ব্যাঙ্গালোর	-
৯. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	দার আল-মাল ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস	-
	আল-বারাকা ব্যাংকর্কপ, টেক্সাস	১৯৮৭
	আল-বারাকা ব্যাংকর্কপ, ক্যালিফোর্নিয়া	১৯৮৭
	আল-আমীন ব্যাংকর্কপ, শিকাগো	১৯৮৯

দেশের নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
১০. যুক্তরাজ্য	আল-রাজহী কোম্পানী ফর ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট	১৯৮০
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮২
	ইসলামিক ফাইন্যান্স হাউজ	১৯৮২
	ফার্স্ট ইন্টারেস্ট-ফ্রি ফাইন্যান্স কনসর্টিয়াম	১৯৮২
	মাছারাফ ফয়সাল আল-ইসলামী	১৯৮২
	আরব ইনসুরেন্স কোম্পানী	১৯৮২
	দাল্লাহ আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৩
	আল-বারাকা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৯৮৪
	তাকাফুল. ইউ.কে. লিমিটেড	১৯৯৫
	উম্মাহ ফাইন্যান্স হাউস	-
১১. লিখেনস্টাইন	আরিনকো আরব ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	
	আই বি এস ফাইন্যান্স	
১২. লুক্সেমবার্গ	ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং	১৯৭৮
	ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানী	১৯৮৩
	ফয়সাল হোল্ডিং, লুক্সেমবার্গ	-
১৩. শ্রীলংকা	সেরেনদীপ ব্যাংক লিমিটেড	-
১৪. সাইপ্রাস	ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক অব সাইপ্রাস	১৯৮২
	কিবরিজ ইসলামী ব্যাংক, লেফকোসা, নিকোশিয়া	-
১৫. সুইজারল্যান্ড	শরীয়াহ ইনভেসমেন্ট সার্ভিসেস	১৯৮০
	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী	১৯৮৪
	দার আল-মাল আল-ইসলামী	১৯৮৪
	ফয়সাল ফাইন্যান্স সুইজারল্যান্ড	১৯৯০
	তাকওয়া ব্যাংক	-

'-' = প্রতিষ্ঠার বছর জানা যায় নি।

সারণীটি তৈরী করতে প্রভূত সহায়তা পেয়েছি আমার প্রাক্তন ছাত্র জনাব আবদুল আউয়াল সরকারের (যুগ্ম পরিচালক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা) তৈরী তথ্যপঞ্জী হতে। উপরন্তু M. Fahim Khan (ed.) *Islamic Financial Institutions* (Jeddah; IRTI/IDB, 1995) এবং *Bankers' Almanac* থেকেও যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।

পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে ইসলাম সমগ্র বিশ্বে এক নব জাগরণের সূচনা করেছে। এর বিপরীতে পুঁজিবাদ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তুমুল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন তার রণকৌশল পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্র তো ইতিমধ্যেই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। যেমন আকস্মিক তার আবির্ভাব তেমনি আকস্মিক তার তিরোভাব। যেসব দেশ এখনও সমাজতন্ত্রের দাবীদার তারা বহুবার সংশোধনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে পুঁজিবাদের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে দিয়েছে। অপর দিকে আজ দেশে দেশে দিকে দিকে ইসলামী আন্দোলনের সবুজ ঝান্ডা উড়ছে। বহু দেশ আজ ইসলামের নামেই রাষ্ট্রপতাকা উড্ডীন করেছে। যেসব দেশে একদা ইসলামী জীবনাদর্শ চর্চা নিষিদ্ধ ছিলো, ছিলো অপাংক্তেয়, সেসব দেশে ইসলাম আজ শুধু অগ্রসরমান শক্তিই নয়, বরং তারা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের অচলায়তন ভেঙে নতুন জীবনের ডাক দিচ্ছে। সেজন্যেই *Economist*-এর মতো পত্রিকা বেসামাল হয়ে ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছে। অর্থনীতির আলোচনা বাদ দিয়ে 'ইসলাম ঠেকাও' জিগির তুলেছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুঁজিবাদের চিন্তাশীল নেতারা গত শতাব্দীতেই বলেছে- "পুঁজিবাদের মুকাবিলায় আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ইসলাম।" স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মতো লোকেরা বলছেন শ্রেণী দ্বন্দ্ব (Class struggle) নয়, সভ্যতার সংঘর্ষই (Clash of Civilization) ইতিহাসের ধ্রুব সত্য। পুঁজিবাদী সভ্যতার মুকাবিলায় ইসলামী সভ্যতা তার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে কেন ইসলামকে তাদের এত ভয়, তাদের গলদগুলো কি, এবং তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো কোথায় তা আজ ভালভাবে জানা প্রয়োজন। এই আলোচনায় সেই চেষ্টাই করা হয়েছে।

উদ্ভব ও বিকাশ

ইসলামের পূর্ণ রূপলাভ ঘটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিশ্বের কালজয়ী আদর্শপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আমলে, তাঁর মদীনার জীবনে। ইসলামী সমাজদর্শন তথা জীবন বিধানের ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। আল-কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইজমা ও ক্বিয়াস অর্থাৎ ইজতিহাদের মাধ্যমে এই জীবন ব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত গতিধারায় বহমান থাকবে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদমের স্রষ্টা আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধানের মধ্যেই যেমন রয়েছে তার জন্যে শান্তি ও পূর্ণতা তেমনি রয়েছে সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল।

এরই বিপরীতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা তাদের নিজেদের মনগড়া মতবাদ ও জীবন বিধানের প্রেসক্রিপসান দিয়ে পৃথিবীতে যে অশান্তি, ধ্বংস, হানাহানি ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার একমাত্র তুলনা তারা নিজেরাই। পুঁজিবাদের ইতিহাস শোষণ-নিপীড়ন, অন্যায় যুদ্ধ ও সংঘাতের ইতিহাস। পুঁজিবাদের দর্শন চরম ভোগবাদী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দর্শন। পুঁজিবাদের প্রাথমিক উন্মেষ ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপে। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর ক্রমবিকাশের ধারায় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পুরোহিতদের সাথে যোগসাজসে রাজতন্ত্র হয়ে ওঠে চরম শোষণতন্ত্র ও একই সাথে পীড়নবাদী শাসনব্যবস্থা। ফ্রান্সে ভূমিবাদীদের প্রভাব মিলিয়ে না যেতেই প্রথমে ইংল্যান্ডে ও পরে সমগ্র ইউরোপে বাণিজ্যবাদ বা মার্কেন্টাইলিজমের বিকাশ ঘটে। এদের মূল কথা ছিলো বেশী করে রপ্তানী করো, প্রাপ্য অর্থ সোনাদানায় বুঝে নাও আর গোটা দুনিয়ার সম্পদ এনে জড়ো করো নিজের দেশে। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলো দুনিয়ার সেরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৃটেন। পুঁজিবাদের বীজ নিহিত ছিলো এসব কর্মকান্ডের মধ্যেই। সেটি আরও উচ্চকিত ও প্রবল হয় শিল্প বিপ্লবের ফলে। এ সময়েই রচিত হলো পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির কালজয়ী গ্রন্থ-*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (১৭৭৬)।

শিল্প বিপ্লবের ফলে উপনিবেশবাদ আরও জাঁকিয়ে বসে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কার ও শিল্প উৎপাদনের ক্রমবিকাশমান কলাকৌশলকে বেনিয়ারা নিজেদের স্বার্থে ব্যাপক ও নির্দয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। এরই ফসল শিল্প বিপ্লব। একই সাথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হলো "খাও, দাও আর ফূর্তি করো" এই ভোগবাদী দর্শন দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক ও ইতর বস্তুবাদ হয়ে পড়লো সমাজ দর্শনের ভিত। ভোগবাদী জীবন ও বস্তুবাদের সমন্বয়ের আগুনে ঘি ঢালার কাজটি সম্পন্ন করলো অবাধ ও নিরংকুশ ব্যক্তি মালিকানা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা। প্রথম দিকে চার্চের পুরোহিতরা কিছুটা বাধার সৃষ্টি করতে চাইলেও তাদের সে চেষ্টা রাজন্যবর্গ ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চাপে স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। এরই সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হলো মানবতার অস্তিত্ববিনাশী ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ভোগে চরম বাধাসৃষ্টিকারী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। পুঁজিবাদ এভাবেই তার শক্তিমত্তা ও দাপট বৃদ্ধি করে চললো। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ দিয়ে তার শুরু। ক্রমে শিল্প পুঁজি, বিনিয়োগ পুঁজি ইত্যাদি পর্যায় পেরিয়ে সে পৌঁচেছে বহুজাতিক পুঁজির বিশাল বাজারে। এ বাজার তারই রচিত, বিশ্বকে শোষণের জন্যে তারই উদ্ভাবিত কৌশল। এর অপ্রতিহত গতি ও সাফল্যকে ধরে রাখতে পুঁজিবাদের উদ্ভাবিত সর্বশেষ কৌশল হলো বিশ্বায়ন (Globalization) ও উদারীকরণ (Liberalization)।

জার্মান ইহুদী কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) ভাগ্যের অম্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম হয়ে একসময়ে পৌঁছে যান পুঁজিবাদের তৎকালীন সবচেয়ে বড় ধ্বজাধারী দেশ ইংল্যান্ডে। সেদেশে তখন রবার্ট ওয়েন, থমাস হজকিন্স, সিডনী ওয়েব, চার্লস

ফুরিয়ার, সেন্ট সাইমন, লুই ব্লাঁ, জেরেমি বেনথামের মতো ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট, হবসন ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো গিল্ড সোসালিস্ট ও পিগুর মতো গণদ্রব্য সরবরাহ করার প্রবক্তাদের আলোচনা ও লেখালেখির ফলে বিদগ্ধ মহলে সমাজতন্ত্র নিয়ে বেশ উত্তেজনা ছিলো। এই পটভূমিতেই কার্ল মার্কস দেখলেন শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট শ্রমিকদের বেদনাবিধুর বিপর্যস্ত মানবেতর জীবন যাপন। এরই সমাধানের জন্যে তিনি গ্রহণ করলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তত্ত্ব, ডাক দিলেন শ্রেণী সংগ্রামের। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Das Kapital* (১৮৬৭) এই সময়েই রচিত। তাঁর Theory of Surplus Value এই পটভূমিতেই উদ্ভাবিত। তাঁর প্রস্তাবিত শ্রেণী সংগ্রামের পথ ধরে পরবর্তীকালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির মাধ্যমে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রেণী শত্রু উৎখাত ও নির্মূলের নামে কত লক্ষ বনি আদম যে বন্দুকের নলের শিকার হয়েছিলো, কত লক্ষ লোক ভিটেমাটি হতে উচ্ছিন্ন হয়ে সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিলো তার হদিস মিলবে না কোনো দিনই। সমাজতন্ত্র যখন একটা সংগঠিত শক্তির রূপ নেওয়া শুরু করে তখন তার কার্যাবলীর মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ, সর্বহারার একনায়কত্বের (Dictatorship of the Proletariat) নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জনগণের মালিকানার নামে উৎপাদনের উপায় উপকরণে রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার এবং ধর্মের আমূল উচ্ছেদ।

মার্ক্স-এঙ্গেলসের পুঁথিগত ও নিজস্ব ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত জীবন দর্শনকে অভ্রান্ত মনে করে পরবর্তীকালে লেনিন-স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভ রাশিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো সেই ক্ষত কাটিয়ে উঠতে নবতর কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়েছে, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। এমনকি তুরুপের তাস হিসেবে *গ্লাসনস্ত* ও *পেরেসত্রয়কাকে* ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কমরেড মিখাইল গরবাচেভ। তাতে বরং আগুনে পেট্রোল ঢালারই কাজ হয়েছিলো। খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো পৃথিবীর দ্বিতীয় পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন।

রাশিয়ার প্ররোচনায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালানো হয়েছিলো পূর্ব ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ড হাঙ্গেরী রুমানিয়া বুলগেরিয়া আলবেনিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায়। এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে রাশিয়া সরাসরি সামরিক মদদ যুগিয়েছে, ট্যাংকের বহর পাঠিয়েছে। একই চেষ্টা চললো কিউবায়, আফ্রিকার কঙ্গো এ্যাঙ্গোলা নামিবিয়া ও ইথিওপিয়ায়। এ ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো চীনেও। কিন্তু তাত্ত্বিক নীতি ও আদর্শ পরিবর্তিত হতে শুরু করলো বাস্তবের কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে যেয়ে। শতাব্দী প্রাচীন *কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টো* (১৮৪৮) ততদিনে লক্ষ লক্ষ লোককে কবরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আরও লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে ভিটেমাটি ছাড়া করেছে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে যে কত লোক লাপাত্তা হয়েছে তার কোনো লেখাজোখা নেই। যাহোক, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার বাসনায় সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশগুলো তাদের পূর্বঘোষিত আদর্শের পরিবর্তন

ও পরিমার্জনা করে পুঁজিবাদের সাথে অপোষরফার নীতি গ্রহণ করে। এ উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যুগোশ্লাভিয়া। পরবর্তীকালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সোস্যালিস্ট বা কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত সোস্যালিজম বা কম্যুনিজমের নতুন ব্যাখ্যা তাই বহুক্ষেত্রেই ছিলো মার্কসবাদের সাথে দারুণ অসংগতিপূর্ণ।

চীনও এর ব্যতিক্রম নয়। কমরেড মাও ঝে দং লং মার্চের মাধ্যমে চীনে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার ডাক দেন। রেড গার্ড আন্দোলনের নামে শুদ্ধি অভিযান চালিয়ে বিরোধী মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের মেথরের স্তরে নামিয়ে আনেন। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের হত্যা ও পাইকারী হারে বন্দী করেন। উইঘুরদের (চীনে মুসলমানদের উইঘুর ও হুই বলা হয়) নাম-নিশানা মুছে ফেলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সীমাহীন রক্তপাত ধ্বংসযজ্ঞ নির্যাতন প্রতারণা ও ছলনার ইতিহাস। চীন তার ব্যতিক্রম হবে কি করে? কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাওয়ের মৃত্যুর পর পরই দেং জিয়াও পিং মার্কিন ও ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের উদার আমন্ত্রণ জানালেন, উপকূলবর্তী সকল এলাকা মুক্ত অঞ্চল ঘোষিত হলো; কাজের মান ও পরিমাণ অনুযায়ী উঁচুহারে বেতন নির্ধারিত হলো। এমনকি গণকমিউনকেও (People's Commune) ঢেলে সাজানো হলো। আর কিউবার মহান (!) ফিদেল ক্যাস্ট্রো কর্তৃক খ্রীষ্টান বিশ্বের ধর্মগুরু পোপকে তার দেশে আমন্ত্রণ জানাবার কথা কে না জানে?

সমাজতন্ত্র একদা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে তার আপাতঃমধুর মোহনীয় বাক্যজালে প্রভাবিত করেছিলো। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ এই ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকেছিলো। লিবিয়া মিশর সুদান সিরিয়া ও ইরাক তার প্রকৃষ্ট নজীর। তবে এরা পুঁজিবাদকেও পুরো বর্জন করতে পারেনি। সেজন্যেই এদের ব্যবহারিক দর্শনে একই সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গ জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এই মিশ্রণ তাদের জন্যে কোনো দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ বা মঙ্গল বয়ে আনেনি। বরং শেষ অবধি অনেক দেশেরই মোহভঙ্গ ঘটেছে। কিন্তু ততদিনে সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে।

এখানেই শেষ নয়। পরাভূত মৃতপ্রায় সমাজতন্ত্রীরা পুনরায় তাদের থাবার লুকোনো নখর বের করতে শুরু করেছে। নানা নতুন নামে জনগণকে আবার ধোঁকা দেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতারণা ও ছলনার নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করছে। তাদের পুরনো দোসররাও বসে নেই। তারাও নিমকহালালীর পরিচয় দেবার জন্যে নেতাদের জন্মদিন, স্মরণ উৎসব, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুশীলন ইত্যাকার নানা উপলক্ষ্য বের করে সেমিনার সিম্পোজিয়াম সমাবেশ আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করে চলেছে। উপরন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার আদর্শ অনুসারী, মুক্তবুদ্ধি চর্চার একনিষ্ঠ কর্মী, সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি চটকদার শব্দের লোভনীয় টোপ ফেলে গেঁথে তুলছে নামের লোভে স্বীকৃতির মোহে পাগলপারা তরুণ-তরুণীদের। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া সেসব ছাত্র-ছাত্রীরাই এদের পাতা

ফাঁদে পা ফেলে যারা নিজেদের অতীত ঐতিহ্যকে জানে না, জানার চেষ্টাও করেনি। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও এদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এরাই নব্য সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের সহজ শিকার।

মৌলিক পার্থক্য

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের তুলনা করতে হলে অর্থাৎ এদের বিভিন্নতা বুঝতে হলে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যও জানতে হবে।

পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী
২. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন
৩. অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা
৪. উন্মুক্ত বা অবাধ অর্থনীতি
৫. ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা
৬. লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা
৭. গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন
৮. পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী।

সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
২. ধর্মের উৎখাত
৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার উচ্ছেদ
৪. নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি
৫. রাষ্ট্রীয় নিরংকুশ মালিকানা
৬. চিন্তার পরাধীনতা
৭. সর্বহারার নামে একদলীয় শাসন
৮. তাত্ত্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হলেও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদী।

ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. তৌহিদভিত্তিক বিশ্বাস
২. আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা
৩. শরীয়াহ অনুমোদিত ব্যক্তিস্বাধীনতা
৪. পরিমিতির অর্থনীতি
৫. শরীয়াহ স্বীকৃত মালিকানা
৬. সুস্থ চিন্তার স্বাধীনতা
৭. শুরাভিত্তিক শাসন
৮. পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী।

এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতেই উল্লেখিত তিনটি মতাদর্শের তথা জীবন দর্শনের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। প্রমাণ করা যেতে পারে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের এবং আগামী শতাব্দীতে তার অনিবার্য বিজয়ের কথা। নীচে পর্যায়ক্রমে বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণের ও সেসবের তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

১. জীবন দর্শনের পার্থক্য

ইসলাম, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে পার্থিব জীবন আচরণে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পুঁজিবাদের জীবন দর্শন হলো জড়বাদী বা বস্তুবাদী জীবন দর্শন যেখানে এই নশ্বর জীবন পুরোপুরি ভোগের বস্তু বলে স্বীকৃত। ভোগের পরিমাণও লাগামহীন ও অপরিমেয়। সেখানে প্রকাশ্যে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি ঘোষিত না হলেও বাস্তবতা তাই-ই। ভোগের সামগ্রী আহরণের জন্যে, ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থতার জন্যে হালাল-হারাম বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করা হয় না। জীবনটা যেহেতু স্বল্প দিনের এবং কবে তার সমাপ্তি তা জানা নেই তাই কত অল্প সময়ে কত বেশী ভোগ করা যায়, কত কম ব্যয়ে কত বেশী অর্থ উপার্জন করা যায় সেই প্রতিযোগিতাই এখানে তীব্র। আসলেই জড়বাদী সভ্যতায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এত দূর পৌঁচেছে, পরিবারে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে, যৌনজীবনের যে ভয়াবহ ও কদর্য বিকৃতি ঘটেছে তা শুধু রাসূল (স.) পূর্ব যুগের আরবের সমাজের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পুঁজিবাদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিতার মতো জঘন্য অপরাধকেও রাজনৈতিক স্বার্থে আইন করে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। জার্মান দার্শনিক হেগেলের বিরোধমূলক বিকাশের ধারণার দ্বারা মার্ক্স বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো - থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস। আজকের সত্যই থিসিস। এই থিসিসের বিরুদ্ধে তৈরী হয় এন্টিথিসিস। দুয়ের সংঘর্ষে উদ্ভব হয় সিনথিসিসের। এই সিনথিসিসই পরবর্তীতে পুনরায় থিসিস হয়ে দাঁড়ায়। হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক বিকাশের ধারণাকেই কার্ল মার্ক্স তাঁর সমাজবিকাশের ধারণা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। মার্ক্স ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। সেই প্রয়াসে তিনি বারবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ শ্রেণী সংগ্রামকে। তাঁর মতে পৃথিবীর বিকাশ হয়েছে বিবর্তনবাদ ও শক্তিবাদের মধ্য দিয়ে। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) বিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) ও প্রকৃতির নির্বাচন (Natural Selection) বা যোগ্যতমেরই বেঁচে থাকার অধিকার তত্ত্ব (Survival of the Fittest) মার্ক্সকে তাঁর মতবাদে আস্থাশীল হতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিলো। ফলে তিনি ও তাঁর অনুসারীরা জোরে-শোরেই বললেন— পৃথিবীর ইতিহাসে শক্তিমানরাই শুধু টিকে থাকবে, অন্যেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের মতে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হয়েছে।

মার্কসের বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী মতবাদের ভিত হিসেবে কাজ করেছিলো ডারউইনের *On the Origin of Species* (১৮৫৯) বইটি। দুর্ভাগ্যবশতঃ খোদ ডারউইন আজ আর আগের মত বিজ্ঞানী মহলে আদৃত নন। তাঁর বিবর্তনবাদ ও প্রকৃতির নির্বাচন তত্ত্ব পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তির কাছে মার খেয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন তেলাপোকা লক্ষ বছর ধরে টিকে রয়েছে, কিন্তু শক্তিধর অতিকায় সব প্রাণী পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আজও যাচ্ছে। এর পিছনে যত না তাদের নিজেদের দুর্বলতা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী মানুষের অবিবেচনা ও অর্থগৃধ্নুতা। অনুরূপভাবে কবে কখন ও কি প্রক্রিয়ায় বানর মানুষের রূপান্তরিত হয় তার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় নি। কেনই বা বানর ও গরিলা এখন মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে না তারও কোনো ব্যাখ্যা নেই।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে প্রাণিবিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, অনুজীব বিজ্ঞানী, এমনকি গণিতবিদরা পর্যন্ত বিবর্তনবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং এর অসারতা ও যুক্তিহীনতাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। এদের তালিকা বেশ দীর্ঘ; এখানে শুধু কয়েকজনের নাম উল্লেখই যথেষ্ট হবে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন Louis Bounoure, Lemonie, W. R. Bird, Falmmarion, D. Dewar, S. H. Slusher, Agassiz, E. Schute, P. S. Moorhead, M. M. Kaplan, Arthur Koestler প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রাণরসায়নবিদ J. Monod-এর মতে বিবর্তন দূরে থাক, পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনাই প্রকৃতপক্ষে শূন্য। এইচ. এম. মরিস বলেন, পরীক্ষামূলকভাবেও বিবর্তনবাদ প্রমাণ করা সম্ভব নয় (H.M. Morris, *Evolution in Turmoil,* San Diego, California: Creation Life Publishers, 1982)। প্রখ্যাত অষ্ট্রেলীয় অনুজীব বিজ্ঞানী মাইকেল ডেনটনের মতে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে ডারউইনের তত্ত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব (Michael Denton, *Evolution: A Theory in Crisis,* London: Burnett Books, 1985, p. 323)। জেনেটিক কোডের আবিষ্কারক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার ফ্রান্সিস ক্রীকের মতে ডারউইনের তত্ত্বের মধ্যে শুধু অসংগতিই নেই, অসম্ভবতাও বিপুল (Sir Francis Crick, *Life Itself,* New York; Simon & Schuster, 1971, p. 71)।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, বিবর্তনবাদ ও শক্তিবাদের তত্ত্বের উপর নির্মিত মার্ক্স-এঙ্গেলসের শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব। পৃথিবীর সৃষ্টি হতে ধ্বংস পর্যন্ত সময়কে মার্ক্স পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন। পর্বগুলো হলো : (ক) আদিম সমাজ, (খ) দাসভিত্তিক সমাজ, (গ) সামন্ত সমাজ, (ঘ) পুঁজিবাদী সমাজ এবং (ঙ) সমাজতান্ত্রিক সমাজ তথা সাম্যবাদ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কট্টর অনুসারীরা সর্বশেষ এই ভ্রান্ত মতাদর্শের জন্যে অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় ধরে চেষ্টা চালিয়ে রক্তের স্রোত ও অত্যাচারের বিভীষিকা সৃষ্টি করেও মার্ক্সের ঈপ্সিত সমাজ দর্শন কায়েমে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

জীবন দর্শন সম্পর্কে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান ইসলামের। ইসলামী জীবন দর্শনের মূল ভিত্তিই হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহই তার রব এবং তিনিই তার ইহকাল ও পরকালের জীবনের মালিক। ইহকালের এই জীবনে চলার পথ দেখাবার জন্যে তিনি যুগে যুগে নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মাধ্যমে মানব জাতির কাছে পাঠিয়েছেন হেদায়েতের বাণী। সে আলোকে চললে জীবন হবে সত্য ও সুন্দরের, কল্যাণ ও মঙ্গলের। পরিণামে আখিরাতে তার জন্যে রয়েছে অনন্ত পুরস্কার ও শান্তি। এরই ব্যত্যয় ঘটাতে মরদুদ শয়তান সদা সচেষ্ট। তার কুমন্ত্রণা ও কুপ্ররোচনার ফলেই চলে আসছে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব, হক ও বাতিলের লড়াই। এই লড়াইয়ে জিততে হলে যে অস্ত্র চাই সে অস্ত্র ঈমানের। সে অস্ত্র কেমন হবে, তার লড়াইয়ের শক্তি কতটা হবে তা জানবার একমাত্র উপায় নবী-রাসূলদের অনুসরণ করা। শুধু তাই নয়, ইহকালের কৃতকর্মের ফল অবধারিত রয়েছে আখিরাতে এই বোধ ও বিশ্বাস যার মধ্যে, যে জনসমষ্টির মধ্যে যত বেশী তারাই তত বেশী সফলকাম। মুমিনের কাছে এই দুনিয়া পরকালের জন্যে কর্ষণক্ষেত্রে। সুতরাং, তার কাছে জড়বাদীতা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি গ্রহণযোগ্য নয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। বরং আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাঁরই প্রেরিত ঐশী বাণী আল-কুরআন ও রাসূলে করীমের (স.) সুন্নাহ হলো তার জীবনের ধ্রুবতারা।

২. ধর্মীয় বিশ্বাস

পুঁজিবাদী জীবন দর্শনে ধর্মের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। ধর্ম সেখানে সাক্ষী গোপালের মতো। রাষ্ট্র বা সরকার যতটা আচরণের সুযোগ দেয় ব্যক্তি ততটাই মাত্র ধর্মীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের সুযোগ বা স্বাধীনতা পায়। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান ইহুদী বৌদ্ধ জৈন হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম ইসলামের মতো জীবনের সকল ক্ষেত্রের নিয়ামক শক্তি নয়, সর্বব্যাপী এবং সার্বিকও নয়। বিভিন্ন ধর্মে ব্যক্তিজীবন, এমনকি পারিবারিক জীবনের আচরণবিধি থাকলেও সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনদর্শন কারোরই নেই। অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক – কোনো ক্ষেত্রেই ঐসব ধর্মের কোনো নীতি-নির্দেশনা নেই, কোনো বিধি-বিধান নেই। পুঁজিবাদে সব ধর্মই সহঅবস্থান করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা না ঘটিয়ে, পুঁজিবাদী উৎপাদন চক্রের কোনোও রকম বিঘ্ন না ঘটিয়ে বা রাষ্ট্র ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের কোনো আশংকা সৃষ্টি না করে ব্যক্তি তার আপন গৃহে অথবা উপাসনালয়ে ধর্মচর্চা করতে পারে। সেটুকু স্বাধীনতা তার আছে।

পুঁজিবাদে ধর্ম আপোষরফা করেছে রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে। মধ্যযুগে এক সময়ে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা প্রবল হয়ে উঠলে রাজন্যবর্গ এর বিরোধিতা শুরু করে। খোদ ইংল্যান্ডেই গীর্জার সাথে বিরোধ বাধে রাজার। ফলে ক্যাথলিক রাজা হয়ে যান প্রটেস্ট্যান্ট। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে বহুধা বিভক্তি বিদ্যমান তার মূল নিহিত এই বিরোধের মধ্যেই। এক সময়ে অবশ্য আপোষরফা হয়। সেজন্যে পরবর্তীকালে বলা শুরু হয় - পোপকে তার প্রাপ্য দাও, রাজাকে দাও তার প্রাপ্য। বৌদ্ধ হিন্দু বা জৈন ধর্মে যখন রাজা প্রবল হয়ে ওঠে তাদের ধর্ম তখন রাজধর্ম রূপে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু রাজার পতনের সাথে

সাথে ধর্মের সেই গুরুত্ব লোপ পায়। যাজকরা তখন হয়ে পড়ে পরের অনুগ্রহভাজন। রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকাই আর থাকে না।

শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুঁজির গুরুত্ব যখন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে রাষ্ট্র ক্ষমতার উপরও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। পুঁজিই হয়ে ওঠে সমাজে প্রধান নিয়ামক শক্তি। এই প্রেক্ষিতে ধর্মের সাথে আপোষরফার জন্যে তৈরী হলো নতুন মতবাদ-ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম। সেক্যুলারিজমের মৌখিক বক্তব্য যাই হোক, বাস্তব অবস্থা হলো ধর্মহীনতা। রাষ্ট্রের অনুমোদন ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার মাত্রার উপরেই ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতায় রূপান্তরিত হওয়া না-হওয়া সম্পূর্ণতঃ নির্ভরশীল। ধর্মীয় শিক্ষার পরিবেশ রুদ্ধ করে, ধর্মাচরণের সুযোগ সংকীর্ণ করে, ধর্মীয় নেতাদের সামাজিক গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাস করে, ধর্মীয় নীতিমালার উপর পুঁজিবাদের নিয়ম ও স্বার্থের প্রাধান্য চাপিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যক্তিকে আসলে ধর্মহীনতা তথা স্বেচ্ছাচারিতার দিকেই ক্রমান্বয়ে ঠেলে দেয়।

সেক্যুলারতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খোদায়ী আইন ও বিচার তথা জীবন বিধানকে অস্বীকার এবং পরকালের অনন্ত জীবনের শান্তি/শাস্তি সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের কারণে গোটা পাশ্চাত্য তথা বিশ্বের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় উপযোগবাদ (Utilitarianism) এবং ভোগবাদকে (Epicurism) তাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। যথেচ্ছ ভোগলিপ্সা ও ধর্মীয় বিশ্বাসসঞ্জাত নৈতিকতা বিবর্জিত হওয়ার কারণে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার প্রতি নজর ফেরালে এ সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বছর পাঁচেক পূর্বের এক পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় সেখানে প্রতি বারো সেকেণ্ডে একটি অপরাধ, প্রতি ঘণ্টায় একটি খুন, প্রতি পঁচিশ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি ডাকাতি এবং প্রতি মিনিটে একটি গাড়ী চুরির ঘটনা ঘটে। সেদেশে ভীতিপ্রদ অপরাধ বৃদ্ধির হার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের চেয়ে তেরো গুণেরও বেশী (*দৈনিক সংগ্রাম,* ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৯)। নতুন শতাব্দীতে এই হার যে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পশ্চিমা শক্তি মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণের জন্যে শুধু প্রভাবিত করাই নয়, রীতিমতো চাপ দিয়ে যাচ্ছে। এর অন্তর্নিহিত আসল উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে জানা ও তা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এর ফলে ধীরে ধীরে দেশের কিশোর ও যুবসমাজ ধর্মীয় জীবনদর্শন ও তার বিধিবিধান জানার ও তা যথাযথ পালনের সুযোগ হারাতে থাকবে। এসব দেশে খ্রীষ্টবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্যে পশ্চিমারা কোটি কোটি ডলার খরচ করছে। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পথ রুদ্ধ করার সকল অপতৎপরতায় এরা নেপথ্যে থেকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্ম সম্পন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান

দেশেও তারা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। এদেরই অপতৎপরতার ফলে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে খ্রীষ্টানরা সংখ্যাসাম্য অর্জন করতে চলেছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষায় এরা সিদ্ধহস্ত। মুখে সেক্যুলারিজমের কথা বললেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকসহ গীর্জার ও নবদীক্ষিত খ্রীষ্টানদের সামান্যতম ক্ষতি হলে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সকল রাজধানী হতে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। এরাই ইউরোপে কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় প্রয়াস বরদাশত করতে রাজী নয়, বরং সুকৌশলে তা নস্যাৎ করার চেষ্টা চালায়।

সমাজতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর (Corner stone) হলো নাস্তিক্যবাদ (Atheism)। মার্ক্স-এঙ্গেলস গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন ধর্মই সব অনর্থের মূল। ধর্মের কারণেই সমাজে শোষণ দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। তাই এর বিনাশ ও উচ্ছেদ অপরিহার্য। মার্ক্সের বিশ্বাস এক অর্থে অংশতঃ ঠিক ছিলো। কারণ তিনি যে শোষণ-নির্যাতন লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা ছিলো খ্রীষ্ট সমাজে চার্চের পীড়ন ও শোষণ। সমগ্র ইউরোপে তো বটেই, আফ্রিকাতেও চার্চের অত্যাচার ছিলো নির্মম। সেই সাথে রাজ-ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় এই অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়ন হয়েছিলো দীর্ঘস্থায়ী, সর্বব্যাপী ও সমাজে আমূল প্রোথিত। ভারতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিলাসী জীবন এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অচ্ছুতদের উপর তাদের অত্যাচারের কাহিনী ইউরোপে অজানা ছিলো না। কিন্তু মার্ক্সের যা অজানা ছিলো তা হলো ইসলামী সমাজদর্শন। মার্ক্স-এঙ্গেলস ইসলাম সম্বন্ধে আদৌ পড়াশুনা করেছেন বা এর সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ধর্ম বলতে তিনি চোখের সামনে যা দেখেছিলেন তারই ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিলো ধর্মকে উৎপাটনের কর্মসূচী ও নাস্তিক্যবাদের ফর্মূলা। এ মতবাদে ধর্মকে মনে করা হয় শোষণ ও যুলুমের হাতিয়ার। আফিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে ধর্মকে। তাই এর উৎখাতের জন্যে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নেতারা বদ্ধপরিকর। এমনকি এজন্যে তারা শঠতা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিতে কসুর করেনি।

লেনিনের নেতৃত্বে জার নিকোলাইকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের সময়ে বলশেভিক পার্টির প্রয়োজন ছিলো মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সহযোগিতা ও সমর্থনলাভ। মুসলমানদের ধর্মাচরণ এবং জানমালের নিরাপত্তার ওয়াদা দিয়েছিলেন স্বয়ং লেনিন। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অন্যতম আপ্তবাক্য হলো-লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রতারণা শঠতা ছলনা হত্যা কোনো কিছুই অন্যায় নয়। তাই গোটা মধ্য এশিয়ায় প্রথমে ইসলামের সাথে সহঅবস্থান, পরে ব্যক্তিজীবনে ইসলামী অনুশাসনের সীমিত অনুসরণের অনুমতি এবং শেষ অবধি ইসলামের উৎখাতের জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হয়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চীন আলবেনিয়া বুলগেরিয়া পোল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়ায়। এতসবের পরেও সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা ইসলামের অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। তার প্রমাণ দিয়ে চলেছে চেচনিয়া দাগেস্তান কসোভো বসনিয়া-হারজেগোভিনা, চীনের হোনান গানসু জিনজিয়াং সিচুয়ান প্রভৃতি জনপদ।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্মকে উচ্ছেদের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয় তার একটা ক্ষুদ্র নমুনা হলঃ

> "যতটা নৃশংসভাবে কোকন্দ অধিকৃত ও ভস্মীভূত হয় তা মধ্যযুগীয় দেশজয়ী মঙ্গোলেরও (অর্থাৎ চেঙ্গিস খান) বিস্ময়ের কারণ ছিলো। চৌদ্দ হাজারেরও বেশী লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মসজিদ ও ধর্মস্থানের অবমাননা চরমে পৌঁছে। মুসলিম সাহিত্যের সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অবরোধের ফলে স্থানীয় অধিবাসীগণের পক্ষে পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাদের মজুদ খাদ্যশস্য এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ তার অধিকাংশই কমিউনিস্টগণ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। নয় লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়"।
> (Lt. Col. P.T. Elerton-*In the Heart of Asia*, 1926, p. 153)

সোভিয়েত রাশিয়ার তথা বলশেভিক পার্টির ইসলামবিরোধী আগ্রাসন প্রতিরোধের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন মুস্তাফা চোকাইয়েভ (কোকন্দ), জাবিদ খাঁ (আজারবাইজান), শামিল বেগ (দাগেস্তান) প্রমুখ। এই উদ্দেশ্যে নানা সংগঠনও গড়ে ওঠে। মুস্তাফা চোকাইয়েভ গড়ে তোলেন *মিল্লিজে তুর্কীস্তান বিরলিগা*, জামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা গড়ে তোলেন *বাসমাকী আন্দোলন*, মুরাদ ওরাজভ *তুর্কমেন আজতলিগি*, আবদুর রহীম বাইয়েভ ওয়ালী ইবরাহীমভ *মিল্লি ফিরকা* এবং মুহাম্মদ আমীন ও ফতেহ আলী খাঁ *আজারবাইজান প্রতিরোধ আন্দোলন*। অন্যান্য যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্যে বিদেশ সফর করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আয়ায ইসহাকী, জাকি ওয়ালিদী তুকতারভ, সাদরী মাকসুদী আরসাল, মির্যা বালা কুলতুক, হামদী ওরলু, সাইয়ীদ শামিল, ইউসুফ আকচুরা, আলী মারদান বে তোপচিবাশী, ইসমাইল বে গ্যাসপিরিলি, আবু সাদ আহতেম ও সাইয়ীদ গিরাই আলকীন প্রমুখ বরেণ্য ও ত্যাগী ব্যক্তিত্ব।

ধর্ম তথা ইসলামকে সমূলে উৎখাতের জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার গৃহীত কর্মসূচীর ফলাফল জানা যাবে ড. হাসান জামানের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম হতে:*

> "১৯০৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় রাশিয়াতেই মসজিদের সংখ্যা ছিলো ৭,০০০। ১৯৪২ সালে ১৬ ই মে প্রকাশিত Soviet War News-এ দেখা যায় যে, সমগ্র রাশিয়াতে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১,৩১২-তে। ১৯১৭ সালে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিলো ৮০০। ১৯১৮ সালে এর একটিরও অস্তিত্ব ছিলো না। মসজিদসমেত এসব ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ, ক্লাব ও গুদামে পর্যবসিত করা হয়েছে।"
> (পৃ. ১৩)

সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের শঠতা ও প্রবঞ্চনার আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ককেশীয় মুসলমানরা ১৯১৭ সালে দাগেস্তান নামে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

করে। তুরস্ক, জার্মানী এমনকি রাশিয়াও এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে সার্বভৌম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বলশেভিক শাসনের সূচনাতেও দাগেস্তানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে। এমনকি ১৯২১ সালেও স্ট্যালিন দাগেস্তানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বলশেভিক পার্টির নীতি পরিবর্তিত হয়। শুরু হয় বিশ্বাসঘাতকতার নতুন ধারা। ফলশ্রুতিতে ১৯৩৭ সালে ককেশাস অঞ্চলে সংঘটিত হয় ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ অধ্যায়। লেনিনের উত্তরসূরীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দাগেস্তানকে সোভিয়েত শাসনের আওতায় নিয়ে আসে। এ জন্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় দশ লক্ষ মুসলমানকে, লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নির্বাসনে পাঠানো হয় সুদূর সাইবেরিয়ায়। পাইকারীভাবে হত্যা করা হয় বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের। ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় শত শত মসজিদ ও মাদরাসা।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও এ অত্যাচারের বিভীষিকা হতে রেহাই পায়নি। তবে ইহুদীদের সৌভাগ্য তারা দলে দলে দেশ ত্যাগ করে ইঙ্গ-মার্কিন তৎপরতায় প্রতিষ্ঠিত নতুন ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলে এসে আশ্রয় নেয়। খ্রীষ্টানদেরও বিরাট এক অংশ পশ্চিম ইউরোপে পাড়ি জমায়। দেশ ত্যাগের সুবিধা ছিলো না শুধু মুসলমানদের। তাছাড়া তারা জন্মভূমি ও স্বদেশ ছেড়ে আসার চেয়ে নিজেদের আজাদী রক্ষার লড়াইয়ে শহীদ হওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলো।

একই অবস্থা ঘটে মহাচীনেও। ইসলামের সঙ্গে চীনের মুসলমানদের সংযোগ বহু শতাব্দী প্রাচীন। হযরত মুহাম্মদের (স.) মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বেই ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টনে দেশের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এদেশে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মুসলমান বাস করে জিনজিয়াং (পূর্বের সিনকিয়াং) এলাকায়। এর আদি নাম ছিলো পূর্ব তুর্কিস্তান। এর পরেই রয়েছে সিচুয়ান, ইউনান এবং কানসু (বর্তমানে গানসু) ও শানসী। চীনা কম্যুনিস্টরা সর্বপ্রথম আঘাত হানে কানসু ও শানসী এলাকায়। মুসলমানরা এখানে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তখন প্রলোভন দেখিয়ে কম্যুনিস্টরা এ আন্দোলন ১৯৫০ সালে স্তিমিত করে দেয়। তারা খুব সতর্কতার সাথে মুসলিম নেতৃবৃন্দের নামে অপপ্রচার চালাতে থাকে। একই সাথে দ্বিতীয় জাতীয় কমিটিতে মা সুং তিং ও তা পু কোন্ নামে দুজন মুসলিম সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জিনজিয়াং কমিউনিস্ট দখলে আসে ১৯৪৯ সালে। বহু আলিম, মুসলিম রাজকর্মচারী ও নেতাকে বন্দী করা হয়। আহমদ জান, ইসহাক বেগ, লি সু বাং, চেং আন ফু, শাও শফ্, শাও চেং তান, আবদুল করীম আবাসভ, ডা. মাসুদ সাবেরী প্রমুখ গণ্যমান্য নেতাকে হত্যা করা হয়। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা দীর্ঘদিন ই মিং, আ হো মাইতি এবং শাই মুর নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে গেছে। ১৯৩৮ সালের হিসাব অনুযায়ী চীনে মুসলমানের সংখ্যা ছিলো পাঁচ কোটির কাছাকাছি, মসজিদের সংখা ছিলো ৪২,৩২১টি। সেই চীনেই কম্যুনিস্ট সরকার প্রদত্ত ১৯৫২ সালের তথ্য অনুযায়ী মুসলমানের সংখ্য এক কোটিরও

নীচে, মসজিদের সংখ্যা মাত্র ৪,০০০। মাত্র চৌদ্দ বছরে চার কোটি মুসলমান কোথায় হারিয়ে গেল? ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী লোকসংখ্যা তো বৃদ্ধি পাওয়ারই কথা ছিলো।

বুলগেরিয়ার কম্যুনিস্ট সরকার ১৯৫১ সালে সেদেশের ষাট হাজার মুসলমান পরিবারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের সে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। যুগোশ্লাভিয়ায়ও মুসলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাদের নেতাদের পাইকারী গ্রেফতার ও গুমখুন করা হয়। সকল পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশে প্রধান প্রধান দু-একটি মসজিদ রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে রেখে বাকী সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুসলমানদের আরবী ভাষার নাম পরিত্যাগে বাধ্য করা হয় জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির হীন উদ্দেশ্যে। কুরআন-হাদীস চর্চা দূরে থাক, শুধুমাত্র কুরআন শরীফ পড়াই ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজম ও সোস্যালিজমের পতন দশা শুরু হওয়া পর হতে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে! অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটেছে এসব দেশে।

ইসলামের অবস্থান এ দুয়ের বিপরীতে। ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সকল ক্ষেত্রেই ধর্মের অনুশাসন বাস্তবায়ন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত বিধি-নির্দেশ বাস্তবায়ন ইসলামের দাবী। এই লক্ষ্যেই নবী-রাসূলরা সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন। ব্যক্তি পূজা, মুর্তি পূজা, ইন্দ্রিয় পূজা সকল কিছুর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। মানুষ একমাত্র তার ইলাহ বা রব ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করবে না, আর কারো হুকুম মান্য করবে না এ শিক্ষা ইসলামের। মানুষের মনগড়া মতবাদ আসলেই তাগুতী মতবাদ। এ মতবাদ একটা-দুটো নয়, শত-সহস্র। এসবের কিছু অস্ত্রের জোরে, কিছু অর্থের জোরে, কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে আবার কিছু শঠতা বা চতুরতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে। খোদাদ্রোহীতা বা ধর্মের পূর্ণ উচ্ছেদ এরই আরেক চরম ও বিপরীত রূপ। কিন্তু এসবের পরিণাম হয়েছে নিদারুণ হতাশাব্যঞ্জক ও অমানবিক। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলে করীমের (স.) মাধ্যমে যে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে যে কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। ইসলামের দূতরা তাই যখনই যেদিকে গেছে মজলুম জনতা, তাগুতী ধর্মের পীড়নে ক্লিষ্ট জনতা, মনগড়া আইনের শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ জনতা তাদের সাদর আহ্বান জানিয়েছে। ইসলাম তাদের আশার বাণী শুনিয়েছে। তাদের আত্মাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-দেশ-কাল-পাত্র সব কিছুকেই দু পায়ে মাড়িয়ে আল্লাহই মহান ও সর্বশক্তিমান এবং মানুষ একমাত্র তার দাস, আর কারো নয় - এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্যেই ক্লিমোভিচ দু:খ করে বলেছেন- "আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমরা ইসলামের সাথে এঁটে উঠতে পারি না। ইসলামের দুদর্ম ধর্মবিশ্বাস বিরাট শক্তির পরিচায়ক"। (Klimovich-*Islam vs Tsarsky Rossi,* Moscow, 1936)

৩. ব্যক্তি স্বাধীনতা

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। পুঁজিবাদে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিরংকুশ; সমাজতন্ত্রে এই স্বাধীনতা অস্বীকৃত ও উপেক্ষিত। ইসলামে এই স্বাধীনতা শরীয়াহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থায় একজন লোকের নিজের খেয়াল-খুশী মতো যেকোন কিছুই করার স্বাধীনতা রয়েছে। তার এই স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে শুধু তারই তৈরী আইন অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পার্লামেন্ট অথবা স্বৈরাচারী শাসক, ক্ষেত্রবিশেষে সামরিক জান্তা। তার ভোগের পেয়ালা উপচে পড়লেও সে নিবৃত্ত না হলে দোষের কিছু নেই। শত সহস্র বনি আদম ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হলেও তার খাবার টেবিল বহুবিচিত্র পদে সজ্জিত ও ভরপুর থাকা চাই। শুধু ভোগই নয়, বিনিয়োগ, বন্টন, উৎপাদন পারিবারিক জীবন, সাংসারিক জীবন—সর্বত্রই তার এই স্বাধীনতা স্বীকৃত ও কাজে-কর্মে প্রতিফলিত। ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সমাজতন্ত্রের অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। ব্যক্তিকে সেখানে 'কথা বলার যন্ত্রের' চাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই-পরিবার, সমাজ, কর্মক্ষেত্র, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সবই রাষ্ট্র তথা পার্টি নিয়ন্ত্রিত। যতটুকু স্বাধীনতা পার্টি অনুমোদন করবে তার বেশী চাইবার অধিকার তার নেই। পার্টিই ঠিক করে দেবে তার আচরণ, কর্মক্ষেত্র, বিশ্বাস, এমনকি তার পরিবারও। এর ব্যত্যয় ঘটলো কি না তার তদারকী ও খোঁজ-খবর নেবার জন্যে রয়েছে গোয়েন্দা বাহিনী। সে বাহিনী এতই বিশাল, এতই ব্যাপক তার নেটওয়ার্ক যে সেখানে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে। পার্টি বসের, এলাকার কমরেড চীফের সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের সর্বপ্রধান বা একমাত্র ব্রত। তাইতো সুযোগ পেলেই তারা ছিটকে বেরিয়ে আসে প্রিয় স্বদেশ(?) হতে। এদের বিপুল সংখ্যক জীবন দিয়েছে বিদ্যুতায়িত কাঁটা তারের বেড়ায়, লুটিয়ে পড়েছে পাহারারত সেন্ট্রির গুলিতে। এর পরও সারা জীবন যাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের শিক্ষা পেয়েছে সেই শ্রেণী শত্রুর দেশে যেয়ে তারা আশ্রয় নেয়। সেই বার্লিন ওয়াল আজ আর নেই, কিন্তু তার রক্তাক্ত ক্ষত রয়ে গেছে হাজার হাজার পরিবারে। আজও রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে তারা আতঁকে ওঠে।

এর ভিন্ন একটা চিত্রও রয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যেটুকু সুযোগ এখন সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মক্কা, মস্কো ও বেইজিং এর নাগরিকেরা অর্জন করেছে এবং তার ফলে তাদের প্রাত্যহিক জীবন আচরণে যে পরিবর্তন এসেছে তা অভাবিত। যত দ্রুত তারা পুঁজিবাদী সভ্যতার ভোগবাদী জীবনকে গ্রহণ করেছে তা বিস্ময়কর। মেট্রোপলিস দুটোর যুবক-যুবতীরা নিউইর্য়ক শিকাগো লস এঞ্জেলস শহরের মতো ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপনের জন্যে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতায়ে নেমেছে। মদ জুয়া ডিসকো

নাচ ক্যাবারে পপ সঙ্গীত ম্যাকডোনাল্ডের ফাস্ট ফুড সফ্‌ট ড্রিংক্স হতে শুরু করে কালোবাজারী চোরাকারবারী ও বেশ্যাবৃত্তি কোনো কিছুই বাদ নেই। পাশ্চাত্যের উদ্দাম উচ্ছৃংখল ও নৈতিকতাহীন জীবনের অন্ধ অনুকরণে তারা মেতেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামেই। ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিময় জীবন তাদের কাছে অজ্ঞাত। তাদের কাছে তা তুলে ধরার সুযোগ ধ্বংস করেছে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মোড়লরাই।

ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামের দাবী খুবই যৌক্তিক। ইসলামে আল্লাহ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত অবাধে চলাফেরার, স্বাধীনভাবে সকল কর্মকান্ড পরিচালনার। এক্ষেত্রে তার নিয়ন্তা হবে তারই বিবেক, তার ধ্রুবতারা হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহ। বিবেক কখনোই মানুষকে অশুভ বা অন্যায়ের দিকে ধাবিত হতে রায় দেয় না। সেই রায় আরও সুন্দর, কল্যাণমুখী ও সমাজের জন্যে সর্বৈব মঙ্গলের হয়ে দাঁড়ায় যখন তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বান্দা যখন তার রবের রঙে রঙীন হয় তখন তার সমগ্র কর্মকান্ডই ওয়ে ওঠে পূতপবিত্র ও কল্যাণময়। শরীয়াহ মানুষের প্রবৃত্তিগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করে তার নিজের ও সমাজের কল্যাণই নিশ্চিত করে। এখানে না আছে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ, না আছে ব্যক্তি মানুষের মনগড়া আইনের নিগড়ে বন্দী হওয়ার আশংকা। ব্যক্তি এখানে না প্রবৃত্তির দাস, না এখানে অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা তাই একাধারে যেমন খুবই মূল্যবান তেমনি সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে তার ভূমিকা অসাধারণ।

৪. অর্থনৈতিক দর্শন

অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রেও আলোচ্য তিনটি মতবাদের মধ্যে চরম বিরোধ ও বৈপরীত্য বিদ্যমান। জড়বাদী জীবন দর্শনের অর্থনৈতিক মতাদর্শ পুরোপুরিই ভোগবাদী ও ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্খা নির্ভর। সমাজের কল্যাণ বা রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে গৌণ। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এই ইচ্ছারও রূপান্তর ঘটেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কিভাবে ভূমিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমে মার্কেন্ট্যাইলিজম, সংরক্ষণবাদ, অবাধ অর্থনীতি এবং অধুনা উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাজার অর্থনীতির নামে অবাধ ও অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরীতে রাষ্ট্রও উৎসাহ ও মদদ যুগিয়েছে। সেভাবেই তৈরী হয়েছে দেশের বিচার ও আইন কাঠামো। নিজ দেশের সম্পদ যখন পর্যাপ্ত মনে হয়নি তখন ছলে-বলে-কৌশলে অন্যের সম্পদ আহরণে তৎপর হয়েছে। কখনও এরা জোট বেধে চড়াও হয়েছে অন্যের উপর, কখনও বা একাকী প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল লুটে নিয়েছে। শুধু বাণিজ্যের নামেই পুঁজিবাদ যা করেছে ও করছে তা নজীরবিহীন। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর স্বার্থেই গড়ে উঠেছে World Bank। বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের জন্যে GATT, UNCTAD হতে উত্তরণ ঘটেছে WTO-তে। অসম প্রতিযোগিতা ও অসীম মুনাফার জের ধরে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভুত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এরাই অর্থনীতির নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুষ্টিমেয়

কয়েকটি পরিবার পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠানকে এরাই কুক্ষিগত করে রেখেছে। ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোয় বারবার আর্বিভাব হয়েছে মন্দার, কখনো তার রূপ হয়েছে মহামন্দার। পরিবর্তিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও তারা আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছে।

চরম ব্যক্তিস্বার্থপরতা, একচেটিয়া কারবার, অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের অভিলাষ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনে গুরুত্ব না দিয়ে বিলাস সামগ্রী উৎপাদন জোরদারের ফলশ্রুতিতে ১৯৩০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত হয়েছিলো মহামন্দা (Great Depression)। একদিকে হাজার হাজার টন গম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, ক্ষেতের ভুট্টা ক্ষেতেই পুড়েছে, আপেল-আঙ্গুর-পীচ-কমলা গাছতলাতেই পচেছে, অন্যদিকে নিরন্ন বুভুক্ষু লক্ষ লক্ষ নর-নারী কর্মহীন উপার্জনহীন ও চরমদারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থায় কাটিয়েছে। ব্যাংকের পর ব্যাংক লালবাতি জ্বালিয়েছে, কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সেই গভীর সংকট হতে উত্তরণের জন্যে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হয়েছে, পুঁজি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। অসহায় শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্যে ভাতা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সুদ পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি। সুদের মাধ্যমেই তার সকল লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু যে অপরিমেয় ক্ষতি করে সুদ তা পুষিয়ে নেবার বা তার প্রতিবিধানের কোনো উপায় নেই এই অর্থনীতিতে। পুঁজি বাজার, বিনোয়োগ, কর্মসংস্থান উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, মুনাফা সকল কিছুরই নেপথ্যে নির্ণয়াক ও নির্ধারক শক্তি সুদ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে রাষ্ট্র সুদের হার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেও তা সব সময়ে ফলপ্রসু হয় না। এর পরিণাম ফলও সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আসে না। নয়া অর্থনৈতিক মতবাদ বা কল্যাণ অর্থনীতির কথা বললেও মিল্টন ফ্রীডম্যান, ম্যাক্স ওয়েবার, গুনার মিরডাল, পল এন্থনী স্যামুয়েলসন, ডাবলিউ. ডাবলিউ. রষ্টো, আর্থার লুইস, টি. ডাবলিউ সুলজ, সাইমন কুজনেটস, জন কেনেথ গলব্রেথ অথবা অমর্ত্য সেন—কেউই পুঁজিবাদের অশুভ চক্রের খপ্পর হতে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বরং সকলেই একে ঘষে-মেজে নাট-বল্টু পাল্টিয়ে প্রকারান্তরে এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই সহায়তা করেছেন। একজনের ভুল প্রেসক্রিপসন অন্যজন শুধরে দিয়েছেন। ফন হায়েক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারী হস্তক্ষেপের ঘোরতর বিরোধিতা করলেও কেইনস, গলব্রেথরা এগিয়ে এসেছেন সরকারের হাতকেই শক্ত করতে। পুঁজিবাদের রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হয়ে গেলে তাকে আবার লাইনে তুলে দিয়ে সচল করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপরীতে অবস্থান সমাজতন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি। এর অপর নাম কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতি (Centrally Planned Economy)। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রই সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বলাই হয়ে থাকে, প্রলেতারিয়েতদের জন্যে নতুন অর্থনীতি বিনির্মাণ করা দরকার। আসলেই প্রলেতারিয়েতদের নিজেদের শ্রম ছাড়া বিক্রির জন্যে কিছুই থাকে না। কারণ অন্য সব কিছুই ইতিমধ্যে পার্টির দখলে চলে গেছে। তাই প্রকৃত অর্থেই তারা এখন সর্বহারা। সর্বহারার রাষ্ট্রের নামে পার্টির পক্ষে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কোনো দ্রব্য কি পরিমাণে কোথায় কখন এবং কিভাবে উৎপন্ন হবে। একইভাবে উৎপাদিত দ্রব্য কত মূল্যে কতখানি কোন্ জায়গায় কার মাধ্যমে বিক্রি হবে সে সিদ্ধান্তও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের। প্রলেতারিয়েতরা এবং পার্টির কমরেড ডিরেক্টর ও পলিটব্যুরোর সদস্যরা কতখানি ভোগ করবে তারও সিদ্ধান্ত দেয় সরকারই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অসকার লাঙ্গে বা জাঁ টিনবার্জেনের মতো অর্থনীতিবিদদের হাতেও এর পূর্ণতা আসেনি। খোলা বাজারে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে সমাজতন্ত্রে মূল্য নির্ধারিত হয়ে আসছে Trial and Error প্রক্রিয়ায়। ফলে কোনো দ্রব্যের সঠিক বা উচিৎ মূল্য কি হবে সে বিষয়ে সমাজতন্ত্রে কোনো সর্বসম্মত সমাধান নেই। বাজার অর্থনীতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তথা পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা সমাজতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই অবস্থা কিছুতেই কাঙ্খিত হতে পারে না। এতে জনগণের সার্বিক কল্যাণ অর্জিত হতে পারে না, পারেও নি। সোভিয়েত রাশিয়ার সুবিখ্যাত *সিজার্স ক্রাইসিস* কিংবা চীনের *গ্রেট লীপ ফরওয়ার্ড*-এর নেপথ্য কাহিনী যারা জানেন তাদের বিস্তারিত করে বলার দরকার নেই। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের নামে কৃষি জমি জবরদখলের পর যখন দেখা গেল উৎপাদনের পরিমাণ বিপ্লব পূর্বকালের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে, সৈন্য দিয়ে গ্রাম থেকে খাদ্য ছিনিয়ে এনেও শহরের অভাব পূরণ হচ্ছে না, লাল ফিতা ও পদক উপহার দিয়েও কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা যাচ্ছে না, বরং লাশের স্তূপ বাড়ছেই তখন কিচেন গার্ডেনের নামে ব্যাক্তিগত খামার গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হলো। চীন রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়া কিউবা পোল্যান্ড হাঙ্গেরী – কোনো দেশই এর ব্যতিক্রম নয়। আসলেই মানুষের স্বভাবধর্ম বা ফিতরাতকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে যাই-ই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই-ই পরিণামে বুমেরাং হয়ে আঘাত করেছে উদ্যোক্তাদেরকেই।

ইসলামের অবস্থান এ দুয়ের মাঝামাঝি। ইসলাম ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি আবার তার পায়ে শিকল পরিয়ে বেঁধেও রাখেনি। বরং *হিসবাহ* ও *হিজর*-এর দ্বারা ইসলামী সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নজরদারী করে; শরীয়াহর সীমা লংঘনকারীকে শাস্তি দেয়। ব্যক্তিকে শরীয়াহ অনুমোদিত উপায় অনুসরণ করে শরীয়াহর সীমার মধ্যেই উপায়-উপার্জন করতে এবং ভোগ ও ব্যয়কে সীমিত রাখতে বলে। রাষ্ট্র এখানে না *Laissez faire* নীতি অবলম্বন করে, না এই অর্থনীতির কর্মকান্ড Command নির্ভর, অর্থাৎ পুরোপুরি কেন্দ্রনিয়ন্ত্রিত। সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য অর্জন এই অর্থনীতি তথা জীবন দর্শনের অন্যতম দাবী। ব্যক্তির উৎপাদন ও

উপার্জনে সমাজের অধিকার এখানে স্বীকৃত। যাকাত ও উশর আদায় ছাড়াও *ইনফাক ফি সাবিল আল্লাহ* এই অর্থনীতির অন্যতম ভিত। সর্বক্ষেত্রে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জন পরিমিতির এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া আল-কুরআনে বলা হয়েছে- সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। আরও বলা হয়েছে- সম্পদশালীদের ধন-সম্পদে হক রয়েছে বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্তদের।

৫. সম্পদের মালিকানা

সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও তিনটি মতাদর্শের মধ্যে ঘোরতর পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদে ব্যক্তি তার অর্জিত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা ভোগ করে। এই সম্পত্তি সে ইচ্ছামতো ব্যবহার ও ব্যয় করতে পারে। চূড়ান্ত ভোগবিলাসের জন্যে ব্যক্তি তার সম্পদের পুরোটাই ব্যবহার করলে তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজনকে বঞ্চিত করে কুকুর-বিড়ালকে সম্পদ দিয়ে গেলেও বলার কেউ নেই। মৃতের সম্পদের ওয়ারিশ তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা পরিবারের সবাই নয়, বরং ব্যক্তি যার নামে উইল করে যাবে বা যাকে নোমিনী করবে সম্পদ সেই পাবে। অন্যথায় পাবে জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যা। এ ব্যবস্থা ইনসাফ ও ইহসানের বরখেলাপ।

সমাজতন্ত্রে সম্পদের উপর ব্যক্তির স্থায়ী মালিকানা ও উত্তরাধিকারিত্বের স্বীকৃতি নেই। সে যা ভোগ করছে তার মৃত্যুর পর সবই পুনরায় রাষ্ট্রের মালিকানায় চলে যাবে। তার স্ত্রী-পরিজনরা রাষ্ট্রের আনুকূল্য লাভের জন্যে নতুন করে আবেদন জানাবে। এ ব্যবস্থা মানবতা তথা ইনসাফ ও ইহসানবিরোধী। কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ঠেকে ঠেকে কিছু ছাড় দিলেও ঘর-বাড়ী বা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেই ছাড় প্রযোজ্য নয়। অবশ্য সমাজতন্ত্রের পতনের পর এখন রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোয় ব্যক্তিগত উদ্যোগেই স্বাধীন ব্যবসা করা যায়। হোটেল চালানো যায়। ব্যাংক ব্যালান্সের মালিক হওয়া যায়, বাড়ি-ঘরের মালিকও হওয়া যায়। চীনেও এখন একই অবস্থা বিরাজমান। সেখানে এখন দ্রুত শিল্পপতি গড়ে উঠছে, ব্যবসায়ের বিত্তে কোটিপতি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থায় ফিরে আসার জন্যে অগণিত মানুষকে জানমালের কি বিপুল খেসারতই না দিতে হয়েছে।

ইসলামে ব্যক্তি মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদের জিম্মাদার বা ট্রাস্টি। সে এই সম্পদ ভোগ-দখল করতে পারবে, ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু তার অপচয় ও অপব্যবহার করতে পারবে না। উপরন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তা বন্টিত হয়ে যাবে তার ওয়ারিশদের মধ্যে। অবশ্য ঋণ রেখে মারা গেলে তা সবার আগে পরিশোধিতব্য। ব্যক্তি ইচ্ছা করলে স্বজনদের মধ্যে বিশেষ কাউকেও সম্পত্তির অংশবিশেষ দান করতেও পারবে, তবে কোনোক্রমেই এক-তৃতীয়াংশের বেশী নয়। ব্যক্তি এখানে সম্পদের নিরংকুশ মালিক নয়, সে ব্যবহারকারী মাত্র। এই ধ্যান-ধারণা বা বোধ-বিশ্বাস জাগ্রত করা ও বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী জীবনাদর্শের লক্ষ্য। দুনিয়াজোড়া

যে হানাহানি ও রক্তপাত তার অধিকাংশের মূলে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা ও দখল নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ, সীমানা নিয়ে বিরোধ। সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি ইসলামের অনন্য অবদান। নারী শুধু তার পিতার সম্পত্তিরই অংশ পায় না, বিবাহিতা নারী স্বামীর সম্পত্তিরও অংশীদার। উপরন্তু সমাজসেবা ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করারও বিধান রয়েছে ইসলামে। জায়গা জমি ভোগ-দখলের অধিকার ও স্বাধীনতা না থাকলে যেমন উৎপাদন বাড়ে না, সমাজের অগ্রগতি ঘটে না তেমনি এর অবাধ, অসীম ও নিরংকুশ মালিকানা লাভের উদগ্র লালসা সমাজে রক্তপাত, জিঘাংসা ও সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। ইসলাম এর প্রতিবিধানের জন্যেই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে; সম্পত্তির মালিকানা, বন্টন ও উত্তরাধিকারিত্বের ক্ষেত্রে আদল ও ইহসানের যৌথ নীতি গ্রহণ করেছে।

৬. চিন্তার স্বাধীনতা

সমাজের অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যে চিন্তার স্বাধীনতা ও বিকাশের সুযোগ থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ নিজেই বারংবার আল-কুরআনে আহবান জানিয়েছেন তার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্যে, গবেষণার জন্যে। চিন্তাশীলদের আল্লাহ পছন্দ করেন। চিন্তার ক্ষেত্রে চাই বিবেকের শাসন, সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলের দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বোপরি সুস্থ মানসিকতা। পুঁজিবাদের ইতিহাসে চিন্তার স্বাধীনতার নামে যা ইচ্ছা বলার অবারিত সুযোগ রয়েছে, সমাজতন্ত্রে রয়েছে ঠিক তার উল্টোটা। সেখানে রাষ্ট্র, সরকার, পার্টি এবং সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের দর্শন নিয়ে কটূক্তি দূরে থাক, বিন্দুমাত্র সমালোচনাও সহ্য করা হয় না। সমালোচনার পুরস্কার বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির বা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী জীবন যাপন অথবা কারা অন্তরালে অনির্দিষ্টকালের জন্যে অন্তরীণ হওয়া। খুবই সৌভাগ্যবান হলে দেশের বাইরে নির্বাসিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ জোটে। কিন্তু সবাই সোলঝেনিৎসিন হওয়ার ভাগ্য নিয়ে আসে না। কারাজীবন হতে মুক্তির জন্যে আন্দ্রে শাখারভের মতো সৌভাগ্য সকলের হয় না। চিন্তার পার্থক্যের কারণেই নোবেল পুরস্কার পেয়েও প্রত্যাখ্যান করতে হয় বোরিস পাস্তারনাকের মতো সাহিত্যকদের। এর উল্টো চিত্রও আছে। সমাজতন্ত্রের বন্দনা করে গুণগান গাইলে, মহান লেলিন-স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভের জয়গাঁথা রচনা করলে, কুলাক বা গুলাগ নিধন ও বাশকিরীদের উচ্ছেদকে স্বাগত জানালে, চেচেন-ইংগুশদের ধ্বংস কামনা করলে, তুর্কী তাতারদের ভিটেমাটি হতে উচ্ছেদ সমাজতন্ত্রেরই মহান দায়িত্ব বলে সংগীত রচনা করলে অর্ডার অব লেনিনসহ নানা রাষ্ট্রীয় ভূষণ ও সম্মান তার পায়ে লুটোয়। অ-কবিও রাতারাতি সেরা কবি হয়ে যায়।

চিন্তার স্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদী বিশ্বে যেভাবে ইসলাম বিরোধিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় সেভাবে তার নিজেদের ধর্ম-খ্রীষ্টধর্মকে সমালোচিত হতে দেয় না। খোদ ইংল্যান্ডে খ্রীষ্টধর্ম ও যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ বা তীক্ষ্ণ সমালোচনা সে দেশের ব্লাসফেমী আইনে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেদেশেই ইসলামের জীবন

দর্শন ও পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী মুহাম্মদের (স.) জীবন নিয়ে *স্যাটানিক ভার্সেস* লিখলে মুরতাদ রুশদীর শাস্তি তো হয়ই না, বরং পুরস্কারের পাশাপাশি সরকারী নিরাপত্তা বা হেফাজত লাভের সৌভাগ্য জোটে। আল-কুরআনের শাশ্বত বিধানের অশোভন ও অরুচিকর সমালোচনা করলে, মুসলিম জীবনের মসীলিপ্ত ব্যঙ্গচিত্র আঁকলে বিদেশের সাহিত্য পুরস্কার জোটে, জোটে বিদেশের ইসলাম বিরোধীচক্রের সাদর আমন্ত্রণ, অভ্যর্থনা ও আশ্রয়। সে সম্মান হতে বাংলাদেশী ললনাও বঞ্চিত নয়।

অপরপক্ষে চিন্তার স্বাধীনতার কথা সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। স্বাধীন চিন্তা দূরে থাক, ক্ষমতাসীন সরকারের সমালোচনা দূরে থাক, লেনিন স্ট্যালিন ক্রুশ্চেভ ব্রেঝনেভ অথবা মাও ঝে দং, লিন পিয়াও, দেং জিয়াও পিং বা কিম ইল সুং এর জীবন নিয়ে বেফাঁস কথা বললে দশ বছর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাটানো মোটেই বিচিত্র নয়। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে পরিবর্তন যা এসেছে তা সেদেশের জনগণ বা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার ফসল হিসেবে নয়। সে পরিবর্তন এসেছে মুকাবিলার অসাধ্য অভ্যন্তরীণ সংকট ও অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার ও বাইরের দুনিয়ায় মিত্র অনুসন্ধানের স্বার্থে। সমাজতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে অকম্যুনিস্ট বিশ্বের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী (যারা নব্য মার্ক্সবাদী বলে সাধারণ্যে পরিচিত) হাল আমলে বেশ লেখালেখি করে চলেছেন । এই দলে রয়েছেন অসভালদো সানকেল, সেলসো ফূর্তাদো, পল ব্যারন, আন্দ্রেঁ গুন্দার ফ্রাক, সামির আমিন প্রমুখ।

এর বিপরীতে ইসলামে বরাবরই সুস্থ ও গঠনমূলক চিন্তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইজমা ও কিয়াস তথা ইজতিহাদের বিধান এই চিন্তার স্বাধীনতারই স্বীকৃতি। সমস্যা মুকাবিলায় সঠিক পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিজ্ঞানের যে সূত্র আবিষ্কারের জন্যে প্রকাশ্যে গ্যালিলিওকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিলো তার চেয়ে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। সেজন্যে তাঁদের কিন্তু রাজদরবারে কৈফিয়ত দিতে দাঁড়াতে হয় নি। চিন্তার স্বাধীনতার সুযোগ ইসলামে অবারিত রয়েছে বলেই শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তনের সাথে ইসলাম অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। আল-কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও আধুনিক ব্যাংক বা বীমার উল্লেখ নেই। কিন্তু সেজন্যে ইসলাম বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। বরং অর্থয়ানের এই নতুন প্রক্রিয়াকে ইসলাম প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করে আত্মস্থ করেছে। ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ খোদাদ্রোহীতা বা তাগুতী শক্তির পক্ষে কলম চালানো নয়। বরং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যা সত্য ও সুন্দর, মানবতার পক্ষে কল্যাণকর তার জন্যেই চিন্তাশীলরা কাজ করবে। বুদ্ধিজীবীরা সমাজের সচেতন লোক হিসেবে সে উদ্দেশ্যেই তাদের লেখনী পরিচালনা করবে। অন্যায় ও অসত্যকে নির্মূল করার জন্যে, সকল ইবলিসী তৎপরতার মূলোচ্ছেদের জন্যে এবং তাগুতী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই চিন্তার স্বাধীনতাকে কাজে লাগানো ইসলামে আচরিত ও স্বীকৃত উপায়।

৭. গণতন্ত্র বনাম প্রলেতারিয়েততন্ত্র

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালিত হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো বলেই ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) এত গুরুত্ব। আধুনিক গণতন্ত্রের আন্দোলন সেই থেকে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। যদিও রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলা হচ্ছিল Necessary Evil বা প্রয়োজনীয় অশুভ প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাজতন্ত্রের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্যে সমকালীন ইউরোপে এর কোনো বিকল্পও জানা ছিলো না। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস হতে শুরু করে জন লক, জন স্টুয়ার্ট মিল, জাঁ জ্যাক রুশো, টমাস জেফারসন, হ্যারল্ড জে. লাস্কি, লর্ড ব্রাইস প্রমুখ ধনতান্ত্রিক জীবনাদর্শে বিশ্বাসী দার্শনিক-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা। অপরদিকে গণতন্ত্রের যারা চুলচেরা বিশ্লেষণ ও কঠোর সমালোচনা করে একে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, ঐতিহাসিক লেকী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টেলি র‍্যাণ্ড, স্যার হেনরী মেইন, এমিল ফাগুয়ে প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

প্লেটো তার *রিপাবলিক* গ্রন্থে গণতন্ত্রকে মূর্খের শাসন বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, সমাজে বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যাই বেশী। তাই সংখ্যাধিক্যের শাসনের অর্থ এদেরই শাসন। এমিল ফাগুয়ের মতে বিজ্ঞ ও বিদগ্ধজনেরা নির্বাচনের হট্টগোলে যেতে নারাজ। দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে ভোট ভিক্ষাতেও তারা অসমর্থ। ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সত্যিকার বিজ্ঞজনদের অবদান রাখার কোনোই সুযোগ নেই। টেলি র‍্যাণ্ড গণতন্ত্রকে 'শয়তানের শাসন' ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক লেকী বলেন গণতন্ত্র কোনোক্রমেই শ্রেষ্ঠতম প্রশাসনিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয় না। অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন স্যার হেনরী মেইন। উপরন্তু গণতন্ত্র শুধু অপচয়ধর্মী ব্যবস্থাই না, দুর্নীতির প্রশ্রয়দানকারীরও বটে। পৃথিবীর যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের প্রতি নজর দিলে এ সত্য সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। গণতন্ত্রে ধনীদের প্রভাব খুবই বেশী। নির্বাচনের সময় চাঁদা দিয়ে তারা দলের নেতাদের হাত করে এবং পরবর্তীতে তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে বাধ্য করে। বিপুল অর্থ ব্যয়ে নিরন্তর প্রচারণা ও ক্ষেত্র বিশেষে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দসই লোককে ভোট দিতে সাধারণ ভোটারদের উদ্বুদ্ধ বা বাধ্য করে। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপুল অংকের চাঁদা দেয় যেন বিজয়ী দল তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো পদক্ষেপ নিতে না পারে। নির্বাচনে বিজয়ী দল তাদের সমর্থকদের মধ্যে ঠিকাদারীর কাজ, লাইসেন্স, পারমিট ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করে। ফলে সরকারী তহবিলের পুরোটাই ব্যবহৃত হয় দলীয় স্বার্থে। সাধারণ জনগণের এখানে ঠাঁই কোথায়?

এতসব অসংগতি ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশগুলো বিশ্বের কাছে তাদের আচরিত গণতন্ত্রকে গ্রহণ করতে এবং সেটিই যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে আব্রাহাম লিংকনের প্রদত্ত সংজ্ঞার সরকারই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ধারক ও বাহক। কারণ সে সরকার হলো জনগণের দ্বারা জনগণের জন্যে

জনগণের সরকার (Government of the people, by the people and for the people)। এই সরকারই গণতন্ত্রের সর্বোত্তম রক্ষাকবচ। কিন্তু বাস্তব চিত্র কি আসলে তাই? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে 'জনগণের ইচ্ছা' আসলে 'জনগণের'ও না 'ইচ্ছা'ও না। কতিপয় নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির গৃহীত ও চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তই জনগণের সিদ্ধান্ত বা রায় বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে, জিতে আসা সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। নির্বাচনী কর্মকান্ড এখন এমন এক বিশাল ব্যয়বহুল ব্যাপার যে শুধুমাত্র ধনীরাই এতে অংশ নিতে পারে। মার্ক্স যে বুর্জোয়া শ্রেণীকে তার শ্রেণী সংগ্রামের অন্যতম প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন সেই শ্রেণী শত্রুরাই নির্বাচনে দাঁড়ায়। নির্বাচনী কর্মকাণ্ড দেশব্যাপী এক বিশাল হুলস্থূল ব্যাপার। রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন হলে তো কথাই নেই। এর ব্যয়ভার বহন একা কোনো প্রার্থীর পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয়, দুঃস্বপ্নের শামিল। সে ব্যয়বহন করে দল। দল চাঁদা তোলে, হাজার ডলার দামের ডিনারে আমন্ত্রণ জানায় সমর্থকদের। মার্কিন মুলুকে রস পেরেট এর মতো ধনীরাই শুধু নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। অন্যদিকে নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেও নাম প্রত্যাহার করে নেয় মিসেস এলিজাবেথ ডোলের মতো প্রার্থীরা। খবরের কাগজে প্রকাশ্য বিবৃতি দেন রিপাবলিকান দলের এই প্রার্থী – তার পর্যাপ্ত অর্থ নেই বলে নির্বাচনী যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়ালেন। (*দৈনিক ইনকিলাব*, ২২ অক্টোবর, ১৯৯৯)। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্রই এই একই চিত্র দেখা যাবে।

নির্বাচনে যারা জেতে তারা কি প্রকৃত অর্থেই অধিকাংশ লোকের সমর্থন পেয়ে নির্বাচিত হয়? তারা কি সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের প্রতিনিধি? যদি তিন জন প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং একজন ৪০%, অপরজন ৩২% এবং বাকী অন্যজন ২৮% ভোট পায় তাহলে প্রথম জনই নির্বাচিত বলে স্বীকৃত হবে। তার সিদ্ধান্তই গৃহীত হবে, চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অথচ বাস্তবতা হলো তার পেছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অর্থাৎ ৬০% লোকেরই সমর্থন নেই। এই হলো গণতন্ত্রের ফাঁকি। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসন পরিচালনার এই পদ্ধতি না জনগণের বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম, না এখানে সৎ দক্ষ ও যোগ্য লোকের মূল্য আছে, না রয়েছে বিত্তহীনদের জন্যে কোনো সুযোগ। এরপরেও যদি কোনো দেশে গণতন্ত্রের এই ভোটাভুটির মাধ্যমে এমন কোনো লোক বা দল ক্ষমতায় এসে যায় পুঁজিবাদের মোড়লদের কাছে যারা পছন্দনীয় নন তাহলে তাকে উৎখাত করা হয় অস্ত্রের মুখে। জারী করা হয় সামরিক শাসন। তখন ঐ দেশের জন্যে গণতন্ত্রের চর্চা আর অনুমোদনযোগ্য থাকে না। আলজেরিয়া এর উজ্জ্বল উদাহরণ। এ ধরনের দ্বিচারণে অভ্যস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসররা। এ জন্যেই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের পথ ধরে বা এই প্রক্রিয়ায় মিশর লিবিয়া সিরিয়া ইরাক নাইজেরিয়া ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া বা পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার কোনোও সম্ভাবনা নেই। ইরানে ইসলামী বিপ্লব তথা রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে নয়, ইসলামী জিহাদের মাধ্যমে।

সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের নাম-নিশানাও থাকে না। বরং সেখানে চালু হয় একনায়কতন্ত্র যা আরও ভয়ংকর, আরও বিভীষিকাময়। সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজমের ধ্বজাধারীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র উচ্ছেদের ডাক দিয়ে 'জালিমশাহী নিপাত যাক' শ্লোগান দিয়ে, 'দুনিয়ার মজুদর এক হও' আওয়াজ তুলে রক্তপাত, শঠতা ও ধূর্ততার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েই তাদের ভোল পাল্টে ফেলে। প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারাদের নামে দখল করা ক্ষমতায় আর কেউ যেন ভাগ বসাতে না পারে সেজন্যে একদিকে যেমন চালু হয় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্র (যেমন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে হয়েছিলো বাকশাল) তেমনি অন্যদিকে বিরোধীদের নির্মূল করার জন্যে চালানো হয় সাঁড়াশী অভিযান। পৃথিবীর কোনো সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিস্ট দেশে এর কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। এর বিপরীত উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নতুন এই শাসন ব্যবস্থার গাল ভরা নাম দেওয়া হয় সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র বা Dictatorship of the Proletariat।

গণতন্ত্র তো দূরের কথা, সত্যিকার অর্থে গৃহযুদ্ধ ছাড়া শুধুমাত্র বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। খোদ লেনিনেরই কথা হলোঃ " ..... a Socialist revolution in particular, even if there were no external war, is inconceivable without internal war i. e., civil war " অর্থাৎ, যদি বৈদেশিক যুদ্ধ নাও থাকে তাহলেও বিশেষভাব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ অর্থাৎ, গৃহযুদ্ধ ছাড়া অচিন্ত্যনীয়। (Lenin, *Selected Works,* Russian Edition, vol. 2, p. 278)

তিনি আরও বলেন "..The Soviet Socialist Democracy is in no way inconsistent with the rule and dictatorship of one person." (Lenin, *Collected Works,* Vol. XVII, p. 89, 1923 edition)। অর্থাৎ, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কোনোভাবেই একব্যক্তির একনায়কত্ব ও শাসনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আসলেই প্রচণ্ড স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা না কায়েম হতে পারে, না তা একদণ্ড স্থায়ী হতে পারে।

এজন্যেই যে মেহনতী জনতা হাতুড়ী-শাবল-কাস্তে নিয়ে রাজপ্রসাদের বন্ধ দুয়ার খুলেছিলো তাদের ফেরত পাঠানো হয়েছিলো তাদের সাবেক জায়গাতেই। ক্ষমতার মসনদে আসীন হলো পার্টির প্রধানরাই, ক্ষমতার মালিক হলো পলিট্যবুরোর সদস্যরা। একবার পলিটবুরোর সদস্য হতে পারলে সেখান হতে সরবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। একমাত্র গুপ্ত হত্যা বা কয়েদ ছাড়া স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তবেই এর অবসান ঘটে। মাও ঝে দং, ভ্লাদিমীর ইলিচ লেনিন, যোসেফ ব্রজ টিটো, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, হো চি মিন, কিম ইল সুং, যোশেফ স্ট্যালিন, লিওনিদ ব্রেঝনেভ, এনভের হোক্সা (আনোয়ার হোজা) সকলেই আমৃত্যু থাকেন কমরেড কমান্ডার, দেশের সর্বময় হর্তাকর্তা।

পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর অনেকেরই গাঁটছড়া বাধা ছিলো পুঁজিবাদের সাথে। কিন্তু পুঁজিবাদের শোষণ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর (বৃটেন কর্তৃক মিশরের সুয়েজ খাল

দখল করে রাখা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ) তারা বিকল্প আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজতে থাকে। সেই সময়েই এরা সোভিয়েত কূটনীতির খপ্পরে পড়ে। দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয় এবং তারাই সুকৌশলে ক্ষমতা দখল করে। কখনো বা ক্ষমতাসীন সরকার এদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় টিকে থাকে। তাই মিশর লিবিয়া সিরিয়া ইরাক প্রভৃতি মুসলিমপ্রধান দেশে ব্যক্তিজীবনে ইসলাম আচরণের সুযোগ থাকলেও সেসব দেশে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজতন্ত্রের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন। এসব দেশে পার্টি প্রধানরাই একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আমৃত্যু তাই ক্ষমতায় থাকেন জামাল আবদুল নাসের, আনোয়ার সাদাত, হাফিজ আল-আসাদ, মুয়াম্মের গাদ্দাফী। সাদ্দাম হোসেনরা ক্ষমতায় থাকেন গ্রেফতারীর পূর্বপর্যন্ত।

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে খিলাফত প্রথা উৎখাত করে তুরস্কেই সবার আগে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ইসলামের দুশমন মুস্তফা কামাল পাশা এই সর্বনাশা পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সর্ববিধ উপায়ে জীবনের সকল ক্ষেত্র হতে ইসলামকে উৎখাতের জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। কুরআন শরীফ লেখার চেষ্টা করা হয় রোমান হরফে। মসজিদে আযান দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়। অধুনা হিযাব পরিধানের বিরুদ্ধে সে দেশের পার্লামেন্ট আইন তৈরী করেছে। তুরস্কের ইসলামবিরোধী রাষ্ট্রনেতাদের বড় সাধ ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য তাকে তাদেরই একজন বলে গ্রহণ করুক। কিন্তু ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করলেই দাঁড়কাক ময়ূর হয়ে যায় না। পাশ্চাত্য তাকে গ্রহণ করতে চাইছে না। কারণ শত নির্যাতন পীড়ন দলন সত্ত্বেও তুরস্কে আজও ইসলাম তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়েই টিকে রয়েছে।

আসলেই মানুষের মনগড়া মতবাদে কোনো কল্যাণ নেই, নেই আপামর জনসাধারণের সার্বিক স্বাধীনতা, নেই সার্বজনীনতা তথা বিশ্বজনীনতা। মানুষের তৈরী দু-দুটো ভিন্নধর্মী ও বিপরীতমুখী রাষ্ট্রদর্শনের যাঁতাকলে পড়ে অগণিত মানুষের নিষ্পিষ্ট হওয়ার কাহিনীতে ইতিহাস ভরপুর। ইসলামের পরামর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বা শুরা পদ্ধতি এ দুয়ের প্রত্যেকটির চেয়েই উত্তম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় হযরত আবু বকরের (রা.) সময় হতে। মহান খুলাফায়ে রাশিদূনের (রা.) যুগের শেষে শুরু হয় রাজতন্ত্র যা ইসলামে আদৌ কাম্য ছিলো না। অবশ্য সুলতান ও আমীররা (যাদের অনেকেই খলীফা পদবী ব্যবহার করতেন) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে দেশের গুণীজনদের মধ্যে থেকে লোক বাছাই করে তাদের পরামর্শ সভার সদস্য করতেন। ইসলামের দাবী হলো তাকওয়া (খোদাভীতি) ও পরহেজগারীর ভিত্তিতে সর্বোত্তম লোকেরাই হবে সরকারের পরামর্শ সভা বা শুরার সদস্য। দেশ শাসনের জন্যে আল-কুরআন ও সুন্নাহই হবে আইনের উৎস। সকল ক্ষমতা, শক্তি ও আইনের উৎস হবেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এপথে না এগুবার কারণেই অর্থাৎ সঠিক শুরাভিত্তিক রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা না করার কারণেই মুসলিম মিল্লাতের আজ এই দশা। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা বা রাষ্ট্রদর্শন, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র যার

অন্যতম ভিত, মুসলিম উম্মাহর জন্যে একেবারেই অনুপযুক্ত। একইভাবে অনুপযুক্ত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের রাষ্ট্রদর্শন। মুসলমানের যথার্থ মুক্তি ও সাফল্য নিহিত রয়েছে রাসূলে কারীম (স.) প্রদর্শিত ও প্রবর্তিত রাষ্ট্র দর্শনে। পৃথিবীর অন্য কোনো মতবাদই এর সমকক্ষ নয়, তারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়নি।

কিন্তু সমাজতন্ত্র যেমন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা জীবন দর্শনকে মেনে নেয়নি তেমনি পশ্চিমা পুঁজিবাদী শক্তি, বিশেষতঃ তার মোড়ল গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা তথা ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নকে বরদাশত করতে রাজী নয়। বরং সুকৌশলে এর বিরোধিতার জন্যে এবং একই সঙ্গে বিশ্বজনমতকে ধোঁকা দেবার জন্যে জাতিসংঘকে তাদের ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। পাশ্চাত্য শক্তি কোনো মুসলিম দেশকেই মাথা উঁচু করে দাড়াঁতে দিতে নারাজ। বরং সবাইকে সে অনুগত গোলাম করে রাখতে চায়। সুদান লিবিয়া ইরাক ইরান তার গোলামী মেনে নেয় নি। সেজন্যে তাদের উপর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার দাবীদার গোটা পাশ্চাত্য সমাজ তাতে নীরব সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

৮. আন্তর্জাতিকতা

ইসলাম যে অর্থে আন্তর্জাতিক সেই অর্থে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র আর্ন্তজাতিক নয়। ইসলামের রয়েছে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী বা *উম্মাহর* ধারণা। এ ধারণা অপর দুটি মতবাদে নেই। সমাজতন্ত্রে একদা যে অর্থে *কমরেড* শব্দ ব্যবহৃত হতো আজ সেই অর্থে শব্দটি চালু নেই, বরং দ্রুত বিলুপ্তির পথে। পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিকতা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদেরই ভদ্র খোলস। মার্কেন্টাইলিজমের সময় হতে পাশ্চাত্যের দেশগুলো বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলেছিলো তাদের উপনিবেশ বা কলোনী। কলোনীগুলো হতে তাদের দেশে (হোমল্যান্ড বা মাদারল্যান্ড) যেত লুট করা ধনরত্ন কাঁচামাল সস্তা শ্রম পুঁজি দাস খনিজ সামগ্রী ঠিক যেভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশ হতে ধমনী দিয়ে রক্ত চলে যায় হৃৎপিন্ডে। কলোনীগুলো নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো বৃটেন ফ্রান্স স্পেন হল্যান্ড ও জার্মানীর মধ্যে। শেষ অবধি অবশ্য বৃটেনের সাম্রাজ্যই ছিলো সর্ববৃহৎ--এত বিশাল ও বিস্তৃত যে একদা এ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনই অস্তমিত হতো না। রাজনৈতিকভাবে আজ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপনিবেশ নেই সত্যি, কিন্তু তাদের সাম্রাজ্যবাদী কৌশল রয়ে গেছে ঠিকই। এর বহি:প্রকাশ ঘটেছে বৃহৎ ফাইন্যান্স ক্যাপিটালের মাধ্যমে। বিশ্বব্যাপী পুঁজির যোগানদার হিসেবে পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলো আজ নব্য উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এদের মদদগার হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, সহায়ক শক্তি হলো বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো। এদের দোসর হয়ে কাজ করছে এদেরই মদদপুষ্ট এনজিওগুলো।

নব্য উপনিবেশবাদ তথা আন্তর্জাতিকতাবাদের আরেক রূপ হলো সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাহায্যে চালাচ্ছে তথ্যসন্ত্রাস ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বশেষ প্রযুক্তি -- কম্পিউটার ও স্যাটেলাইট। এসবের নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন যেমন পুঁজিবাদী গোষ্ঠী নিজেদের হাতে রেখে দিতে চাইছে তেমনি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করার স্বার্থে তার বেপরোয়া ব্যবহারও করে চলেছে। মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বহাল রাখা। এ প্রসঙ্গে পুঁজিবাদেরই অন্যতম সমাজবিজ্ঞানী Michael Kunezik বলেন, "Cultural imperialism through communication is a vital process for securing and maintaining economic domination and political hegemmony over others." (*Television in the Third World*)। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন ও তা বহাল রাখার জন্যে যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিস এন্টেনার সাহায্যে পাশ্চাত্যের ধর্মবিমুখ খোদাদ্রোহী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবাদী জীবনের সকল অনুষঙ্গই আজ মুসলমানদের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। এর বিষময় ফল ফলতে শুরু করছে। একারণেই পৃথিবীর অনেক দেশে ডিস এন্টেনার ব্যবহার সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছে। বিশেষ বিশেষ ক্যাসেট ও বাজেয়াপ্ত করছে। কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হচ্ছে?

সমাজতন্ত্র তাত্ত্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হলেও বাস্তবতা এ থেকে অনেক দূরে। সমাজতন্ত্র সত্যি সত্যি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে বিকাশ লাভ করতে না চাইলে তার মোড়ল সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ওয়ারশ চুক্তি করার প্রয়োজন হতো না। প্রয়োজন হতো না নেপথ্যে থেকে বান্দুং কনফারেন্সের সফলতার জন্যে সকল আয়োজন সম্পন্ন করার। হাঙ্গেরী পোল্যান্ড অষ্ট্রিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়াতে সমাজতন্ত্র আদৌ কায়েম হতো না যদি না সোভিয়েত রাশিয়া সেসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালাতো। ভিয়েতনাম ও কম্পুচিয়ায় বছরের পর বছর হাজার হাজার লোক নিহত, গৃহহীন ও পঙ্গু হতো না যদি না রাশিয়া তাদের সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্যে স্বপ্ন দেখাতো, এজন্যে রসদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা না করতো। কিউবায় সোভিয়েত মদদের কথা কে না জানে? একইভাবে সমাজতন্ত্র তার দীর্ঘ বাহু বিস্তৃত করেছে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়। পেরু বলিভিয়া চিলি নিকারাগুয়া কিংবা কঙ্গো এ্যঙ্গোলা নামিবিয়া ও ইথিওপিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্ত হত্যা, ষড়যন্ত্র ও রক্তপাতের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরীর পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক মত ও পথ গ্রহণের নেপথ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা ছিলো সর্বজনবিদিত।

ইসলাম বরাবরই আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। প্রকৃতিগতভাবেই ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীতে যুগে যুগে দেশে দেশে যখনই অত্যাচার,

শোষণ, পীড়নের সয়লাব বয়ে গেছে, ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন ও কুশাসনে জনসাধারণের মধ্যে আর্তরব উঠেছে তখনি ইসলাম তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশেই মুসলিম বীর সেনানীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মুক্তির দূত হিসেবে। কিন্তু কোথাও তারা সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করেনি, উপনিবেশ স্থাপন করেনি। বরং বিজয়ী ও বিজিত এক হয়ে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্যে কাজ করেছে। ইসলাম পুরোপুরি আধিপত্যবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, এমনকি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদেরও বিরোধী। বরং কিভাবে বিশ্ব মুসলিম এক উম্মাহর পতাকা তলে জমায়েত হবে, কিভাবে মুসলমানরা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করবে তাই তার লক্ষ্য। কোনো জাতি বা রাষ্ট্র বিশেষকে পদানত করে রাখা, তার সম্পদের উপর লোলুপ থাবা বিস্তার কখনই মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিলো না। প্রকৃত অর্থেই মুসলমানরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। তার কাছে আরব-আযমের কোনো ভেদাভেদ নেই। তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভেদবুদ্ধি অনুপ্রবেশ করিয়েছে পাশ্চাত্যের সুযোগ সন্ধানী কুচক্রী মহল। ক্ষুদ্র স্বার্থের বেড়াজালে আটকে তাকে বৃহৎ স্বার্থের বিরোধী করেছে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দর্শন। প্রকৃত মুমিনের শিক্ষা হতে বিচ্যুতির কারণে, আরও সঠিক করে বললে ইসলামের যথার্থ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ব্যক্তি মুসলমান ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। এই জাল ছিন্ন করে মোহমুক্তি ঘটাতে পারলেই আবার প্রস্ফুটিত হবে তার সত্যিকার চেহারা, বিকশিত হবে তার যথার্থ চরিত্র। মানব জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই ইসলামের এই কল্যাণমুখী ভ্রাতৃত্বধর্মী আন্তর্জাতিকতাবাদ ও উম্মাহর ধ্যান-ধারণা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

উপসংহারে পৌঁছানোর পূর্বে পুঁজিবাদের অপরাপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরা প্রয়োজন। এ সবের মধ্যে এই জীবন দর্শনে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্রয়াসের অনুপস্থিতির কথাই আসে সবার আগে। বৈষয়িক উন্নতিই এর একমাত্র বা চূড়ান্ত লক্ষ্য। চরম ব্যক্তি স্বার্থ ও উপযোগিতাবাদই এর আইন-কানুন বা নীতি নির্ধারণের প্রধান মানদন্ড হিসেবে কাজ করে থাকে। এ জন্যেই আইন করে এরা একবার ধূমপান নিষিদ্ধ করে পরক্ষণে সেই আইন আবার নাকচ করে। ব্যবসায়ী তথা মুনাফা লুটেরাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে বলে ধূমপান নিষিদ্ধ না করে, সিগারেট উৎপাদন বন্ধ না করে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর' শ্লোগান সিগারেট প্যাকেটে ছাপার নির্দেশ দিয়েই সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতার পরাকাষ্ঠা দেখায়। এখানে সম্পদ ও ক্ষমতার দাপটে মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব করে। চরিত্রহীনতার সংজ্ঞা এখানে নতুন করে লেখা হচ্ছে। মানুষের স্বার্থে মানুষের মনগড়া আইন দিয়েই এই সমাজব্যবস্থা পরিচালিত বলে পুঁজিবাদী জীবনদর্শন ভারসাম্যহীন ও একদেশদর্শী।

পুঁজিবাদের বর্তমান চরিত্রকে সংক্ষেপে তুলে ধরলে যা দাঁড়ায়:

১. একক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ;
২. চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান (ধনী-দরিদ্রের জীবন যাপনের ব্যয়সূচক বিগত দুই দশকে ১০:১ হতে ৭০:১ এ উন্নীত);
৩. বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষণের কৌশল গ্রহণ;
৪. যুগপৎ চরম দারিদ্র্য ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন নিত্যকার দৃশ্য;
৫. গণতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা;
৬. স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রবাহ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পুঁজিবাদী জীবনাদর্শের স্লো পয়জনিং;
৭. এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষণের বিস্তৃতি;
৮. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল; এবং
৯. ইসলামের মুকাবিলায় সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

একইভাবে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে সম্যক জানার স্বার্থে তার আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা জীবন দর্শনের এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অস্বীকৃতি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধার নিদারুণ বৈষম্যের কথা বাদ দিলেও পার্টিসৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য (রুশ প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দ, পলিটবুরোর সদস্যবৃন্দ ও জেনারেলরা বিশ্রামের জন্যে যে ডাচা-তে সময় কাটান তা সাধারণ রুশ নাগরিকের শুধু কল্পনাতীত নয় তার ধারে কাছে ঘেঁষাও অপরাধ), ধর্মহীনতাকে নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ, মানুষের উপর মানুষের অন্যায় প্রভুত্ব, রেজিমেন্টেড জীবন যাপন, সর্বোপরি অবাস্তব ও অলীক আশার বাণী শুনিয়ে ধোঁকা দেবার অভ্যাস।

সমাজতন্ত্রের মহাদুর্ভাগ্য হলো এর প্রফেট কার্ল মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া। মার্ক্স তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে শুনিয়েছিলেন পুঁজিবাদী দেশে শিল্প শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হবে। ফলে তারাই সংহত হয়ে শ্রেণী সংগ্রাম করবে। বাস্তবে তা তো হয়ই নি, বরং সেসব দেশের শ্রমিকদের জীবন যাপনের মান সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী দেশের শ্রমিকদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত। তিনি আশা করেছিলেন মুনাফার হার ক্রমাগত হ্রাস পাবে এবং জাতীয় আয়ে মজুরীর অবদানও দ্রুত কমে আসবে। বাস্তবে ঘটেছে এর উল্টোটা। তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো ব্যাপক শিল্প উৎপাদনের ফলে বাজারে পণ্যের স্তূপ জমে যাবে। ফলে দেখা দেবে ব্যাপক বেকারত্ব এবং ঘন ঘন মন্দা, ফলশ্রুতিতে নাভিঃশ্বাস উঠবে পুঁজিবাদের। সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে, বিশেষতঃ কেইনসের উদ্ভাবিত তত্ত্ব অনুসরণের ফলে মার্ক্সের এই প্রত্যাশাও পূরণ হয় নি। মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিবর্তনবাদের পরিণতি হিসেবেই পুঁজিবাদ তার অন্তর্নিহিত

দ্বন্দ্বের কারণেই ধ্বংস হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হয়নি। বিশ্বের বহুদেশেই পুঁজিবাদ ছিলো, আজও আছে। সেসব দেশে পুঁজিবাদের মৃত্যুঘন্টা বাজেনি। অপরদিকে যেসব দেশে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলো সেসব দেশে পুঁজিবাদ বলে তেমন কিছু ছিলো না। বরং তাদের সবগুলোই ছিলো সামন্তবাদী বা আধাসামন্তবাদী দেশ, শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী দেশ কখনই নয়।

এখানেই শেষ নয়। যে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে এত রক্তপাত, এত শক্রতা ও শঠতা সেই দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের আদর্শের দশা আজ এই পর্যায়ে পৌচেছে যে স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্থাপিত কার্ল মার্ক্স আর লেনিনের ব্রোঞ্জের তৈরী অতিকায় মূর্তিগুলো ক্রেন দিয়ে টেনে নামানো হয়েছে। তারপর সেগুলো নীলামে চড়ানো হয়েছে অথবা ফ্যাকটরীতে নিয়ে গলিয়ে ফেলা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে পুরস্কৃত করা হয়েছে ছয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। এদের মধ্যে রয়েছেন মিখায়েল গরবাচেভ, লেস ওয়ালেসা, জর্জ বুশ, মার্গারেট থ্যাচার, হেলমুট কোহল এবং ফ্রাঁসোয়া মিঁতেরা। পুরস্কারটি দিয়েছেন চেক প্রেসিডেন্ট ভেক্লাব হ্যাভেল। (*দৈনিক ইনকিলাব*, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৯)। নব্য মার্ক্সবাদীরা মার্ক্সবাদের এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে এর নতুন ব্যাখ্যা, নতুন প্রেক্ষিত ও সংশোধন আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অব্যাহত সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র শুধু তাদের চরিত্রই হারায় নি, কঠোর বাস্তবতার মুকাবিলায় নিজেদের অস্তিত্বকেই সংকটাপন্ন করে তুলেছে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বর্তমান বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে তুলে ধরলে যা দাঁড়ায়ঃ

১. সমাজতন্ত্রের বর্তমান গতি ক্রমাগত সংশোধনবাদের দিকে;
২. পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো ক্রমাগত গ্রহণ (সুদ, ব্যক্তি মালিকানা, বাজার ব্যবস্থা, মুনাফা ইত্যাদি);
৩. শিল্প উৎপাদনে পুঁজিবাদী বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণ;
৪. পার্টি এলিট ও জনসাধারণের মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্ক;
৫. পীড়নমূলক, ধোঁকাপূর্ণ, গোঁজামিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত;
৬. রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি;
৭. অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত করতে ব্যর্থ;
৮. পুঁজিবাদের সাথে সহঅবস্থানের নীতি গ্রহণ; এবং
৯. ইসলামের মুকাবিলায় পুর্জিবাদের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

এই আলোচনা শেষ করার আগে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অর্ন্তনিহিত কতকগুলো বড় বড় ত্রুটি বা গলদও তুলে ধরা সমীচিন। তা না হলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসম্পূর্ণতা ও বিচ্যুতিগুলো

উল্লেখ করা জরুরী। এ থেকে উভয় মতবাদের অপূর্ণতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আরও সুষ্ঠু ধারণা জন্মাবে।

পুঁজিবাদের ত্রুটি:

১. অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা;
২. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বেকারত্ব;
৩. সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ বন্টন;
৪. একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উদ্ভব ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংহতকরণ;
৫. বাণিজ্য চক্রের পর্যায়ক্রমিক উপস্থিতি; এবং
৬. চরম নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের ক্রম বিস্তৃতি।

সমাজতন্ত্রের ত্রুটি:

১. সম্পদের ভুল মালিকানা ও অসম বন্টন;
২. প্রকৃত চাহিদা নির্ধারণ ও সঠিক মূল্য নিরূপণে ব্যর্থ;
৩. ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের সুযোগ না থাকায় প্রেষণা অকার্যকর;
৪. ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ;
৫. কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সত্ত্বেও কাংখিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ; এবং
৬. নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ।

উপসংহার

ইসলামী জীবনাদর্শ এক কালজয়ী জীবনাদর্শ হিসাবে চলতি শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করবে এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। মুসলমানদের উপলব্ধির আগেই এ সত্য উপলব্ধি করেছে পুঁজিবাদের সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা। এজন্যে তারা উদ্বেগাকুল। তারা উপায় খুঁজছে ইসলামের এই দুর্নিবার জোয়ার প্রতিরোধের। কতকগুলো উপায় তারা উদ্ভাবন করেছেও। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যেখানেই মুসলমানদের জাগরণ শুরু হয়েছে, সেখানেই মৌলবাদের জিগির তুলে তাকে প্রতিহত করা। তাদের সে উদ্দেশ্য কোথাও কোথাও সাময়িকভাব সফলও হয়েছে। এরা মুসলিম নেতাদের চরিত্র হননের বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রও চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পুঁজিবাদের মোড়লরা সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ ও ইসলামকে একাকার করে ফেলেছে। পৃথিবীর সেখানে যত নাশকতামূলক কাজ, ধ্বংস ও হত্যা সব কিছুরই দায়ভার চাপানো হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর।

ইসলামের নামে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম এদের কাছে বড়ই না-পছন্দ। পরিকল্পিতভাবে এর ধ্বংসের জন্যে যুব সমাজকে প্ররোচিত করছে ভোগ-লালসাময় জীবনের দিকে। কাশ্মীর মিন্দানাও আচেহ চেচনিয়া ইংগুশতিয়া বসনিয়া হারজেগোভিনায়

পাইকারী হারে মুসলিম নিধন যজ্ঞে তারা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে শান্তি উদ্যোগের নামে মাসের পর মাস কালক্ষেপণ করে। রেড ক্রিসেন্টের সাহায্য ও শান্তিবাহিনী পৌঁছাতে পৌঁছাতে জনপদের পর জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলীয়া ইজত বেগোভিচ কিংবা আসলান মাসখাদভকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। এরই বিপরীতে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বজনসমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নেতাদের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সেখানকার খ্রীষ্টানদের জন্যে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শান্তি স্থাপনের শর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান বোঝাই সৈন্য ও রসদ পাঠাতে খ্রীষ্টান বিশ্বের কোনো বিলম্ব হয় না, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এর বিরুদ্ধে কোনো ভেটো পড়ে না। অথচ অধিবাসীদের ৯০% মুসলমান হওয়ার 'অপরাধে' কাশ্মিরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার পঞ্চাশ বছরেরও বেশী ভূলুণ্ঠিত। এশিয়ার নব্য আগ্রাসী শক্তি ভারত তাকে জবর দখল করে রাখলেও তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করে না বিশ্ব মোড়লরা।

পাশ্চাত্যের তথা পুঁজিবাদের দ্বিমুখী ও দ্বিচারিণী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে আণবিক বোমার ক্ষেত্রেও। যে আণবিক বোমা ফাটানোর কারণে সিটিবিটিতে স্বাক্ষর না করলে পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে সেই একই 'অপরাধ' অনেক আগেই ভারত করলেও তাকে সিটিবিটিতে স্বাক্ষর করার জন্যে নেই সে ধরনের কোনো চাপ। একই কারণে ইরাকের আণবিক প্রকল্প বোমা মেরে উড়িয়ে দিলে ইসরাইল বাহবা কুড়ায়। এখন সেই একই পায়তারা চলেছে ইরানের বিরুদ্ধে। ওসামা বিন লাদেন এদের কাছে ভয়ংকর সন্ত্রাসী। কারণ তিনি ইসলামী জীবনদর্শন বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। অথচ তার চেয়ে সত্যিকার অর্থেই বহুগুণ বেশী সন্ত্রাসী জর্জ বুশ জুনিয়র ও দুঃশ্চরিত্র বিল ক্লিনটন দেশে দেশে পূজিত ব্যক্তি। কারণ অনেকের কাছেই মার্কিন মুলুক দুনিয়ার বেহেশত হিসেবে বিবেচিত এবং এরা দুজন সেদেশেরই মহাশক্তিধর কর্ণধার। গণচীনও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। চরম পীড়ন, দলন ও দমন চলেছে জিনজিয়াং সিচুয়ান ও গানসু প্রদেশে। সেদেশে জনসংখ্যা নীতির প্রধান টার্গেট মুসলমানরাই। জিয়াং জেমিনের আমলেই ২১০ জন মুসলমানকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হয়েছে (*দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ নভেম্বর, ১৯৯৯)। তাদের অপরাধ তারা ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী ছিলো, ইসলামী হুকুমতের প্রত্যাশী ছিলো।

এটাই নির্মম বাস্তবতা। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন - *"আল-কুফরু মিল্লাতু ওয়াহিদাহ্।"* অর্থাৎ, সমস্ত বাতিল শক্তিই এক। তাই তারা যে এক পর্যায়ে হকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, জীবনপণ করে লড়বে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বরং সেটাই নিষ্ঠুর সত্য, রূঢ় বাস্তবতা। এর মুকাবিলায় জয়ী হতে হলে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইলে দরকার বিশ্ব মুসলিমের সমবেত সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস। সেই প্রয়াসে কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে জীবনের সকল প্রিয় সম্পদকে। কারণ শাহাদতের সিঁড়ি বেয়েই আসে *ফাতহুম মুবিন* বা প্রকাশ্য বিজয়।

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে খুলনা জেলার জাহাঙ্গীরমহলে জন্ম। বাগেরহাট টাউন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও পি.সি. কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচ. এস. সি. পাশ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি. এ (অনার্স) (১৯৬৬) ও এম. এ (১৯৬৭) ডিগ্রী অর্জনের পর বাগেরহাট পি. সি. কলেজে অধ্যাপনা শুরু। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দেন ১৯৭০ সালে, ১৯৯৭-এ প্রফেসর পদে উন্নীত হন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট, সিন্ডিকেট, ফাইনান্স কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও ফাইনান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। ছাত্র জীবনেই বক্তৃতা ও বিতর্কের পাশাপাশি জাতীয় ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির শুরু। ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নে তার লেখনী নিবেদিত। এ যাবৎ প্রকাশিত মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২। তার লেখা সোভিয়েত ইসলামী অর্থনীতি (১৯৮০) ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব (৩য় সংস্করণ ২০০৪) ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? (২য় সংস্করণ ১৯৮৪) ইসলামী ব্যাংক : কতিপয় ভ্রান্তি মোচন (১৯৮৬) ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (২য় সংস্করণ ২০০২) বিবর্তনতত্ত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে মূল্যায়ন (২০০০) অর্থনীতি, পুঁজিবাদ ও ইসলাম (২০০৩) অর্থনীতিতে রাসূলের (স.) দশদফা (২০০৩) ইসলামী ব্যাংকিং : পেছন ফিরে দেখা (২০০৪) শীর্ষক গ্রন্থগুলো ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৪০-এর অধিক। বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ইসলামিক ইকনমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থটসহ বেশ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাজীবী সংগঠনের আজীবন সদস্য। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পর হতেই এর শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্য। সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া সফর করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

দি রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন : ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ছাত্র, যুবক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো যাতে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দ্বীনি অনুভূতি অর্জন ও ইসলামী আদর্শের গণভিত্তি রচিত হতে পারে। এর কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে : ক. ইসলামের ব্যাপক দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা; খ. উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান; গ. পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাসহ আধুনিক জ্ঞান অর্জনে সহায়তা দান; ঘ. দুস্থ ও আর্ত মানবতার সেবায় সার্বিক সহযোগীতা প্রদান; ঙ. ইসলামী আদর্শ তুলে ধরার জন্যে বই-পত্র ও সাময়িকী প্রকাশ এবং চ. সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরা।